জলকল্লোল

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জলকল্লোল

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ, ১৩৫২

— সাড়ে চার টাকা —

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও গুপ্তপ্রেশ,
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীকিশোরীমোহন নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

জলে কল্লোলে

জলের সঙ্গে রং মিলিয়ে যে-লেখা সেটা জলেরও নয়, রংয়েরও নয়—সে-লেখা কালির। কিন্তু ছোটবেলায় ভাবতুম, জগতের সব লেখাতেই জলকল্লোল, সব লেখাতেই নানারঙের রামধনু। প্রাণসমুদ্রে চলছে নিত্য মন্থন, আর হৃদয়ের আকাশে খেয়ালী তুলির নিত্য রংয়ের খেলা।

বেশ মনে পড়ছে সেদিন বৃষ্টি এসেছিল। বৃষ্টি এলেই আমাদের বাড়ীর ঈশান কোণের নিমগাছটা মাথা দোলাতো, পাশের খোলার চালে জল পড়ার সপসপ শব্দ হোতো। আমি গিয়ে ছোট ঘরের ছোট জানলাটা খুলে উত্তরদিকে চেয়ে থাকতুম। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামতো!

শীলেদের বাড়ীর ছাদে ঠিক মাঝখানে পাঁচিলে বসানো ছিল একটি পাথরের পুরুষ-মূর্তি। সেই মূর্তি মাথা হেঁট ক'রে থাকতো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—আমার সমস্ত শৈশব, সমগ্র বাল্যকাল ধ'রে ওই পুরুষমূর্তিটি উত্তর সীমান্তে অমনি মাথা হেঁট ক'রে স্তব্ধ হয়ে থাকতো। রৌদ্রে ওটাকে দেখি উজ্জ্বল, বর্ষায় দেখি মলিন, শীতে দেখি অস্পষ্ট। বর্ষায় বৃষ্টির ঝালরের ভিতর দিয়ে একাগ্রভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখি, ওর কোথাও পরিবর্তন নেই,—তেমনি শাদা, তেমনি শান্ত, তেমনি বোবা।

বৃষ্টি এলে পাঁচিল বেয়ে জল নামে, নল দিয়ে ঝলকে ঝলকে জল পড়ে, নালা দিয়ে স্রোত বয়ে যায়। আমাদের দক্ষিণের পাঁচিলে সবুজ মলিন শ্যাওলা পড়ে—আর আকাশটাও হয়ত বিষণ্ণ মলিন—আর পায়রারাও খোপের ভিতরে থেকে কেমন যেন বিষণ্ণ আর্তকণ্ঠে ডাকে, আর বর্ষায় ভেজা কাক বেলগাছের ডালটির প্রান্তে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, চড়াই পাখীরা ভিতের ফাটলে গিয়ে লুকোয়।

পূবদিকে পুঁটিবাগানের পথটা দিয়ে চ'লে যায় কোনো লোক মাথায় টোকা দিয়ে। ওদিকে কোথায় যেন আছে একটা নারকেল বাগান,—তার তলা দিয়ে পথ, সেই পথ এঁকেবেঁকে অর্জুনের দোকান পেরিয়ে অগ্নিকোণের দিকে চ'লে গেছে। মামা ব'লে দিয়েছেন, ওটা অগ্নিকোণ—ওখান থেকে আগুন ঠিক্‌রে আসে, ঝড় আসে, মেঘ ছুটে অ[illegible]ক নাকি কোন্ দূর দেশের পারে আছে সমুদ্র! মাঘমাসে আসে সাগরে[illegible]আর পৌষের হাওয়া আসে হিমালয় থেকে।

ছোট জা[illegible]দাঁড়িয়ে থাকি। অজ্ঞান তখনো কাটে নি, শুধু জ্ঞানের ঘুম ভাঙছে। বা[illegible]আকাশ থেকে জলের ছাট আসে ঘরের মধ্যে—প্রত্যেকটি ফোঁটায় যেন [illegible] মহাশূন্যলোকের সংবাদ ঠিক্‌রে পড়ে। কেন মেঘ হয়, কেন

আকাশ ডাকে সিংহের কেশর ফুলিয়ে, কেন জলের ঝাপট আসে আষাঢ়ের আবির্ভাবে, কেন ওই অগ্নিকোণ থেকে বায়ুকোণ অবধি কালোয় কালোয় অন্ধ হয়ে ধূলোবালির ঝড় উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে,—নাবালকের সেই ছিল আশ্চর্য কৌতূহল।

আমাদের বেলতলার ছাদটি ভরে যেতো বৃষ্টির জলে; তার দক্ষিণে বিষ্টুবাবুর ভাঙা ছাদ জলে থৈ থৈ করতো। পশ্চিমের বড় ছাদ বেয়ে নামতো জল। জলে সব নৈরাকার, একাকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতুম,—চোখ দুটো বুজে অনেকটা যেন অন্তশ্চেতনার মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে জলধারার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতুম। কেন? ওই বেলগাছ, ওই ছাদ, ওই মিত্তিরদের বাড়ীর ওপরকার আকাশ, দূরে ওই নারকেল বাগান, ওই সূর্যাস্তলোকের পথে নৈঋ্ত কোণ,—সমস্তটা মিলিয়েই যেন আমি। নারকেল গাছের লম্বা লম্বা পাতা আকুলি বিকুলি করে আষাঢ়ের বর্ষায়, আর চিলগুলো চেঁচায় ভয় পেয়ে,—কোন্ দূরের প্রান্ত থেকে আসে রেলের বাঁশীর জলে ভেজা শব্দ, নিরাশ্রয় কুকুরের কান্না,—তা'র সঙ্গে জলের ঝরঝর শব্দ, বৃষ্টির সপ্‌সপানি, নালানর্দমার খলখলে আওয়াজ, নলের জলের ঝরঝরানি,—ও-সব মিলিয়েই যেন আমি। সামনের বেলগাছটার ভিতরে ভিতরে যেন জটিল রহস্যের ছায়া, তা'র মোটা মোটা জল-সপসপে ডালে যেন কেমন প্রাচীন মুনিঋষির আবছায়া, নীচের দিকটায় ব্রহ্মদত্যির পাড়া,—কারণ নীচেটা অন্ধকার ছায়াঢাকা বাঁধানো বেদী। সেই বেদীর ফাটলে দেখা যেতো গাছের শিকড়,—সেই শিকড়ের চেহারা ছিল অষ্টাবক্র মুনির মতন।

আমাদের বাড়ী অনেক কালের পুরনো। তার ছাদের পাঁচিলের ফাটলে সাপের বাসা,—সেখানে মাঝে মাঝে শাদা রঙের খোলস পাওয়া যেতো। দেয়ালগুলো ভাঙা, বালিওঠা—ঠেস দিয়ে কোথাও দাঁড়ালে ছারপোকা কামড়াতো আর বালি খ'সে পড়তো। কড়িকাঠের চারদিকে ছিল উইয়ের বাসা,—তাদের আক্রমণে দিবারাত্র আমরা জিনিসপত্র বই কাগজ সাবধান করতুম। সেই উইপোকা-খাওয়া কড়িকাঠের ফাটল বেয়ে নামতো বর্ষার জল ঝিরঝির করে। দরিদ্র বিছানায় স্যাঁতসেঁতে ভাবটির মধ্যে শুয়ে কী অস্বস্তি, কী অস্থির হয়ে উঠতুম। রাত অন্ধকার—অন্ধ বাড়ীটাকে ঘিরে নেমেছে বর্ষা। আকাশে বজ্রার ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যেতো। বেলতলার ছাদ আর বড় ছাদটার কথা মনে করে কী যে অনন্ত ভাবনা নাবালকের মনে, কী যেন আকুলতা এই বাড়ীর বাইরের মাঠের কথা মনে ক'রে জাগতো—সমস্ত প্রাণ

জলে কল্লোলে

পথে কোনো নিরাশ্রয় লোক আছে কি না,
য় নি, কোন্ কুকুর ছানাটা কেঁউ কেঁউ করতে
াকার জলের ধারা কোন্ নালায় পড়ে কত দূরে
বেরিয়ে গেল, সেই অন্ধ ভিখারীটা এখন কোথায় রয়েছে, আমাদের বাড়ীর নীচের তলায় জলের প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা—ওটাকে দেখলে আমার চিরদিন ভয় করে কেননা ওটা আমাকে যেন টানতে থাকে। ওর সঙ্গে যেন আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক!

ঘুম আসে না চোখে; ঘুম এলে যেন চোখে যন্ত্রণা হয়।

রেড়ির তেলের মিটমিটে আলো জ্বেলে মা দেখলেন, বিছানাটার কোথাও জল এসে ছুঁয়েছে কিনা। জলের ধারা নেমে এসেছে কড়িকাঠ থেকে দেয়াল বেয়ে, সেটা পথ ধরছে পাছতলা দিয়ে,—বিছানাটা এখনও শুকনো আছে। ফুটো ছাদ ভাঙা জানলা, উঁচু-নীচু মেঝে, ঠাণ্ডা বিছানা, নিরাপদ জায়গার অকুলান—তখন আকাশ যদি অন্ধের মতো বন্যার ডাকে কাঁদে, যদি অমাবস্যার অন্ধরাতের নিবিড় বর্ষা হয়,—কী ভয় তখন বুকের মধ্যে! কেন? কেন ভয়? যদি যায় সব, যদি এই যা কিছু সব ভেসে চলে যায়? যদি ধ'রে রাখতে না পারি আমাকে আর সবাইকে? তবে, তবে কোথায় যাবো? দামোদরের নাকি বাঁধ ভেঙেছে, বর্ধমান চলেছে ভেসে, তমলুক নিশ্চিহ্ন,—আর আমাদের গঙ্গা উঠে এসেছে নিমতলা আর আনন্দময়ীতলা পেরিয়ে কোম্পানীর বাগানের দিকে! কোন্ দিকে পালাবো, কোন্ পথ দিয়ে কোথায়? বাড়ীর পিছনে দিকে সোনারবেনেদের মাঠ, তারপর কচিদের বাড়ী—তারপর সেই যে আকাশের দূর কিনারায় অগ্নিকোণ—ওদিকে কোন্ দেশ? মামা বলেছেন, অগ্নিকোণে নাকি সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বাসা।

নারকেল বাগান পেরিয়ে চিল উড়ে যেতো মিত্তিরদের বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে সেই যেদিকে সূর্য ওঠে। সেইদিকেই অগ্নিকোণ। আগে ঝড় আসতো সেইদিক দিয়ে,—আমরা বেলতলার ছাদে ভাঙা পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখতুম, ঝড় আসতো ধুলো উড়িয়ে আর কাক-চিলরা ঘুরপাক খেতো আকাশে, আমাদের ভয় করতো!

আলোটা জ্বেলে মা দেখলেন।

বললেন, ওমা, তুই জেগে। ঘুমো, ঘুমিয়ে পড়…এখন ভারি রাত! অমন বড় বড় চোখে চেয়ে থাকতে নেই,—ঘুমো।

বললুম, ঘুম আসছে না ……

কেন রে ?

বৃষ্টির যে শব্দ ! ঘুম ভেঙ্গে গেল !

জলের শব্দটা ঝিমঝিম করে। গরমের পর ঠাণ্ডা পড়েছে বর্ষায়, সবাই ঘুমিয়েছে অকাতরে। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করতো, সেই শিশু ভয় পেতো জলের শব্দে,—শব্দের আকর্ষণে। ভীরু অর্বাচীন শিশু,—মূঢ় নির্বোধ শিশু, দরিদ্র শিশু। ভাবছি, গঙ্গা রয়েছে কতদূরে, তার থৈ-থৈ জল ! নিমতলা শ্মশানের প্রান্তে অশথের নীচে দিয়ে ভরা বাদলের গঙ্গার স্রোত চলেছে হু-হু ক'রে,—তার সেই যে ওপার, শিশুর চোখে বহু দূর,—সেই ওপারের পথ ধ'রে কারা চলে যায় কোন্ দিকে।

এপারে মহাজনদের নৌকা বাঁধা থাকে। মাঝিমাল্লারা নৌকার মধ্যে ডুগডুগি বাজিয়ে গান গায়। জলে সেই গান ভাসতে থাকে, সেই গান জলের তলায় তলিয়ে যায়। শান বাঁধানো ঘাটের ধারে পলিমাটির আশেপাশে জল কুলকুল করে। কী যেন ভাষা ওই জলের তলায়, কী প্রশ্ন ! মেঘের ছায়া পড়ে জলে, সোনার বর্ণ ধূসর হয়ে আসে। মাল্লার ছেলেরা নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে, অতলের দিকে নেমে যায়, কী যেন রহস্যলোক আবিষ্কার ক'রে আসে,—অন্ধ, গূঢ়, মূঢ় রহস্যলোক ! কিছু একটা কথা আছে ভিতরে, কোনো একটা কাহিনী,—সেখান থেকে উঠে আসে কল্লোল, উঠে আসে উদ্বেলতা। কে যেন সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, কে যেন পিছন থেকে ঘাটের শেষ সিঁড়িটার দিকে ঠেলতে থাকে। অবশ অচেতন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীটার চারদিক থেকে আসতো ঝাপট। পাঁচিল একটা ধ্বসে গেছে গেল বারের বর্ষায়, খোলা ছাদ ডিঙিয়ে বর্ষা ছুটে আসে ভিতরের দালানে, জানলা দিয়ে জল আসে ঘরে, কোথাও প্রতিরোধ করার উপায় নাই, কোথাও নিরাপদ নয়। জল নামে ছাদ থেকে দোতলায়, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলায়। নীচের উঠোনে জল দাঁড়ায়, নর্দমা ভরে যায়,—আমরা কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিই। সেই নৌকা নর্দমার তলা দিয়ে চালাঘরের কানাচ বেয়ে বড় নর্দমা ডিঙিয়ে কোথায় গিয়ে যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর দেখতে পাই নে। অমনি বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে,—ওই কাগজের ভেলায় যেন প্রাণ পেতে রেখেছিলুম, ওর সঙ্গে যেন

চলেছে জন্ম-জন্মান্তরের কৌতুহল, যেন অনন্তকালের আনন্দসত্তা,—ওটা দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল।

উঠোনে জল দাঁড়ালে শিশুরা সেই জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতো। জল উঁচু হোতো বেশ খানিকটা, সেখানে সকলের সাঁতার শেখার পালা। কে ভাসতে পারে বেশী, কে মুখ ডুবিয়ে থাকতে পারে সেই নোংরা জলে, কে ঘুরতে পারে জলের মধ্যে মাছের মতন! কিন্তু এই জল শেষ অবধি পালায় কোথায়। নর্দমা থেকে বড় নালায়, সেখান থেকে চৌহদ্দি পেরিয়ে বাড়ীর নীচে দিয়ে পথের তলা দিয়ে,—তারপর? মামা বলে দিতেন নদীতে! নদী থেকে হয়তো বড় নদীতে? তারপর। চোখ বুজে দেখুন, বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্তর্গূঢ় স্রোত চলেছে অবিশ্রান্ত! ঠনঠনে আর ঝামাপুকুরের জল কোথায় যায়? কোথা যায় কাঁসারিপাড়া আর চোরবাগানের জল। মামা বলে দিতেন, সে মস্ত এক কাটা খাল আছে যেন কোথায় সেই খালে! সব জল যায় সেখানে, এই মহা-নগরের অবিশ্রান্ত জল প্রবাহ দিনরাত চলেছে সেই দিকে। যত বৃষ্টি হোক দাঁড়াবে না, জলপ্লাবন হোক—দাঁড়াবে না, ঠিক চলে যাবে সেই খালে,—আর খাল থেকে নদীতে! তারপর?

প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায় আমার চতুঃসীমানায়, আমার দিক্‌দিগন্তে। শীলেদের বাড়ীর গায়ে নিমগাছের শীর্ষ, তাঁতিদের বাড়ীর ছাদের পারে সরকারদের সেই মস্ত চিলে কোঠা,—ঈশানকোণে কাত্যায়নীদের বস্তী, এধারে নিমগাছওলা মন্দিরের ত্রিশূল, কচিদের পাড়া, রায়েদের নারকেল বাগান—আর দক্ষিণে মিত্তিরদের বাড়ী আর হলদে বাড়ীর কাঠচাঁপা গাছের শুঁন্‌নো ডগাটা। এদের মাথার ওপরে আমার যে অসীম দিগন্তরেখা—যেখান দিয়ে চাতক পাখীরা আর হেমন্তপ্রভাতের তুলোপেঁজা মেঘ ভেসে চলে যেত আমার মুখের উপর দিয়ে—সেখানে অহোরাত্র থেকে যায় এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আকাশ ভরে ওঠে জটিল প্রশ্নে।

বালকের বুক কাঁপে থরথর করে! নদীতে?—তারপর? তারপর কি সমুদ্রে? সেখান থেকে মহাসাগরে?

ভটচার্যিবাগানের পশ্চিমদিকে ছিল একটা জঙ্গল! সেখানকার আনাচে কানাচে ছিল ছোট ছোট খেজুর গাছ আর চোরকাঁটা। এপাশে ছিল একটা শ্যাওলাপড়া পুকুর। গোটা দুই-চার নারকেল গাছ ছিল তার পাড়ে—তাদের আগায় শকুনিরা এসে বসতো। মাঝে মাঝে দুপুরবেলায় শোনা যেতো চিলের কান্না।

জলে কল্লোলে

পুকুরের জল কেউ নিত না, কেউ ছুঁতো না। পচা পাতা, মোটা মোটা শ্যাওলা, রাজ্যের কাঠিকুটি—এইগুলো পুকুরে প'চে ওঠে। যেখানটায় একটু ছায়া, সেখানে কালো জল একটু জেগে থাকতো। ওইটুকু জল, কিন্তু কী কালো, কী গভীর, কী অর্থভরা। চারিদিকে এতবড় শহর, এত লোক চলাচল, এত গাড়ী ঘোড়া,—এত অশ্রান্ত ঘন ঘর্ঘর—তার মাঝখানে এ প্রাচীন সরোবরের অবশেষ। এ যেমন নির্জন, তেমনি দিক্‌ব্যাপী মুখর জনকোলাহল থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন! এর একদিন জল ছিল, যৌবন সমারোহ ছিল, মানুষের প্রত্যহের উৎসব-আয়োজনের ব্যবহারে এর সজীবতা ছিল। শুনেছি ওর ভিতরে যক্ষী থাকে, সে বুড়ি, তার জরাগ্রস্ত লোলচর্ম, তার মাথায় একরাশ সাদা চুল, যার চক্ষে ভয়ঙ্কর কুটিলতা, তার আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মতন। জলের মধ্যে নামলে ভিতর থেকে সে পা ধ'রে টেনে নেয়, নিয়ে যায় তার কোন অন্তঃসলিল গুহাটাকে—তারপর!

নাবালকের বুকের ভিতরে ধকধক করে। তারপর?

নারকেল গাছের আগায় দুপুরবেলাকার চিল কাঁদে, শালিক ডাকে, নির্জন পুকুরের আশেপাশে খেজুরের জঙ্গল খাঁ খাঁ করে। পথের ওপারে কাঁসারির কাঁসির ঢং ঢং শব্দ শোনা যায়, চুড়িওয়ালী যায় ঝুমুর ঝুমুর চুড়ির শব্দে,—কোথায় যেন একটা ডাহুক ডাকে কোন্ গাছের ডালে ছায়াঝিলিমিলি রোদে। মনে হয়, এই যেন অবসর! যক্ষীবুড়ীকে দেখে নেবার চিনে নেবার এই ত সুযোগ! সে আর আমি—এই দুজনের মাঝখানে ওইটুকু কালো শ্যাওলাপড়া জল, ওইটুকুর বাধা আর কেন? দিনের আলোয় প্রখর রৌদ্রে সজাগ চক্ষে ওকে দেখে নিতে পারবো। শিশুরা নাকি ওর বড় প্রিয়, তাই ওর কাছে শিশুদের যেতে দেওয়া হয় না। শুনেছি একটি শিশুর জন্যে যক্ষীবুড়ী নাকি চিরদিন লালায়িত!

মহানগরীর বিস্তার হচ্ছে। যেখানে মাঠ ছিল সেখানে এখন জনবহুল রাজপথ, যেখানে ছিল জঙ্গল সেখানে ধীরে ধীরে লোকবসতি গ'ড়ে ওঠে। খাস ক'লকাতার পাড়ায় পাড়ায় কত ডোবা আর পুকুর ছিল, কত নালা-নহর ছিল, কত বেড়া দেওয়া মাঠ, কত পতিত জমি, কত বড় বড় গাড়ী ঘোড়ার আড্ডা, কত বাগান আর গাছপালা,—একে একে সব চিহ্ন মিলিয়ে যক্ষীবুড়ী বড় ক্ষুধার্ত, তাই সে এত জরাজীর্ণ, এত লালায়িত,—নাগরিক চক্রান্ত তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, তাকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে,—

সে এসে শেষ বারের মতো আশ্রয় নিয়েছে এই মরা ডোবায়। যক্ষীবুড়ী যেন চারিদিক থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে জলের মধ্যে ডাকে।

সকল অকাজের মাঝখানে থেকে থেকে সহসা শূন্যপুরীর কোন্ গুহাপথ থেকে যক্ষীবুড়ী আমাকে ডাকতে থাকে। যেখানে জল, যেখানে জলস্রোত, যেখানে জলের ধারা, জলের নালা—সেইখান থেকে যক্ষীবুড়ী যেন আমাকেই ডাকে। ক'লকাতার রাস্তার দুধারে নহর, উল্টোডিঙির খাল, পশ্চিমের গঙ্গা, টালার সেই উঁচু ট্যাঙ্ক, পথের তলাকার বড় বড় পাইপ, লোকের বাড়ীর ছাদের উপরে বসানো লোহার জলাধার, —অর্থাৎ যেখানে জলের কোনো সঙ্কেত, সেখানেই যক্ষীবুড়ী। বাল্তির জলের ওপর ঝুঁকে নিজের প্রতিবিম্বিত ছায়া দেখতুম, চৌবাচ্ছার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে কী যেন আবিষ্কারের চেষ্টা করতুম।

চৌবাচ্ছাটা ছিল আমাদের বাড়ীর নীচের তলাকার দক্ষিণ অংশে। ওটা চৌবাচ্ছার পাড়া, নিরিবিলি একান্তে যেন ওটার বাসা। শান-বাঁধানো মস্ত বড় চৌবাচ্ছা,—ওটার আশপাশে দাঁড়িয়ে মেয়ের দল একসঙ্গে স্নান করতো। কোনো কোনো দুঃসাহসিকা নেমে পড়তো ওটার মধ্যে,—সহজে ডুব দিয়ে স্নান করা যেতো। ওইটেই ছিল আমার আকর্ষণ,—দেখা চাই ওটার মধ্যে কী আছে। কোনোপ্রকারে পাড়ের উপর উঠতে পারলে ভিতরে চার পাঁচটা সিঁড়ি—সেই সিঁড়িগুলো জলের তলায় ডুবে থাকে, তাতে শ্যাওলা পড়ে। নির্জন দুপুরে চৌবাচ্ছার পাড়ায় যেতে গা ছমছম করতো,—ওদিকটা ছিল অন্ধকার, হিম-শীতল আবহাওয়াটা সমস্ত বাড়ীটার থেকে পৃথক। কেবল গ্রীষ্মকালে একটা বাঁকা সূর্যরশ্মি কোন্ ফাটল দিয়ে যেন ওখানে এসে পড়তো। সমস্ত বাড়ীর সকাল সন্ধ্যার জীবনযাত্রার সঙ্গে ওটার যোগ ছিল না ব'লেই একটা পাঁচিল তুলে ওটাকে তফাতে রাখা হোতো। ফলে, সেই বিচ্ছেদের জন্যই ওই চৌবাচ্ছাটার চারিদিকে একটা নির্জনতার গা-ছমছমে ভাব জমে উঠেছিল। একা সহসা সেদিকে কেউ যেতো না, সুতরাং আমার আকর্ষণটা ছিল ওই কারণেই। মামা বলতেন, ওখানে পিশাচ আসে রাত্রের দিকে। ছাগলের মুণ্ড লটপট করে, শুনিসনি? পিশাচ এসে ওদের রক্ত খায়! এধারের দেয়ালে কান পেতে থাকিস, ঠিক শুনতে পাবি।

পিশাচের সঙ্গে মামার মুখখানা মিলিয়ে দেখতুম। গায়ের রং কালো, ছোট ছোট ধারালো চোখ, কাঁচাপাকা দাড়ি, কালো কালো হাত, শীতের দিনে কালো

ধোসা জড়ানো, কালো রংয়ের জুতো,—আফিঙ খায় কালো কালো বড়ির মতন! কিন্তু পিশাচ কেমন?

রাত্রে উৎকর্ণ হয়ে থাকতুম। দোতলার মেঝেতে কান পেতে নীচের তলাকার আওয়াজ শুনতে পেতুম। পিশাচ এসেছে ওই চৌবাচ্ছার ওদিকে হাতে একটা রক্তাক্ত ছাগল নিয়ে,—কান দুটো লটপট করছে তার! পিশাচটা যেন আমাকেই খোঁজে, আমারই দিকে তার সতর্ক দৃষ্টি। শরীর অবশ, অসাড় ও অচেতন হয়ে আসতো। মায়ের গা ঘেঁষে শুয়ে চোখ বুজতুম। কল্পনায় দেখতে পাই, চৌবাচ্ছার বিপুল কালো জল ছলছল করছে, কুটিল তার ভ্রূকুটি,—সেই জলের গভীর নীচে যেন আমার প্রাণের অতল তল,—আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে করাল মহাকালের মতন এক দীর্ঘকায় পিশাচ,—আমাকে যেন ইঙ্গিতে ডাকছে।

চৌবাচ্ছা ডাকে, জল ডাকে, পিশাচ ডাকে, দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য বর্ষা ডাকে,—তা'র সঙ্গে ডাকে ব্যাং, ডাকে বেলগাছ হাতছানি দিয়ে, ডাকে ওই দূরের নারকেল পাতা দশহাত বাড়িয়ে,—ডাকে সেই নীচের তলাকার জলস্রোত কলকল শব্দে! জলের ডাকে অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু অস্থির হই ব'লেই চুপ ক'রে থাকি, আশ্রয়টাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকি,—যেন মনের তটে জোয়ার না আসে, যেন সব ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। কিন্তু বালকের মনে কী অপরূপ কৌতূহল ওই পদার্থকে ঘিরে! ওর মধ্যে কতটুকু পদার্থবিজ্ঞান, কতটুকু প্রকৃতিবিজ্ঞান, কতখানি সৃষ্টিতত্ত্ব —এ ভাববার বয়স নয়। কিন্তু চেয়ে থাকতুম এমন একটা পদার্থের প্রতি, যার নাম—জল! তার রং নেই, রূপ নেই, স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, রস নেই—শুধু তরল, শুধু কোমল-স্পর্শ! ওটার মূল্য নেই, অথচ অমূল্য,। প্রাণধারণের মূল উপাদান জল —যেখানে জল নেই, সেখানে মানুষ নেই, সভ্যতা নেই, সেখানে জীবনের কোনো সঙ্কেত নেই!—কী কৌতূহল বালকের মনে, কী অসীম অস্বস্তি তা'র প্রাণে! জলকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না অস্বীকার করা চলে না,—সে সর্বব্যাপী, সর্বলোকাশ্রয়, সকল প্রাণের মূলমন্ত্র। পৃথিবী ভাসছে জলে, যেখানে জল নেই সেখানে রসাতল। অনন্ত বিস্তার জলের মাঝখানে একটুখানি স্থলভাগ ভাসছে—তার নাম পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই, চারিদিকে ডুব-জল।

আমরা সবাই জলের বেড়া দিয়ে ঘেরা, জলের চক্রান্তে আমরা বন্দী। আমাদের কোথাও পালাবার পথ নেই, আমাদের বেঁধে রেখেছে জলে, জল আমাদের খেতেই

হবে, জলে ডুব দিতেই হবে। জল আমাদের মন্ত্র, জলের পূজা করি আমরা প্রত্যহ, জল দিয়ে আচমন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জলের ছিটে পেলেই খুশী, জলই হলো শুচিতা। শান্তি আমাদের জলে—তাই ওর নাম শান্তিজল। আমাদের প্রাণধারণের সর্বাপেক্ষা বড় তৃপ্তি জলে! শস্যক্ষেত্র জলে সঞ্জীবিত হয়, জনবসতি গড়ে ওঠে জলে—জীবনের সমাপ্তিকালে চিতার আগুন শান্ত হয় জলে। যেখানে জল নেই, সেখানে ভালবাসা নেই, কাব্য নেই, ললিতকলা নেই, মানুষের প্রাণের কোনো মাধুরীই সেখানে প্রকাশ পায় না। মরুভূমিতে জল নেই বলেই সেখানে দিক্‌দিগন্তব্যাপী শুধু রিক্ততা আর দারিদ্র্য! জলের ভিতরে কোনো মালিন্য ঘটলে মৃত্যু এসে মানুষের সমাজকে ছার-খার করে।

কিন্তু বালকের কৌতূহলের চতুঃসীমানায় এসব তত্ত্ব ঠাঁই পেতোনা। শুধু ভালো লাগতো জলের চেহারা। বর্ষার জলে ভরে যেতো পুঁটিবাগানের সংকীর্ণ পথ। সেই পথ দিয়ে যেতুম পাঠশালায়। ভোরের বর্ষা নেমেছে; ঝাপসা জলো হাওয়ায় যখন চারিদিক বিষণ্ণ করুণ, শীত-শীত ভাব, কাজে জড়তা,—থৈ-থৈ জল এখানে ওখানে, ঘরের বাইরে পা বাড়াতে যখন ঠাণ্ডা লাগে, আকাশ আর পাঁচিল আর বেলগাছ যখন বিষাদের অশ্রুতে আর কুহেলীর ছায়ায় ঢাকা, যখন বাইরের পথ থেকে সবাইকে ডেকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করে,—সেই সময় ভোরের বর্ষায় আর ঠাণ্ডায় লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তুম পাঠশালার পথে। সবাই থাকুক আশ্রয়ে, সুখে থাকুক,—আমাকে যেতে হবে বাইরে। আমার অন্তর্গূঢ় প্রাণচেতনার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাইরের বর্ষার, জল দাঁড়ানো পথের, দুর্যোগের আর ওই দিগন্তজোড়া কাতর ভাবটির। ওদের সঙ্গে আমাকে মিলতে হবে, ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে যখন জলের ধারা নামে, মনে হয় কেমন যেন অদ্ভুত চেতনার ধারা নেমে আসছে। অনেক সময়ে চোখ বুজে থমকে দাঁড়িয়েছি পথে, দেখেছি বন্ধ চোখের উপরে কেমন নিবিড় জলধারা নামতে থাকে। চোখের সামনে থেকে পাঠশালা ভেসে যায়, ভেসে যায় পথ, ভেসে যায় বাড়ীর শাসন, ভেসে যায় শরীরের হিতাহিত জ্ঞান, ভেসে চ'লে যায় ইহকাল আর পরকাল।

পাঠশালায় গিয়ে প্রমাণিত হোতো, পড়াশুনায় আমার কী মনোযোগ। কর-দের বাড়ীর নীচের তলায় ছিল আমাদের পাঠশালা। চকমিলানো বাড়ীর বারান্দাগুলো ভরে থাকতো ছাত্রদের দলে। উঠোনটায় জল দাঁড়িয়ে পুকুরের মতন দেখাতো।

সেই জল ঠেলে আমি যখন গা-ঢাকা দোলাইয়ের ভিতর থেকে বই-স্লেট বা'র ক'রে বারান্দায় ওঠবার চেষ্টা করতুম, ছেলেরা হৈ চৈ ক'রে উঠতো,—মারুন গুরুমশাই, ওকে মারুন, ও জলে ভিজে এসেছে।

গুরুমশাই বেত নিয়ে এগিয়ে আসতেন পায়ের খড়মের খটাখট শব্দ ক'রে। তাঁর গায়ের রং কালো, চোখ দুটো ভীমরুলের মতন, মস্ত এক জোড়া গোঁফ,—উড়ুনীর ভিতর দিয়ে দেখা যায় গলায় একগোছা সামবেদী পৈতা। বয়স আন্দাজ বছর চল্লিশ,—স্বাস্থ্য ভালো। তিনি বেত নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁর চোখ কোমল হয়ে আসে। শুধু বলতেন, তোর কি কেউ নেই!

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলতুম। সর্বাঙ্গে জল ঝরছে, আর ভাবছি, কত বড় অপরাধী আমি!

গুরুমশাই ভীষণ রবে বলতেন, যা বাড়ী যা, আজ তোর ছুটি!

এইটুকুই চাই। আজ বর্ষার ছুটি, বৃষ্টিতে ভিজতে পারলেই ছুটি, পথে জল দাঁড়ালে ছুটি, কিন্তু সারাদিনের সুদীর্ঘ ছুটি নিয়ে কী করব? পড়াশুনো ভালো লাগে না, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে আবছায়া অন্ধকারের নিষ্ক্রিয়তা, যারা সঙ্গী সাথী তাদের অভিভাবকরা কঠিন লোক, স্বচ্ছন্দ জীবনের অভিব্যক্তি কোথাও নেই! সমস্ত দিন কী করব, তার চেয়ে বড় কথা—নিজেকে নিয়ে কী করব! মেঘের ডাকে বর্ষা ঘন হয়ে আসে, পথের লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, গৃহস্থদের দরজা জানলা সকাল থেকে খোলেনি, বৃষ্টিভেজা কুকুরদেরও আশ্রয় জুটে গেছে,—কেবল আমার দিন আর কাটে না। আকাশে আকাশে দিগন্ত জোড়া কী ব্যাকুলতা, আর আমার ক্ষুধার্ত মনের কী রহস্যময় আকুলতা ওই জল ধারাকে কেন্দ্র ক'রে! আমার দিন কিছুতেই কাটে না।

সুতরাং আমি ঘুরে বেড়াতুম পথে পথে। পাড়ার ছেলে যারা আমার সঙ্গী ছিল, তারা প্রায়ই দোতলার জানালা খুলে দেখতো আমি জলে ভিজে পথ পেরিয়ে চলেছি। বস্তির আনাচে কানাচে আমি। ক্ষিরি নাপতিনীর গলি পেরিয়ে, কাণা গঙ্গার-মার ঘর ডিঙ্গিয়ে, আস্তাবলের ভিতর দিয়ে, সর্বাধিকারীদের বাড়ীর ধার দিয়ে, খৃষ্টানদের মেসবাড়ী ছাড়িয়ে,—আমি ঘুরে বেড়াই নিজেরই ঘূর্ণাবর্তে। নিজেকে নিয়ে ঘুরছি, নিজের চারদিকে ঘুরছি, নিজেকে ঘোরাচ্ছি। কোন্ ছেলে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হয়ে গেল, কার উন্নতি হোল, কে কোথায় সুখের সন্ধানে গেল, কার সৌভাগ্য দেখা দিল, কত বন্ধু, কত আত্মীয়, কত জন, কত জনসাধারণ গেল চারিদিকে কত লক্ষ্য নিয়ে,—কিন্তু আমার সামনে রইলো বর্ষা, ভিজে বেলগাছ, নালার জলস্রোত, শ্যাওলাপড়া পাঁচিল বেয়ে নামা জলের ধারা,—আমি কেবল ঘুরে বেড়ালুম আপন মনে, অন্য মনে, জলধারার অর্থহীন আকর্ষণ নিয়ে!

অবশেষে আনন্দের আর উল্লাসের কোনো আশ্রয় না পেয়ে বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে উঠতুম নির্জন বৃষ্টিভেজা ছাদে। সেখানে আমাদের ছিল পূজোর ঘর—ভিতরে থাকতো বাণেশ্বর শিব। দিদিমা পূজো করতেন। সেই শিবের ঘরের পাশে গিয়ে চুপ ক'রে চোরের মতন দাঁড়িয়ে থাকতুম। সামনের নিমগাছের একটা গোপন ডালে কাক ব'সে থাকতো চুপটি ক'রে। দূরে দেখা যেতো কচিদের বাড়ীর পাশে রহস্যঘেরা অন্ধকার অশ্বত্থগাছটা। আমার দৃষ্টি ওই অশ্বত্থগাছটার ছায়ান্ধকারের নীচে মুনিঋষিদের তপোবন খুঁজে খুঁজে হায়রান হোতো।

ক্ষীরোদসমুদ্রের মাঝখানে অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন নারায়ণ, আর বাসুকির সহস্রনাগ তাঁর মাথায় ধরেছেন ছত্র! আহ্নিকের আসনে ব'সে গঙ্গাজলে কুশি ডুবিয়ে মা আচমন করতেন, গঙ্গেচ যমুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী— ওরা নাকি সবাই নদী! কোথায় কতদূরে সেই সাত ভগ্নীর দল! কোথায় লোহিত সমুদ্র—যেখানে হনুমান গিয়েছিলেন সীতার খোঁজে? কোথায় সরযূ—যার তীরে লক্ষ্মণ নির্বাসন দিয়ে এলেন চিরদুঃখিনী জনক-দুহিতাকে? কোথায় সেই মকর-বাহিনী গঙ্গা—যিনি একে একে গ্রাস করলেন সাতটি সন্তানকে? স্বপ্নে দেখি মৈনাক মাথা তুললেন সমুদ্রের তলা থেকে,—সাগরবন্ধনের সুবিধা হোলো। সমুদ্র মন্থনে উঠলো গরল,—শিব গিয়ে সেই গরল পান করলেন, তাঁর নাম হোলো নীলকণ্ঠ।

দিদিমা গল্প করতেন আরো কত কী! গঙ্গা-বন্দনা অথবা গঙ্গাস্তোত্র পড়া হোতো,—আর আমাদের বলতে হোতো সুর করে—"দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে।" মুনির শাপে সগর রাজার বংশ নিধন হোলো —ভগীরথ ডেকে আনলেন গঙ্গাকে, সেই গঙ্গার মিলন হোলো কোন্ অকূল মোহানায় গিয়ে। সগরবংশ উদ্ধার হোলো। ঐরাবত নাকি ভেসে গিয়েছিল গঙ্গার স্রোতে সে কী স্রোত, তরঙ্গের কী রঙ্গভঙ্গ! গোমুখী থেকে নিঃসৃত হচ্ছে গঙ্গা— যেখানে মানুষ যায় না, সেটা ব্রহ্মলোক—হিমালয়ের কোন্ পার থেকে কোন্ পারে,

—তারপরে গঙ্গোত্রী, সেখান থেকে কৈলাস! মহাদেবের জটায় বাসা নিয়েছেন গঙ্গা,—অর্থাৎ মহাজট হিমালয়ের রহস্যজটিলতা থেকে নেমে এসেছেন পুণ্যবাহিনী গঙ্গা! কোথায় হিমালয়, কোথা ঐরাবত, কোথা বা মহাজট,—কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেন সেই ভাগীরথীর কলস্রোত, কেন জলকল্লোলের ডাক শুনি? আমার শিরা উপশিরা অন্ত্রতন্ত্র, আমার ভিতরের অগণ্য আবর্ত ঘুরে যেন গঙ্গার ধারা বয়। আমার ভিতরে জলের ডাক, গঙ্গার ডাক, অকূল মোহানার ডাক, ঐরাবতের ডাক, অনন্ত সাগরের অবিশ্রান্ত ডাক। যেন মন্থিত কোন্ সাগরের সমস্ত গরল আমিই পান করেছি, আমিই শঙ্খনাদ ক'রে গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে ডেকে এনেছি কপিলের আশ্রম-তপোবনের প্রান্তপথে,—আমি সব, আমি সবাই, আমি সর্বজনসাধারণ। আমি যেন ছড়িয়ে রয়েছি মানববংশপরম্পরার অন্তরে অন্তরে।

নিজের বুকের ভিতরে শুনতে পেতুম অপরিণামদর্শী অন্ধ চঞ্চলতা। কিন্তু চুপ ক'রে থাকতুম। তখন দিদিমাদের একাদশীর আসরে মা সুর ক'রে প'ড়ে যেতেন রামায়ণ অথবা মহাভারত। একাদশীর দিনে কাজকর্ম কম। অবেলায় বৃষ্টি নামবার আগে ঘরকন্নার পাট সেরে মাদুর বিছিয়ে পৌরাণিক কাহিনীর আসর বসতো। আমি ছিলুম সর্বপ্রধান নিয়মিত শ্রোতা। রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন-কাহিনীর সূত্র ধ'রে আমার উদ্বেলিত উৎসুক প্রাণ বর্ষার মেঘমলিন আকাশপথ বেয়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো।

হঠাৎ আসতেন সেজমাসিমা। তাঁর আসা আর যাওয়া চিরদিনই আকস্মিক। তিনিও বিধবা, শক্ত-সমর্থ দেহ। দিনমানে তাঁর সাহস অপরিসীম, কিন্তু রাত্রে টিকটিকির শব্দেও তিনি ডরিয়ে ওঠেন। তিনি এলেই বাড়ীতে সোরগোল প'ড়ে যেতো, তাঁর কলকণ্ঠ বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়েও শোনা যায়। তাঁর কাছাকাছি যেতে সাহস হোতো না, কারণ তাঁর তামাসায় একপ্রকার বিদ্রূপের খোঁচা থাকতো। কিন্তু তাঁর কাছে শুনতুম ইতিহাস, কাহিনী, কানাকানি। তাঁর বাড়ী চুঁচুড়ায় কোন খোড়োবাজারের ওদিকে। সেখানকার মেছোঘাটে লম্বা লম্বা কুমীর এসে সেজ মাসিমার জন্য ওৎ পেতে থাকে, সে দেশ নাকি তুমুখো সাপে ভরা। সেখানে বাঘ ভাল্লুক ছাড়া আর যারা আছে, তারা নাকি মন্দ লোক, সেখানে পাড়ায় পাড়ায় চোরের দল। চুঁচুড়ার নির্জন কোন্ ঘাটে নাকি ডাকাতের নৌকা এসে প্রত্যেক রাত্রেই লাগে। তারা নদী থেকে হাঁক দেয়, গ্রাম ছেড়ে নাকি লোকেরা পালায়! সেজমাসিমা দীর্ঘ

রাত জেগে জেগে সেই সব গল্প দিদিমাকে শোনান। দিদিমা সারাদিন পরিশ্রমের পর হয়ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, তখন সেজমাসিমা এদিকে ফিরে মাকে তোলেন জাগিয়ে। শ্রোতা হিসাবে মা ছিলেন অতিশয় শান্ত ও আর ধৈর্যশীল। সুতরাং সেজ মাসিমার গল্প শেষ হোতো যখন, তখন কাক ডাকতো। তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে চুপ করতেন, এবং তাঁর নাক ডেকে উঠতো। আমার যেন নেশা লাগতো তাঁর গল্পে।

কিন্তু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতুম সেজমাসিমা যখন তাঁর ভ্রমণকাহিনী ব্যক্ত করতেন। চুঁচুড়ার কোন্ শানবাঁধানো ঘাট থেকে তিনি নৌকায় উঠতেন, আর ওপারে নাকি নৈহাটি। গঙ্গা নাকি এখানে প্রকাণ্ড, তা'র এপার ওপার দেখা যায় না। সেজমাসিমা নৌকায় উঠলেই নদীতে নাকি ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসতো। কারণ জলের সঙ্গে আর গঙ্গার সঙ্গে তাঁর চিরকালের আড়ি। শুধু কি বান? হয়ত শীতকালের দুপুর, তবু কালো মেঘ ভ্রুকুটি ক'রে উঠে দাঁড়ায় সেই পশ্চিমের কোণে, —দেখতে দেখতে ঝড়, অর্থাৎ কাল-বৈশাখী! নৌকা দুলে উঠলো,—সেজমাসিমার ছিল হৃদ্‌রোগ—তাঁর দাঁতকপাটি লাগলো। তাঁর চেতনা লোপ পাবার আগে তিনি উচ্চারণ করলেন, বিপদতারণ মধুসূদন,—মা পতিতপাবনী, কুল দাও মা—বিপদে তুমি রক্ষা কর মা!—অমনি গঙ্গার ঢেউ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ওঠে ওই উঁচু নারকেল গাছ ছাড়িয়ে। নৌকা তখন গেল গেল,—মাঝি হাল ছেড়ে দিল, মাল্লারা কেঁদে উঠে নামগান করতে লাগলো।

শুনতে শুনতে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের আওয়াজ কোন্ সময়ে যেন থেমে যায়। ছবিটা দেখতে পাই কল্পনায়। অনন্ত জলধি থৈ-থৈ করছে চারদিকে, কাল-বৈশাখীর মাতন সমগ্র সৃষ্টিলোকের ঝুঁটি ধরে টান দিচ্ছে, নৌকা বানচাল হয়ে ঘুরছে নদীর মাঝখানে, যতদূর দৃষ্টি যায় অকূল পারাবারে কোথাও পৌঁছবার উপায় নেই। এমন সময় আকাশ ফেটে দৈববাণী হোলো। স্বর্গের দেবতারা এসে অচেতন সেজমাসিমার কানে কানে বললেন, মা ভৈ!

নৌকা এসে নৈহাটির ঘাটের ধারে লাগে!

সেজমাসিমার নৌকা ঘাটে লাগে বটে, কিন্তু আমার প্রাণের নৌকা দড়াদড়ি ছিঁড়ে কোথায় ভেসে চ'লে যায়—কোন ঘাটেই সে লাগে না! মরণের লোভে সে যেন গঙ্গার অতল তলে ক্ষণে ক্ষণে তলিয়ে যেতে চায়! কি আছে সেখানে? অতল যদি হয় তবে সে কত নীচে, কোন্ লোকে? সেখানে পাতালের দেশ. সেখানে থাকে নাকি

পাতাল-কন্যা ঘুমিয়ে! সেখানে বাসুকি ব'সে আছেন পৃথিবীকে মাথায় নিয়ে। একটু নড়লেই অমনি পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। কিন্তু অতল পাথার যদি হয় তবে কোথা? কোথা পাতালকন্যা, কোথা বা বাসুকি? আমি কেবল অনুভব করি অন্ধ, গূঢ়, মূঢ় জলস্রোতের ঘননিবিড় কল-কল্লোল!

তাই সেজমাসিমা এলেই জলের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। কোথায় প্রসন্নবাবুর ঘাট, কোথায় ফরাসডাঙ্গা পেরিয়ে ব্যাণ্ডেলের পুল, কোথায় কোন্ খাল গিয়েছে এঁকেবেঁকে কতদূরে, কোথায় কাঁকনাড়ায় নেমে গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হয় ষাঁড়েশ্বরতলা,—এর আদ্যন্ত ভূগোল আর মানচিত্র আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতুম। ক্ষুধা জাগতো, বাসনায় চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসতো,—আমার প্রাণের সুদীর্ঘ লোল-জিহ্বা সেজ মাসিমার সমগ্র ভ্রমণ অভিযানটাকে যেন পলকে পলকে লেহন ক'রে নিত।

স্বপ্নে দেখি, যেন কোন্ একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরেছি,—কোথায় যেন নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, থামবার উপায় নেই। কী যন্ত্রণা ঘুমের মধ্যে,—থামতে পারছিনে। কে যেন টানছে, কে যেন ঠেলছে, কে যেন ডাকছে। আর কতদূর, আর পারিনে। চোখ বন্ধ ক'রে সঙ্কীর্ণ গুহাপথের অনন্ত তমিস্রলোকের পথ ধ'রে চলেছি। তারপর এসে পৌছলুম বিস্তীর্ণ সীমানায়, সেখানে অন্তহীন অস্পষ্টতা, সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ: কিছু দেখা যায় না, কিছু জানা যায় না—শুধু জানি যেতে হবে—ওই রহস্যপাথারের দিকে। কেন ভয়ে কাঁপে বুক, কেন চোখ কেঁপে কান্না পায়? কিন্তু তবু যেতে হবে, জীবনকে পিছনে ফেলে রেখে ওরই মধ্যে ঝাঁপ দিতে হবে। থামবার উপায় নেই, পিছন ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই,—সীমাহীন জলধিপাথার আমার সকল সত্তার মূল ধ'রে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টানছে।

ঘুম ভেঙে যায়। আর্তকণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিশ্বাস ফেলি।

দাঁড়াও, একটু থামতে দাও। আজ এই যে সব বলতে বসেছি, এ কি সত্য? সেই নাবালক শিশু-দার্শনিকের চিত্তে কি কোথাও মিথ্যার ছায়া ছিল? আজ সেই বাল্যকালের চিন্তাবিভ্রমের কথা বলতে বসে ভাবকে কি প্রতারিত করছি? সেদিনকার শিশুবালক কি আজকের এই অভিব্যক্তিতে অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে? কত দাগ বসেছে, কত পলিমাটি পড়েছে, কত রং লেগেছে, কত বর্ণ ঝাপসা হয়েছে,—কিন্তু জন্মজন্মান্তর

জলে কল্লোলে

[illegible]রে আমি যে জলের অতৃপ্ত পিপাসা ব'য়ে চলেছি, একি মিথ্যে ? রামধনু মিথ্যে নয়, নীল আকাশ আর রঙীন মেঘ মিথ্যে নয়, সাগরের নীলিমা মিথ্যে নয়,—মিথ্যে নয় চোখের তারায় প্রতিবিম্বিত সৃষ্টির বিপুল স্বপনলোক। জলে দাগ পড়ে না জানি, জলের কোনো ভাষা নেই জানি, জলের মধ্যে জলজ্যোতি-লেখক নেই তাও জানি। তবু গঙ্গাকে কেন বলি বাণীবাহিনী ? কেন সরোবরকে বলি তপস্বী ? কেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে বলি দানবের উন্মত্ততা ? এরা কি দেখার গুণে সত্যি নয় ? দেখার দোষে মিথ্যে হয়ে যাবে ?

আজ সেদিনকার কথা যে বলতে বসেছে সে বালক নয়,—কিন্তু যার কথা বলতে বসেছি সে নাবালক। নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি জগতে সে দাঁড়িয়েছিল, চেতনা আর অবচেতনায় সে মিলিয়ে ছিল, দেখা আর না দেখায় সে জড়িয়েছিল, দিনমান আর সন্ধ্যার সন্ধিস্থলের গোধূলিতে সে বেড়িয়েছিল !

আন্দাজ করতে পারি সেটা চৈত্র মাস। আকাশে প্রখর সূর্যের আগ্নেয় সভা বসেছে। ধূসর তার বর্ণ। আমাদের পল্লী নিশুতি। নির্জন নীচের তলায় যাওয়া নিষেধ। একা গেলে নাকি ভূতে ঢেলা ছুঁড়ে মারে। সিঁড়ির তলার দিকে তাকালে গা ছমছম করে। পশ্চিমের উঠোনে বেলগাছের দীর্ঘ ছায়া নেমেছে,—ঝিলিমিলি ক্লান্ত ছায়া। আন্নাদের বাড়ীর পাঁচিলে ত্বপুর বেলাতেও বেম্মদত্যি খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে যায়, বুকের পাটা কারো নেই সেদিকে তাকায়। বেলগাছের ছায়ায় ব'সে বিকৃত-কণ্ঠে কাক ডাকে, দূরের নারকেল গাছ থেকে চিলের ডাক শোনা যায়, শালিকরা কলকণ্ঠে বিবাদ ক'রে পালায়। এমনি নির্জন ত্বপুরে শোনা যায়, অগ্নিকোণের দিক থেকে লোহাকাটার করুণ উদাস ঠং ঠং শব্দ ! কী যে ক্লান্ত সেই আওয়াজ,—কী যে বিষণ্ণ আলস্যের ঘণ্টারব ! লোহার কড়ি কাটছে ছেনি দিয়ে কোনো শ্রমিক,—কিন্তু কী তার আওয়াজ ! যতদূর দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায়—যেন কেমন উদার উদাস ঘণ্টার রব সংসার সীমানা উত্তীর্ণ ক'রে নিয়ে যায়,—মন আর ফিরে আসে না। উপরতলায় ছোট বোন তখন হয়ত ঘুমপাড়ানি স্বরে ব'লে চলেছে, "চীৎপুরের মাঠেতে বালি চিকচিক করে, সোনামুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে !" আমি দেখতে পাই, ওই অদৃশ্যমান শ্রমিকের কপাল ফেটে যেন রক্ত ঝরছে ! কেউ ত্বঃখ পায়, কেউ আঘাত খায়,—কী যে যন্ত্রণা আমার মস্তিষ্কে, কী যে কান্না আমার ত্বই চোখে !

বেলগাছের শুকনো পাতা ঝরছে উঠোনে, দক্ষিণে দাওয়ায় সেগুলো রাশি রাশি

হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী প্রখর রোদ সেদিন। চৈত্রের একাদশী তিথি। সেজ মাসিমা এসে গল্প ফেঁদেছেন তেতলার শিবের ঘর থেকে আহ্নিক সেরে দিদিমা নেমে এসে সেই গল্পের আসরে যোগ দিয়েছেন। নির্জন দুপুরের দিকে গা ঢাকা দিয়ে আমি নীচে নেমে গেলুম।

ভূত ঢেলা মারবে এ ভয় ছিল, সিঁড়ির তলার আনাচে কানাচে কা'রা যেন চলে বেড়ায়—সে আতঙ্কও ছিল বৈ কি। চৌবাচ্চার ওদিকে পিশাচ এসে রক্ত খায়, আর ছাগলের মুণ্ড লটপট করে—সে দৃশ্যও যেন চোখে দেখছি। তবু ভাড়াটে মহলের শূন্য পুরী পেরিয়ে আজ যেন বেপরোয়ার মতন গিয়ে দাঁড়ালুম চৌবাচ্চাটার ধারে। যক্ষীবুড়ি থাকে ঠিক এইখানটায় কোথাও, কিন্তু আলো এদিকটায় না থাকলেও এটা দিনের বেলা। আকাশে প্রখর রোদ, ওদিকে শানবাঁধানো উঠোনে বেলগাছটার ঝিলিমিলি ছায়া, শালিক ডাকছে কোথায়, কাঁসারির ঘণ্টা শোনা যায় বাড়ীর বাইরের পথে,—আশ্চর্য, আমি আজ ভয় পাচ্ছি নে!

চৌবাচ্চাটার শান-বাঁধানো পাড় কী স্নিগ্ধ! ভিতরে যেন অগাধ স্নেহের শীতলতা। ছলছল কালো জল থৈ থৈ করছে। কী রহস্য ওই স্বচ্ছ সুন্দর নির্মল জলে, কী আনন্দে ওর সর্বাঙ্গ টলোমলো! আমি উঠে বসলুম তার পাড়ে। আজ যেন আমার নতুন আবিষ্কার, তোরণদ্বার যেন আজ খুলে গেল। যা দেখিনি, যা আশা করি নি, সেই অপার বিস্ময় আমার করতলগত। কী রহস্য ওর মধ্যে, কী নৈঃশব্দ্য ওর অন্তরে, কী অন্তর্গূঢ় অবিচ্ছিন্নতা! হাতছানি দিয়ে ডাকে, কিন্তু কী নির্বাক লোলুপতা! শ্যাওলা-পড়া সিঁড়িগুলো ডুবে গেছে আমি পা ঝুলিয়ে ডুবিয়ে বসলুম।

ইতিমধ্যে উপরতলায় আমার খোঁজ পড়েছে। মাসিমা হৈ চৈ তুলেছেন, ছোট বোন ছুটছে, দিদিমা হাঁক দিচ্ছেন, মা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে এখানে দেখলে লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না। কারণ, নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছি, এই দিকেই ওরা সবাই ছুটে আসছে। আমার সঙ্গে চৌবাচ্চাটার বন্ধুত্ব ওরা জানে!

বোধ হয় ভিতরের সিঁড়িতে পায়ের চাপ দিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু সিঁড়ি ছিল পিছল। শরীরের ভারসাম্য সহসা ঠিক রাখতে পারলুম না,—পা পিছলে চৌবাচ্চাটার ভিতরে পড়ে গেলুম!

এ কোথায় চলেছি, কতদূরে? কী দেখতে পাচ্ছি রহস্যের পাথারে তলিয়ে? এ কোন্ লোক? কানের ভিতরে প্রাণের ভিতরে এ কী কল্লোল? চোখ খুলে

রেখেছি, মন খুলে অবারিত করে দিয়েছি,—কিন্তু এই কি অতল আঁধার? কোথায় আমি? কে আমি? কী আমি? কী সংগ্রাম এর তলায়-তলায়। মৃত্যুর কী নিবিড় ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে! আমার প্রাণসত্তার সমগ্র প্রসারিত চেতনা সঙ্কুচিত হয়ে এসে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো কোথায় যেন ধুক্‌ধুক্ করতে লাগলো—

তখনও আমার ছয় বছর পূর্ণ হয় নি!

*

* *

দিদিমা বলতেন, সত্তর বছর বয়েস হ'তে চললো, আর কেন ভাই, এবার আমি কাশী যাবো। উনি বলতেন, বল তীর্থ কাশী, বৈকুণ্ঠবাসী!······চোখের সামনে চার-চারটে জামাইয়ের মাথা খেয়ে ব'সে আছি বাবা······

হুস ক'রে তাঁর শোকা-তাপা চোখে জল এসে পড়তো।

বাদলের হাওয়ায় দিদিমার গা ঘেঁষে ব'সে তাঁরই আধখানা আঁচলের ঢাকা দিতুম গায়ে! এক সময়ে ব'লে বসতুম, আচ্ছা দিদিমা, দাদামশায়ের বুঝি ছাগল-দাড়ি ছিল?

ছানিপড়া চোখে দিদিমা ভুরু কুঁচকে এই দুঃসাহসী অর্বাচীনের দিকে একবার তাকাতেন। আমি ফস ক'রে বলতুম, তবে কেন মামা ছাগল-দাড়ি রাখে?

মামার নিন্দায় দিদিমা খুশী হতেন। বলতেন, ওর নাম মুখে আনিসনে বাবা। কুলাঙ্গার, কালনিমে! এক তরকারী নুনে পোড়া, নেশাভাঙ ক'রে নিজে সব ওড়ালে, আমাকেও পথের 'বেগার' করলে!

—আর আমার কিছুতে দরকার নেই বাবা, আমি কাশী যাবো। আহা কাশী, বারাণসী! গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল!

কাশী কতদূরে, দিদিমা?

আ কপাল, আজকাল রেল হয়েছে তাই, নৈলে নৌকোয় আগে লোকে যেতো তিন মাসে। আমার বাপের আমলে হেঁটে যেতো লোকে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন! গঙ্গায় তখন থাকতো ডাকাতে নৌকো······তীর্থে গেলে লোকে আর তখন কেউ ফিরতো না। কাশীর তুল্য কি জায়গা আছে বাবা? পঞ্চক্রোশী কাশী—এপাশে অসী, ওপাশে বরুণা! আহা, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী······

ছবি ফুটতো আমার চোখের সামনে। কত রং ঢালা সেই ছবিতে, কত আঁকা-জোকা। বারাণসী কোথায় কতদূরে তা জানিনে, কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম কূল! ওপারে

দেখা যায় নীল মেঘ, সীমানায় কালো কাজলের মতো আঁকা অরণ্য রেখা, অপরাহ্ণ বেলায় লাল বেগুনী সোনার আলো নেমেছে মন্থর গঙ্গার স্রোতে, পালতোলা নৌকা ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে কোন্ অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে,—আর এপারে নিমতলার শ্মশান-ঘাটা,—বটের ঝুরির ভিতরে জ্বলন্ত চিতার ধোঁয়া উঠছে, আর জলবাহিনীর কোন্ অলক্ষ্য প্রান্ত থেকে হয়ত কোনো সংসার-বিরাগীর করুণ গান শোনা যাচ্ছে,—লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়—

গঙ্গার পশ্চিম কূল!

কিন্তু বোধোদয় আর শিশুশিক্ষার পাঠের মধ্যে-মধ্যে আমার পথহারা দুটো চোখ খুঁজে বেড়াতো ওই ছত্রটা! ছোড়দার সঙ্গে হেদুয়ার বাগানে আর দীঘির চারপাশে আনমনে বেড়াতুম,—আর বায়ুকোণের দিকে যে প্রকাণ্ড দেবদারু গাছটা ছিল, যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় অগণ্য অদৃশ্য পাখীর উচ্চ অশ্রান্ত কলকাকলী শুনতুম,—আর যখন ঘুরতুম হেদুয়ার অক্লান্ত চক্রান্তে,—আমার কাণভ'রে আর প্রাণভ'রে প্রতিধ্বনিত হোতো দিদিমার ওই কথাটা, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল!

ঠিক জানা ছিল না বারাণসীর পথটা। কাত্যায়নীদের বস্তি পেরিয়ে গেলে নাকি গোয়াবাগান, তারপর আতাবাগান, তারপর নাকি পেয়ারাবাগান। ওদিকে গেলে রায়বাগান, পিছন দিকে পুঁটিবাগান, পশ্চিম দিকে গেলে নাকি চোরবাগান—সেখানে যেতে হয় ভট্চার্যিবাগান আর কাঁসারীপাড়া পেরিয়ে। এদের পেরিয়ে আমাকে যেতে হবে। আমাকে যেতে হবে বারাণসী, যেতে হবে সেই সেদিকে যেদিকে গঙ্গার পশ্চিম কূল। ছাদের উপরে উঠে দেখতুম, পশ্চিমের বিশাল বস্তি-পল্লী পেরিয়ে রহমনের আস্তাবল ছাড়িয়ে ক্ষিরি নাপতিনি আর নন্দ চৌধুরীর গলি ডিঙিয়ে কবিরাজদের পাড়া পেরিয়ে চলে গেছে আমার সামনের শূন্যলোক সেই সুদূর নৈর্ঋত কোণের দিকে। হয়ত সেইদিকে বারাণসী, সেইদিকে হয়ত গঙ্গার পশ্চিমকূল। চেয়ে থাকতুম একাগ্র হয়ে সেইদিকে। খোকা মিত্তির আর তিনকড়িরা ঘুড়ি ওড়াতো আকাশে। লাটাইয়ের সুতো ছাড়তে, ঘুড়ি এগিয়ে যেতো আকাশে ঘুরে ঘুরে,—ঘুরতো ডানদিকে ঘুরতো বাঁদিকে,—একা ঘুড়ি অনন্ত আকাশে, একা চলেছে সে ঘুরে ঘুরে,—আর তার সঙ্গে চলেছে আমার দুই চোখের তারা, আমার প্রাণ, আমার সমগ্র সত্তার সহস্রমুখী ধারা।

একদিন অজ্ঞান বালক বেরিয়ে পড়লো বারাণসীর পথে। গলি আর বস্তি পেরিয়ে ট্রাম রাস্তা ছাড়িয়ে কাঁসারীপাড়া থেকে কোথায় যেন চাষাধোপাপাড়া—তারপর কোথায়

জোড়াসাঁকো না কোন্ দিকে—তারপর আর কিছু মনে নেই ! সারাদিন অনাহার, সারাদিন পথ হাঁটা আর বারাণসীর পথ খুঁজে বার করা, সারাদিন গঙ্গার পশ্চিম কূলের জন্য কস্তুরীমৃগের মতো ঘুরে বেড়ানো। পথে পথে ব'সে পড়া, পথে পথে কলের জল খাওয়া—কিন্তু কোথা বারাণসী, কোথা সে দুর্লভ তীর্থ, কোথা বা পশ্চিমকূল ?

সন্ধ্যা যখন ব'য়ে যায় সেই সময় এক পাহারাওয়ালা জমাদার আমাকে নিয়ে এলো বাড়ী ফিরিয়ে। বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে, এত চীৎকার আর কলকোলাহল। ছেলেকে নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে !

পাহারাওয়ালাটা জানালো, আমি নাকি হাবড়া পুলের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলুম ! সেই জগন্নাথের ঘাট পেরিয়ে…ভাগ্যি গাড়ী চাপা পড়িনি !

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নিজের দুই কান ধ'রে দাঁড়া-গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছিল। এবং শোবার আগে চুপি চুপি দিদিমাকে বলেছিলুম, তুমি কাশী যেয়োনা দিদিমা।—ওরা আমাকে মারতে এলে এরপর কে আগ্‌লাবে ?

কথাটা মিথ্যা নয়। দিদিমা চোখের সামনে থেকে স'রে গেলে যে আমার পায়ের তলাকার মাটি স'রে যাবে এটা বোঝবার বয়স তখন হয়েছে। তিনি চোখে কম দেখেন এটা আমার সুবিধে। তিনি তেতলায় ঠাকুর ঘরে গিয়ে পূজোয় বসলে পিছন থেকে আমি শশাটা কলাটা হাত সাফাই করি। তাঁর বাক্স থেকে তামার পয়সাগুলি গুণে দেবার সময় আঙ্গুলের ফাঁকে দু' একটা সরিয়ে ফেলি, তাঁর দশগাছা পাকা চুল তুলতে পারলে এক পয়সা মজুরি। ইস্কুল থেকে এসে কান্না ধরলে দই কেনার পয়সা তিনিই দেন। তাছাড়া মারধরের সময় তাঁর মতো অশ্বত্থবৃক্ষের কোটর না পেলে হাড়গোড় যে আমার গুঁড়ো হয়ে যাবে ! ভাই-বোনদেরও অতি সহজে বরখাস্ত করতে পারি, কিন্তু দিদিমা—অসম্ভব।

সুতরাং দিদিমার সম্মতি পেলেই একা হেদুয়ায় যাওয়া সহজ। সে কী স্বাধীনতা ! চেখে-চেখে রেখে-রেখে সেই স্বাধীনতা ভোগ করা। হেদুয়া-জোড়া জল,—সেই বিরাট জলাশয়ের আয়তনটা হাঁসের ডিমের মতন। ছলছলে ঢলঢলে বিশাল জল। পূব আর পশ্চিমে শান বাঁধানো সিঁড়ি। পাক দেবার সময় সিঁড়িগুলো যেন আল্‌গা হয়ে ডাকে, আয় আয় ! কী কালো, কী নধর মসৃণ জল, কী গভীর ! কী যেন বলে, কী যেন বলাতে চায় ! ওর উত্তর পূব কোণে ছিল কাঁটা গোলাপের ঝোপ, আর দক্ষিণ পূবে ছিল নীল অপরাজিতার ঝাড়। জবা ছিল দক্ষিণে,

—লোভ ছিল সেই রক্তবরণের প্রতি। শীতের প্রভাতে দেখেছি হেদুয়ার কুয়াশা জড়ানো জল, বর্ষায় দেখতুম ঝিলিমিলি ঝালরের স্বপ্ন। ওর জলে লুকিয়ে ফেলতুম পাথরের ঢেলা, টুপ ক'রে অগাধের নীচে সেটা ডুবে যেতো—আমার মন চ'লে যেতো নীচের দিকে সেই ঢেলাটার সঙ্গে সঙ্গে,—সেই যেখানে যক্ষীবুড়ির নিগূঢ় গুহালোক। উপরটায় দেখতুম জলের কম্পন। সেই কাঁপন ধীরে ধীরে ভেসে এসে লাগতো পাড়ের ধারে। পশ্চিম পাড়ের গির্জার চূড়ো আর দেবদারু গাছটা প্রতিবিম্বিত হয় জলের তলায়। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—তারাও মুখ দেখে জলের ভিতরে। ওরা আলাদা নয়, ওরা আমারই ছায়া, আমারই কায়া,—ওদের মধ্যে আমার প্রাণও মেলানো থাকে।

শনিবারের ছুটি হলে দুপুরবেলায় ফিরি হেদুয়ার ভিতর দিয়ে। দীঘির চারিপাশ তখন জনহীন। কেবল উত্তর দিকের আচ্ছাদনটার নীচে ব'সে থাকতো জনকয়েক বৃদ্ধ। গার্হস্থ্য জীবনে তা'রা বাতিল, তারা বেকার, তা'রা দিনের বেলা ঘুমোয় না—পাছে রাত্রে ঘুম না হয়। তাদের ছিল পরচর্চা, বাজার দর, মেয়ের বিয়ে, হাঁপানী, আফিম, তামাক, যুগনিন্দা, নীতিকথা। আমি দেখতুম খররৌদ্রে উদাসীন জলাশয়। খোয়ার রাস্তা দিয়ে ঘড়ঘড় ক'রে ছ্যাকৃড়া গাড়ী আর হলুদে রংয়ের অনেক দরজাওলা ট্রামগাড়ী ছোটে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান যায় গান গেয়ে—আমি চেয়ে থাকি জলাশয়ের অতল-তলের দিকে। জলের হাওয়া আসে দক্ষিণ পথ বেয়ে, উদাসী দুপুরের সন্ন্যাসী হাওয়া। আমি দাঁড়িয়ে থাকি রেলিং ধ'রে। জলটা নির্বোধ, নিস্তরঙ্গ, নির্বাক, এ জলটা বন্দী, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা,—এর স্রোত নেই ব'লেই শ্যাওলা পড়ে। স্রোত নেই, তাই ভাষা নেই, তাই প্রাণহীন। কিন্তু আমিও কি তাই? কেন আমার কাজ নেই? কেন কান্না ওঠে ভিতর থেকে? কেন ভাবনার শতপাকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা? কেন সকলের আনন্দের বিষয়বস্তুতে আমি বিরক্তির চেহারা দেখি? কেন ভালো ছেলে হ'তে পারিনে সুধীরের মতন? কেন আঁক কষতে পারিনে শচীনের মতন?

যেন এক বিরাট অঙ্ক ভ'রে রয়েছে চারিদিকে। যতদূর দেখতে পাই অঙ্কের জটিল জাল। যোগে ভুল হয়, বিয়োগে মেলে না, একগুণ শতগুণ হয়ে ওঠে,—তারপর কী দিয়ে ভাগাভাগি? জানিনে, কিছু জানিনে, কিছু পারিনে! ওই জলাশয়, অত মসৃণ, অত কোমল—কেন সব অঙ্ক জলের মতো তরল হয় না? উঠুক, ওর ভিতর থেকে উঠে

দাঁড়াক প্রকাণ্ড এক তরঙ্গ,—এই বিশ্বব্যাপী জটিল অঙ্কের শতপাক চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিক্।

কালীঘাটে সবাই মিলে যেতুম কালে-কস্মিনে। ভাড়াটে ছ্যাকড়া গাড়ী ছুটতো খোয়া-বাঁধানো পথে। চাকার শব্দ এমন যে, ভিতরে ব'সে কেউ কারো কথা শুনতুম না। মোটর ছিল তখন দুচারখানা, মোটরবাস ও লরী তখন অজ্ঞাত, রিক্সা স্বপ্নবৎ, সাইকেল ক্বচিৎ—ছিল শুধু সোনার বেনেদের ল্যাণ্ডো। কালীঘাটে গেলে জলের অভাব ছিল প্রচুর, তা'র চেয়ে প্রচুর ছিল তেলেভাজা ফুলুরি আর পাঁপর। অর্থাৎ কালীঘাটে কলেরা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক। ভবানীপুর পর্যন্ত সামনের অংশটা ছিল লোকের বাস, ভিতরে ভিতরে জলা আর পুষ্করিণী,—এবং তারপর থেকে মনোহর-পুকুর অবধি লোকে দিনের বেলায় সাহস ক'রে যেতে পারতো। সেখান থেকে যতদূর দৃষ্টি চলে, অগম্য জঙ্গল আর ধানক্ষেত আর নারকেলের বন এবং গ্রাম্য বস্তি। টালীগঞ্জের দিকে নাকি তখনও বাঘ আসে। সন্ধ্যার সময় কোথাও তেলের আলো জ্বলে টিমটিমে।

কালীঘাটের মন্দির আর পল্লী তখন অনুন্নত। আশেপাশে মেঠো বস্তিতে থাকে অনেক দুর্জন স্ত্রীপুরুষ। আদিগঙ্গায় জলের চেয়ে কাদা বেশী। ওপারে গহন বন। নির্জন ভাঙাঘাটে ব'সে থাকতুম কাপড়চোপড়ের জিম্মা নিয়ে, মুখে তিলকের বিচিত্র ছাপ নিয়ে, এক হাতে বেগুনি আর পাঁপর। হঠাৎ এসে দাঁড়ালো রাঙা শাড়ীপরা এক স্ত্রীলোক বন্য দৃষ্টিতে। শুকনো তা'র এলোচুল, কপালজোড়া সিঁদুর। বললে, আমি শ্মশানবাসিনী রণরঙ্গিনী! তুই এখানে ব'সে আছিস যে?

হাতের বেগুনি আর পাঁপর কাঁপতে লাগলো ঠকঠক ক'রে! ভয়ে আমি বিবর্ণ। শ্মশানবাসিনী বললে, ওরে শয়তান, আসছি আমি অনেকদূর থেকে, তোকে নিয়ে যাবো যে? চল্ চল্ কত কেটেছি, কত খেয়েছি! কে কোথায় আছে তোর, বল দেখি?

তখন প্রায় কেঁদে ফেলেছি। বললুম, মা গেছে মন্দিরে!

মন্দিরে? আমাকে দর্শন করতে? এইত আমি বেরিয়ে এলুম! দূর, দূর, তোর মতন মেয়ে আমার তিন তিনটে! ওরে, মা আমার পাগলিনী মেয়ে! মা, মাগো, বুকের ওপর শ্মশান জ্বালিয়ে বসলি কেন মা?

এলোচুল উড়িয়ে ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল স্ত্রীলোকটি। আমার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে। পরে শুনেছিলুম কালীঘাটে এরা এসে আশ্রয় নিত। যত মূর্ছারোগী, স্বামী-

পরিত্যক্তা, বিকৃতমস্তিষ্ক, সন্তানহারা, ব্যাধিদুষ্টা। কিন্তু সেদিন আদিগঙ্গার ভাঙাঘাটে নির্জন দুপুরে, ছায়া ঝিলিমিলি রোদে কী বিভীষিকা দেখেছিলুম।

আদিগঙ্গার আদি অন্ত পাইনি সেদিন!

দেখেছি গঙ্গাকে, যাকে সবাই বলে ভাগীরথী গঙ্গে! আদিগঙ্গার সঙ্কীর্ণতা নেই কোথাও,—চোখ বাধা পায়না কোনোদিকে। মায়ের সঙ্গে যেতুম গঙ্গায়। মেয়েঘাটে যেতুম, কারণ তখনও পুরুষ হয়ে উঠিনি। মেয়েদের মধ্যে স্নান করতুম, কাপড়চোপড় ধ'রে দাঁড়াতুম, তিলক কাটতুম—আর চুলে তেলে চন্দনে বাস-বস্ত্রের ঝর্মরে নিবিড় গন্ধের ভিড়ে এক সময়ে হাতছাড়া হয়ে যেতুম। মেয়েদের ভিড় থেকে মা বা'র করতেন টেনে। কলকণ্ঠাবলীর সঙ্গে অলঙ্কারের শিঞ্জিনী, চাপাহাসির সঙ্গে টুক্‌রো কথা, বাঁকা চোখের ব্যঙ্গরসধারা, চোখের সঙ্গে চোখের বালি—সে যেন নতুন জগৎ, নতুন চেতনা। বারুণীর গঙ্গায় দেখেছি জোয়ার নেই জলে, মাটি জেগে উঠেছে চৈত্রের আতপ্ত রৌদ্রে, ক্লান্ত মন্দ স্রোত—তীরে ব'সে জপ ক'রে যায় ভৈরবী। দশহরায় দেখেছি মকরবাহিনী গঙ্গাকে। রৌদ্রের কোলে এসে দাঁড়ালো কালো মেঘের টুক্‌রো—ছায়া ভেসে গেল গেরুয়া জলস্রোতে। কিন্তু মকরবাহিনী কই, কোথা সেই পদ্মহস্তা? কোথা শঙ্খ? শুধু অবিরাম জলপ্রবাহ ছল ছল কল কল করে, শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ, শুধু উর্মিমুখরতা। আশ্বিনে মহাষ্টমী! ভরা গঙ্গায় উঠেছে যৌবনের জোয়ার। এখানে ওখানে জল-বালকরা সাঁতরে চলেছে ভেসে। এবার দেবী এসেছেন নৌকায়—ধন, ধান্য, শস্য পরিপূর্ণ বসুন্ধরা। দেবীর দোলায় গমন। ফলং মড়কং ভবেৎ। গঙ্গার উপরে শরতের আকাশ কোন্ বিশ্বখেয়ালীর এলেমেলো মেঘের খেলায় ভরা। জল চলেছে ধারালো স্রোতে, শাণিত ফলকের মতো জল। কত লোকের নৈবেদ্য ফুল বেলপাতা সমস্ত ভেসে চলেছে। সকলের আগে গঙ্গার পূজা। গঙ্গাপ্রাণদায়িনী। গঙ্গার জলে মালিন্য স্পর্শ করে না। কত জন্তুর গলিত দেহ, কত আবর্জনা, কত অস্বাস্থ্য—সমস্ত ভেসে চ'লে যায়। এই জলপ্রবাহের মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে সঞ্জীবনীরস,—লোকালয়কে সেই রস নাকি জীবনদান করে। অবগাহনে সকল পাপ ধুয়ে যায়—শরীরে মনেপ্রাণে কল্পনায় আনন্দের স্বরূপ ওঠে জেগে। গঙ্গা তাই পুণ্যসলিলা। গঙ্গা তাই দেবত্বময়ী। মহাষ্টমীর সহস্র সহস্র নারীর ভিড়ের ভিতরে যেন একা আমি দাঁড়িয়ে। আমি স্থির, কিন্তু আমিই অশান্ত। আমি দাঁড়িয়ে, কিন্তু আমিই সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী।

আমি চলেছি তীর বেয়ে। নিমতলার শ্মশান পেরিয়ে আহিরীটোলার স্টীমার ঘাটা ছাড়িয়ে শ্মশানেশ্বরকে পিছনে রেখে বাগবাজার আর কাশীপুর আর কুটিঘাটা অতিক্রম ক'রে সেই দক্ষিণেশ্বর আর শিবতলার দিকে। তারপর গঙ্গা যেন দূরে গিয়ে ধোঁয়া হয়ে যায়, হারিয়ে যায় যেন বনান্তরের দিকে। আমি খুঁজতে বেরিয়েছি গঙ্গার আদিগুহামুখ—গোমুখী গঙ্গাকে। কোথায় জানিনে, শুধু জানি কোন্ উত্তরে, উত্তরাপথে। সেখানে হিমালয়, সেখানে দেবাদিদেব, সেখানে রুদ্রদেবতার রাজধানী। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন অভিমানে। প্রলয়-কালের মহেশ্বর সেই সতীনারী কাঁধে নিয়ে চলেছেন উন্মত্তের মতন। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়!

তারপর?

দিদিমা বলতেন, সতী দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়তে লাগলো দেশে-দেশান্তরে। জ্বালামুখীতে জিহ্বা, কালীঘাটে অঙ্গুলী, নাসিকে নাসা, সমস্ত ভারতে, ভূভারতে, মহাভারতে। দেবভূমি ভারতে! ওরে ভাই, সবশুদ্ধ একান্ন ভাগে পড়েছে সতীর দেহের টুকরো, তাই তারা হোলো একান্ন পীঠ। নেপালে, চন্দ্রনাথে, দ্বারকায়, পুরীধামে, রামেশ্বরে, আরো কত জায়গায়। সব দেশেই গঙ্গা,—কেন জানিস ভাই? এই গঙ্গার জল সব জলেই মেশানো, সব জলই গঙ্গার জল।

আমি চলেছি দূর থেকে দূরান্তরে। গঙ্গাস্তোত্র লেগে রয়েছে আমার কণ্ঠ-নালীতে। কত অরণ্য, কত অটবীর পথ দুই তীরে, কত অজানা জলপথ আর জনপদ। আমি চলেছি, আমার ক্লান্তি নেই—আমাকে যেতে হবে একান্ন পীঠের সকল পীঠে। আমি চলেছি যেন ভগীরথ, যেন দেবব্রত,—চলেছি সতীদেহ নিয়ে মহেশ্বরের মতন। আমাকে যেতে হবে মহাভারতে, দেবভূমি ভারতে, ভূভারতে! কোথায় জ্বালামুখী, কোথা হিমালয়ের গহন কন্দর, কোথা সেই দক্ষের যজ্ঞভূমি? চলেছি নেপালে, দ্বারকায়, চলেছি গুর্জরে, চলেছি দাক্ষিণাত্যে। গঙ্গার মতো চলেছি, অবিরাম পুণ্যপ্রবাহের মতো চলেছি। আমার থামবার উপায় নেই!

জলের পাঁতায় দাঁড়িয়ে আছি, জোয়ারের শিশু-ঢেউ দুই পায়ে এসে লাগলো। কী যে রোমাঞ্চ সেই ছোঁয়ায়, কী যে উন্মত্ততা তার কুলুকুলু ঝলকে। যেন আমার দেহে মনে এসে জানালো গোমুখী গঙ্গোত্তরীর সংবাদ,—যেন সাগরপথে চ'লে যাবার আগে আমাকে অকূলের সংবাদ জানিয়ে গেল।

গঙ্গার জল আগে নেওয়া মাথায়, তারপর পা দিয়ে স্পর্শ করা। হেঁট হয়ে, হাত বাড়িয়ে মাথায় জল স্পর্শ করে সাতু চাটুর্যের ছোটবৌ বললেন, এই যে দিদি এসেছ। ভাগ্যি বলি মানুর মা'র। দেবীপক্ষে সধবার মৃত্যু হোলো। ভাগ্যি-ধরীর কি মরণ, মা? মাথায় একপাট সিঁদুর, ফুলের বিষ্টি, পাঁচ বেটার কাঁধে চড়ে মেহগনির খাটে শুয়ে চলে গেল। আমরা অমন যেতে পারলুম না, সোয়ামীর মাথা খেয়ে বটের ডাল মুড়ি দিয়ে ব'সে রইলুম। আহা গঙ্গা, মা, পতিতপাবনী!

বেহারীবুড়োর অন্তিমদশা ঘনিয়ে এলো,—বুড়োর বয়স প্রায় নব্বই। তাঁকে খাটে শোয়ালো কিন্তু কাঁধে তুললো না,—তখনও সম্পূর্ণ মরেনি। ইন্দ্রবাবু বললেন' খাটখানা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে গঙ্গায়, সেখানে অন্তর্জলী করতে হবে। চারিদিকে ধন্য ধন্য, সজ্ঞানে গঙ্গালাভ!

কিন্তু উম্‌নির কথা কেউ ভোলেনি। অক্ষয়বাবুর বাড়ীর সেজমেয়ে উম্‌নি। স্বামী তাকে খেতে দিল না, কোলের ছেলেটা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ম'লো! উম্‌নি ভিক্ষে করলো গোপনে গোপনে। কেউ দিল কাপড়, কেউ চাল, কেউ বা একটু নুন। উম্‌নি মরবার আগে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিতে চাইল, কিন্তু স্বামী কোন্ শ্যাকরার দোকানে গিয়ে ব'সে রইলো একগুঁয়ের মতন সেই উম্‌নি ম'রে গেল মাঝরাত্তিরে, আর পরের দিন ভরা দুপুরে এসে দাঁড়ালো কালো-কালো মুর্দাফরাস,—তারা নিয়ে চ'লে গেল উম্‌নির বাসিমড়া। হে মা গঙ্গা, কলুষনাশিনী, পাতকীকে তুমি পায়ে ঠাঁই দিলে মা!

আর আমাদের বাড়ীতে ভাড়া ছিল বিষ্টুবাবু। চকচকে একটি বউ, আর দুটি ছেলেমেয়ে। তারা ছিল ছোট ছাদের পাশে ঈশানকোণের ছোট্ট ঘরটিতে। ওই ছাদটার নাম দেওয়া হয়েছিল বিষ্টুবাবুর ছাদ। লোকটি ভাল, আমাকে একদিন দই কেনার পয়সা দিয়েছিল। বৌটিও ভালো,—আমাকে দিয়েছিল একদিন আমলকির আচার। ছোট ছেলেমেয়ে দুটিও ভালো,—তাদের বিস্কুট কেড়ে খেতুম, কিন্তু তা'রা প্রতিবাদ করতো না। আমি বৌটির ফাইফরমাস খেটে দিতুম। বিষ্টুবাবু কাজ করতো কোন্ ছাপাখানায়,—ফিরতো সেই সন্ধ্যাবেলা। এসেই গান ধ'রে দিত ভাঙা ছাদের পাড়ের উপর উবু হয়ে ব'সে,—'শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী, কেন মা তোমার এমন বেশ! হরহৃদিপরে দিয়েছ চরণ, নাহি মা তোমার লাজের লেশ! শ্মশানে কেন মা—'

সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে চেয়ে থাকতুম আকাশের বড় তারাটার দিকে এক দৃষ্টে। শ্মশানে নৃত্য ক'রে বেড়াতো ভয়ঙ্করী কালী, গলা থেকে নেমেছে তা'র নরমুণ্ডের মালা, ওপাশে শেয়ালে আর কাকে শবদেহ টানাটানি করছে, পিশাচীরা নাচছে চারিদিকে ধেই ধেই করে। নীচে দিয়ে চলেছে অন্ধকারে গঙ্গার ধারা,—বট-অশ্বত্থের ভিতর দিয়ে বইছে উতলা হাওয়া হু হু শব্দে। আর করালীর সর্বাঙ্গে এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ!

সেই বিষ্টুবাবু একদিন মারা গেলেন। শ্রাবণের অমাবস্যায় ছোট্ট সংসারটি লণ্ডভণ্ড বিধাতার চক্ষে ছোট্ট সুখের নীড় সয়না,—সেখানে দস্যু এসে লুণ্ঠন করে; ঝড় আসে, শ্রাবণ ভেঙে পড়ে মাথায়,—অমাবস্যার অন্ধকারে নিরপরাধের প্রাণহন্তা পলায়মান দস্যু-মরণের পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেই অমাবস্যার ভয়ঙ্করী নিশীথিনীতে কি নিয়ে যাবে বিষ্টুবাবুর শবদেহ গঙ্গায়? সাপের মুখ ছিঁড়ে পড়ছে শ্রাবণের বৃষ্টিতে। কে যাবে তাকে নিয়ে? কোন্ জোয়ান আগুয়ান্? আমরা সবাই তখন ছোট ছোট। রেড়ির তেলের আলো জলো হাওয়ার ঝাপ্টায় বারবার নিবে যায়,—সেই আলোর সীমানা পেরিয়ে বিষ্টুবাবুর মহলের দিকে যা দেখা যায়, তা ভয়ঙ্কর। অন্ধকারে এখানে ওখানে জলের ধারা বইছে, তা'র মধ্যেও কেমন বিভীষিকা। আকণ্ঠ আতঙ্কে আমরা সবাই এককোণে ব'সে আছি জড়োসড়ো হয়ে। দক্ষিণের বেলগাছটার একটা ঝুপসির অংশ দেখা যায়, তা'র পাশে বেম্মদত্যির পাঁচিল,—ওধারে আম্মাদের বাড়ীতে আছে সেই এম-এ পাস পাগলটা।

এমন সময় জড়তা কাটিয়ে দিদিমা এলেন বেরিয়ে। মাথায় গামছা দিয়ে তিনি সোজা গেলেন সেই মৃত্যুর গহ্বরে। চীৎকার ক'রে বললেন, ভয় কি মা, এই যে আমি। এসো, তুমি আমার কোলে এসো। যদি কেউ তোমার না থাকে আমি আছি। আজ থেকে আমি তোমাদের ভার নেবো,—ভয় কি তোমার? ওরে, ওঠ্, তোরা, কে কোথায় আছিস, বিষ্টুকে যে গঙ্গায় নিয়ে যেতে হবে!

জড়তার ভিতর থেকে যেন জাগরণের ডাক এলো দিদিমার কণ্ঠে। রেড়ির তেলের আলো নিবে গেছে,—যাক্ নিবে। ভয়ের আর বিভীষিকার জাল ছিঁড়ে যে নাবালক প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো,—সে আমি। কিন্তু ছোড়দার শাসনে আর মায়ের চাহনিতে আমাকে নিরস্ত হ'তে হোলো।

দিদিমা কোলে তুলে নিলেন সেই বৌ আর ছেলেমেয়ে দুটিকে। তারপর বাইরের কা'রা যেন দিদিমার ডাকে এসে হাজির হোলো,—বিষ্টুবাবুকে নিয়ে গেল গঙ্গায়। আর

সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর থেকে আমি বেরিয়ে সেই ঘনান্ধকার শ্রাবণের বর্ষায় শব-যাত্রীদের পিছনে পিছনে গঙ্গার পথে চললুম। পথঘাট আমার চেনা, অনেকটা চেনা। নন্দ চৌধুরীর গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় প'ড়ে মানিকতলার ভিতর দিয়ে গোবর্ধনের দোকান ছাড়িয়ে চলেছি তাদের সঙ্গে সঙ্গে। কোম্পানীর বাগান বাঁ হাতি রেখে নিমতলার ঘাটের পথ ধরলুম। আমার দেখা চাই মৃত্যু কেমন, মৃত্যু কোথা দিয়ে আসে, কোথা দিয়ে পালায়। আমার দেখা চাই মানুষ পোড়ে কেমন ক'রে, কেমন ক'রে তা'র গায়ের মাংস সিদ্ধ হয় আগুনে, কেমন ক'রে এত যত্নের দেহটা হয় ভস্মাবশেষ। সেইজন্য কিশোর বয়সে ঘুরেছি শ্মশানে শ্মশানে। কোন্ শ্মশানের কোথায় কোন্ গাছটা আমার প্রিয়, কোন শ্মশানে কোথায় নিরিবিলি বিশ্রামের জায়গা, কোন্ শ্মশানে কোন্ বৈরাগীরা এসে গাঁজাভাঙ খায়, আবোল-তাবোল বকে, গান গায় মদ খেয়ে, ঘুমিয়ে থাকে গৃহসংসার ভুলে—এ আমার জানা ছিল। শ্মশানের নিয়মকানুন, শ্মশানের পুরোহিতের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ, শ্মশানের চিত্রগুপ্তের খাতা, শ্মশানের মড়ার আগুনে যারা তামাক ধরায়, মড়ার বিছানা নিয়ে যারা কাড়াকাড়ি করে,—তাদের সবাইকে আমি জানি। পল্লীগ্রামের নদীর ধারের শ্মশান,—সেই শ্মশানের কোনো আভিজাত্য নেই। নির্জন নদী চলেছে ফসলকাটা মাঠের প্রান্তে,—অদূরে শ্মশান। হয়ত একটি ছোট বাঁশ রয়েছে প'ড়ে, পোড়া কাঠের টুক্‌রো, ছেঁড়া একটুখানি কাপড়, একটি ভিজে বালিশ, একটুক্‌রো তোষক, হয়ত বা একটি ভাঙা হাঁড়ি। কাছে গেলে দেখা যায়, হয়ত বা ভাঙা বেলোয়ারী চুড়ির গোটা দুই টুক্‌রো ছড়ানো আশেপাশে, কিম্বা হয়ত ছোট্ট একটি কাঠের খেলনা। এরই নাম শ্মশান, এরই নাম জীবনের সর্বঅবশেষ।—

আন্নাদের বাড়ীর সেই এম-এ পাশ পাগলটা! আন্নারা জাতিতে বৈদ্য। বৈদ্যজাতি কেমন আগে জানতুম না, আগে দেখিওনি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি আর সোনার বেনে—এরা ভিন্ন আর কোনো জাতির নাম শুনিনি ছোটবেলায়। দেখলুম আন্নারা আমাদের মতনই গৃহস্থ, আমাদের মতনই কথা কয়, আমাদের মতনই আহার নিদ্রা।

ওই বাড়ীতে কালো মতন একটা লোক,—নাম নাকি নীরেন,—সে পড়াশুনো করতো গভীর রাত অবধি জেগে। কী গভীর মনোযোগ, কী ভালো ছেলে। হঠাৎ একদিন রাত দুটোয় সেই লোকটা ভীষণভাবে চীৎকার ক'রে ওঠে, পাড়ার লোক এসে

জড়ো হয়। পরে জানা গেল, সে পাগল হয়ে গেছে, লোহার শেকলে সে বাঁধা থাকে। মাসচারেক পরে তা'র বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, সে আপনমনে বেড়িয়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে হেদোর বাগানে দেখি, সে একা হয়ত বেঞ্চে চুপ ক'রে বসে, কিম্বা রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু চুপ ক'রে ঠিক নয়, বিড়বিড় ক'রে আপনমনে কী যেন সে বলে। ইংরেজি বলে অনর্গল, সংস্কৃত বলে স্বচ্ছন্দে, আরো কত কি বলে। অত্যন্ত শান্ত, অতিশয় নিরীহ। দেখতে দেখতে প্রায় বছরখানেক পরে সহসা একদিন হৈচৈ উঠলো, নীরেন নাকি হেদোর জলে ডুবে মরেছে! তা'র মৃতদেহ জলের ওপর ভেসে উঠেছে রবিবার ভোরে। পুলিশের লোক তদন্ত আরম্ভ করেছে!

মাকে ডেকে দিদিমা বললেন, দুরন্ত ছেলেকে সাবধান করো, নয়ত পায়ে দড়ি বেঁধে রাখো। খবরদার, আর একলা হেদোয় যেতে দিয়োনা। হেদোর জল বড় অবিশ্বাসী।

কেউ জলে ডুবেছে, কোনো ছেলে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়েছে, কেউ গাড়ী চাপা গেছে, কেউ হারিয়েছে, কেউ খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছে,—সবই যেন আমার অপরাধ। বাইরের দুর্ঘটনার কোনোরূপ একটা খবর বাড়ীতে এসে পৌঁছলেই আমার উপর একটা শাসন চলতো। আমাকে চোরের মতন লুকিয়ে থাকতে হোতো। আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বড়দের একটা বিচারসভা ব'সে যেতো।

অথচ ওই নীরেনের মৃত্যুটা আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়!

দরজার সামনে দিয়ে পাখীওয়ালা যায়। চন্দনা একটা চার আনা, দু'আনা একটা বুলবুলি অথবা ছয় পয়সা একটা গোলা পায়রা। পাখী কিনে তাকে ছাতু কিম্বা কাঁকনিদানা খাওয়াই, কিম্বা পায়রার পায়ে দড়ি বেঁধে ওড়াই—আর ওই নীরেনের মৃত্যুটা আমার পিছন থেকে প্রশ্ন করে—নীরেন ম'লো কেমন ক'রে? সে কি জলের ধারে গিয়েছিল? পা পিছলে পড়েছিল? সে কি যুদ্ধ করেছিল মৃত্যুর সঙ্গে? আঁকুপাঁকু করেছিল কি জলে? পাড়ার লোকে কেউ কেউ বলে, না, সে নিজের ইচ্ছেয় মাঝ-রাত্তিরে উঠে গিয়ে হেদোর জলে ডুবেছিল। এটা তা'র স্বেচ্ছামৃত্যু, আত্মহত্যা!

আত্মহত্যা!

ওই শব্দটা জীবনে প্রথম আমার কানে ঢুকলো। দেশলাইর কাঠির একটা ফিন্‌কি আঙুলে লাগলে ছটফটিয়ে উঠি—অথচ মানুষ পুড়ে মরে কেমন ক'রে? চৌবাচ্ছার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে একপেট জল খেয়ে নাকে মুখে জল ঢুকে এক মিনিটের মধ্যে বিশ্ব-সংসার আমার চোখে নীল হয়ে গিয়েছিল,—শুনেছিলুম আর এক মিনিট চৌবাচ্ছার

ভিতরে থাকলে আমাকে আর বাঁচানো সম্ভব হোতো না,—সে যে কী যন্ত্রণা, কী কণ্ঠ-রোধ, কী রুদ্ধশ্বাস,—জীবনকে আঁকড়ে ধরার কী অন্ধ প্রচেষ্টা! অথচ মানুষ স্বেচ্ছায় জলে ডুবে মরে কেমন ক'রে? কতবড় শক্তিমান, কতবড় বীর, কতবড় ভাবোন্মাদ! জীবনকে যে চায় না, মৃত্যুর মধ্যে সে কী পায়? এত যত্নে গড়া যে দেহ,—জলে সেই দেহ গলিত করা, সে কত বড় প্রাণশক্তি? কী অদম্য তেজস্বিতা?

হেদুয়ার অন্ধ কালো জলের ভিতরে কী দেখেছিল নীরেন? তা'র সেই উন্মাদ পাণ্ডিত্য কোন্ আদিম প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিল জলের তলায় তলিয়ে? অন্তর্গূঢ় অবি-চ্ছিন্ন অন্ধতার ভিতরে কোন্ রহস্য তা'কে ডাক দিয়েছিল?

বুলবুলি আর গোলা পায়রার পায়ের বাঁধন খুলে আমি তাদের উড়িয়ে দিই। তা'রা বেলতলার ছাদ পেরিয়ে কচিদের বাড়ীর উপর দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

ভূধরবাবুরা ভাড়া এলো আমাদের বাড়ীর পশ্চিম মহলে। তা'র বৌ এলো। তাদের বাড়ী নাকি কুমিল্লায়। কপালে মোটা সিঁদুর টিপপরা বৌ, রং খুব ফর্সা, হাতে শাদা শাঁখা আর সোনার চুড়ি। বৌটি খুব হাসিখুশী। বাঁকা বাঁকা মিষ্টি কথা বলে, ভাষাটা অভিনব,—সবাই বলে বাঙ্গাল-বৌ।

সেটা বোধ হয় চৈত্র মাস। বেলগাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরেছে উঠোনে, পাতাগুলো সারাদিন উড়ে উড়ে বেড়ায়, খসখস শব্দ করে, ভূতে ঢেলা ছোড়ে। একলা কেউ নীচে যায় না। ভূতের ভয় আমাদের আশৈশব।

একদিন ভূধরবাবুকে দেখলুম তা'র সর্বাঙ্গে ঘা। লোকটা দিনরাত বমি করে। কথা বলে না বিশেষ কারো সঙ্গে। বাড়ীতে ডাক্তার আসে, উট্‌কো লোক আসে. লোকটা মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাৎরায়। বৌটি মলিন মুখে ওপর-নীচে ঘুরে বেড়ায়। স্বামীর খুব অসুখ। দিদিমা মাঝে মাঝে বেলতলার ছাদ থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করেন, আজ তোমার স্বামী কেমন আছে বৌমা?

বৌটি বিমর্ষভাবে কেবল বলে, ডাক্তার কিছু বলেন না।

একই. প্রশ্নের একই জবাব। কিন্তু বুঝতে পারি মাসতিনেকের মধ্যে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই। ওই নীচের তলায় মরেছে রত্নেশ্বরবাবুর একমাত্র ছেলে যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের মা ছিল না, ছিল বিধবা পিসি। পিসি মাথা ঠুকেছিল শান-বাঁধানো উঠোনে। ঠিক যেন বেল পড়েছিল গাছ থেকে—"

এমন শব্দ। সেটা গত বছরের শীতকালে। উপরতলা থেকে নীচের উঠোনে শোয়ানো যজ্ঞেশ্বরের মৃতদেহ দেখছিলুম। আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে যজ্ঞেশ্বরের মরা অর্থহীন বিবর্ণ দুটো চোখ। সেই চোখ বহুদিন অবধি আমাদের পিছু নিয়েছিল; সেই চোখ আমরা কতবার দেখেছি সিঁড়ির তলায়, রান্নাঘরের পাশে, চৌবাচ্ছার পাড়ে, বেলগাছের ডালে, বিষ্টুবাবুর ছাদে।

আষাঢ় মাস নেমেছে আমাদের প্রাচীন পুরীতে। পূবদিকের করোগেটের চালায় ঝমাঝম বৃষ্টির শব্দ শুনি। আমরা ভাইবোনে ছাদের উপরে উঠে বাতাসের বেগে পিঠের দিকে কাপড় ফুলিয়ে ময়ূর সেজে পদ্য মুখস্থ বলি, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হোলো তিন কন্যে দান!

কোথায় বান এলো, বান কাকে বলে, নদীয়া কোন্ দেশে—কোন্ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার,—বান আসে কেমন ক'রে এ আমরা জানিনে। কিন্তু তবু বান আসে, বর্ষার সঙ্গে আসে বন্যা, আসে একাকার জল-জীবন, আসে জল, স্থল, আকাশ পরিব্যাপ্ত মেঘমেদুরতা। তারপর বৃষ্টি ঘন হয়ে নামলে নীচে এসে টিমটিমে আলোর চারদিকে সব ভাইবোন মিলে গল্প হয়, রাজপুত্রের। রাজপুত্র চলেছে…চলেছে…দেশ পেরিয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে কোন্ পাহাড়ের দেশে—পাহাড় পেরিয়ে নদী, নদীর পারে মস্ত মরুভূমি,—রাজপুত্রের সোনামুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে, আর চীৎপুরের মাঠে বালু চিকচিক করে। তবু রাজপুত্র থামে না, চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে আসে, রাজপুত্র প্রবেশ করে অরণ্যে। অরণ্যের ভিতরে বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার, সিংহ,—তা'রা রাজপুত্রের গন্ধ পেয়ে খুঁজে বেড়ায়। রাজপুত্রের কী সাহস, কী বিক্রম! তা'র হাতে তলোয়ার ঝকঝক করছে। কিন্তু রাত অনেক; বড় বড় সাপ চারদিকে ফোঁস ফোঁস করছে। ভীষণ অন্ধকার জঙ্গলে নামলো প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়। রাজপুত্র সেদিনকার মতো ঢুকলো এক অশ্বত্থবৃক্ষের কোটরে। পশুরাজ বৃথা খোঁজাখুঁজি ক'রে চ'লে গেল। সহসা বিদ্যুতের ছুরিকায় আকাশ চৌচির হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সিংহের গর্জনের মতো সমগ্র শূন্যলোক বজ্রাঘাতে কেঁপে উঠলো। প্রবল বৃষ্টিপাতের সমগ্র আঘাতে অরণ্যলোক ওলোটপালট আর দিশাহারা। রাজপুত্র বৃক্ষ-কোটরের মধ্যে ভয়ে জড়োসড়ো।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল, ভূধরবাবু আর বাঁচবে না। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, এত বৃষ্টিতে কেউ এসে পৌছয়নি, তা ছাড়া ওরা বিদেশী লোক। শ্রাবণ মাসের সেই আতান্তরে বৌটি একা। স্বামী রয়েছে অন্তিম শয্যায়। পশ্চিম মহলটি সমস্তই অন্ধকার। বৌটি চাপা কণ্ঠে কাঁদে।

ভাইবোনের দল জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছি। সমস্ত বাড়িটার মধ্যে ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে। অন্ধকারে সিঁড়ির মাঝখানে দুটো বড় বড় ঘুলঘুলি প্রেতের ভীষণ দৃষ্টির মতো দেখা যায়। বাতাসের ঝলকের মধ্যে পিশাচের ইসারা আসতে থাকে। রেড়ির আলোটা আজ উঁচু করে জ্বালানো,—আলোটা বাতাসে নিবুনিবু হয়েও জ্বলছে বড় শিখায়। দিদিমা জেগে বসে রয়েছেন চরম সংবাদটির প্রতীক্ষায়। ভীতু সেজ-মাসীমা সকলের মাঝখানে শুয়ে শুয়ে তাঁর বহুপ্রকার মৃত্যুর অভিজ্ঞতার কাহিনী আস্তে আস্তে বলে চলেছেন। তাঁর চুঁচুড়ার সেই মেছো ঘাট, খড়োবাজার, প্রসাদবাবুর ঘাট, ব্যাণ্ডেল, ওপারে নৈহাটি, এদিকে শ্মশান,—সেই শ্মশানে একবার একটি মৃতদেহ কাপড়মুড়ি দিয়ে উঠে বসেছিল, তাই দেখে সবাই পালায়। তাঁর একতলা বাড়ীর পিছন দিকের খামারে কোনদিন পেত্নী এসে কাঁদে। বলে, বঁলি ওঁমাঁ, দঁরজাঁ খোঁল্, শুঁনছিঁস ?—সেজমাসিমা চুপটি করে মড়ার মতন পড়ে থাকেন। তাঁর বাড়ীতে ভয়ানক ভূতের ভয়। একবার কালীপূজার রাত্রে ঠাকুর দর্শন করে তিনি ফিরছেন, এমন সময় পথের একজন লোক তাঁকে বাড়ী অবধি পৌছে দেবার প্রস্তাব করে। সেজমাসিমা কৃতজ্ঞভাবে রাজি হন। সেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে এসে তাঁর বাড়ীতে ঢোকে। তারপর সেই লোকটাকে আর বাড়ীর মধ্যে কোথাও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না। সেজমাসিমা চীৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করেন।

সহসা পশ্চিম মহলের অন্ধকারে একটা আর্তনাদ। ভূধরবাবুর বৌ কেঁদে উঠলো। বৃষ্টির শব্দে সেই গোঙানি ভালো করে শোনা গেল না। ভূধরবাবু মৃত্যু হোলো। আমরা আতঙ্কে রোমাঞ্চিত, স্তব্ধ হয়ে রইলুম। দিদিমা একটা হাঁক দিলেন। সেই হাঁক এই প্রাচীন ভগ্ন বাড়ীর পাঁজরে-পাঁজরে ঢুকে কোথায় মিলিয়ে গেল।

দুটি লোক এলো এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বৃষ্টিতে তারা মৃতদেহ সংকারের জন্য আবার খাট আনতে চলে গেল। বৌটি বসে রইল স্বামীর মৃতদেহ আগলে।

কতক্ষণ যায়, সহসা বৌটি কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের চীৎকার করে উঠলো। মামা গিয়ে দাঁড়ালেন দুই মহলের দরজার মাঝখানে। কী ব্যাপার ? মৃতদেহ তক্তার

উপর থেকে মেঝের উপর পড়ে গেছে! কেমন করে পড়ে গেল? মরে গেছে রোগী, তবে নড়লো কেমন করে? বৌটি ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, তারপর ঘরের দরজায় শিকল টেনে দিল। তারপর সব চুপ। সহসা মিনিট কয়েক পরে সেই মৃতদেহ আবার নড়ে উঠলো, কাৎ হয়ে তক্তার পায়া ধরে হিড় হিড় করে টানলো, গড়াগড়ি দিল। বৌটি ভয়ে বাইরের বারান্দায় ছুটোছুটি করছে। মামা ঝপাৎ করে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিলেন। বললেন, কেমন? তখন বলেছিলুম? এবার সামলাও? মড়া দানো পেয়ে উঠেছে। ওরে, তোরা সব ঘরে যা, দরজা বন্ধ কর, হাতে সবাই লাঠি নে!

আমাদের নড়বার শক্তি ছিল না। ঝাপটা হাওয়ায় আলোটা নিবে গেছে। বর্ষার জলে বিছানা ভিজে।

সহসা আবার শব্দ! ঘড়ঘড় শব্দে তক্তাখানা টানাটানি চলছে। মৃতদেহ উঠে দাঁড়িয়েছে, দাপাদাপি করছে বন্ধ ঘরের মধ্যে। মাঝে মাঝে চীৎকার করছে জন্তুর মতন। শিয়ালের চীৎকার, কুকুরের কান্না, বিড়ালের গোঙানি!—আমরা চোখ কান বন্ধ করে জড়াজড়ি করে রইলুম।

ঘণ্টা দুই পরে লোকজন এলো খাট নিয়ে। কিন্তু তারা এসে সব দেখে স্তম্ভিত। বন্ধ দরজার মধ্যে মড়া দানো পেয়ে উঠে সমস্ত ভাঙ-চুর করছে। রোগী মরেছে, কিন্তু তার ভিতর থেকে পিশাচ উঠেছে জেগে। তারা বৌটিকে নিয়ে অন্য দিকে সরে গেল। এমন ঘটনা বিরল।

বজ্রাঘাতের আওয়াজে পুরনো বাড়ীর ভিত কেঁপে উঠলো। করোগেটের চালাটা ঝনঝন করে আবার স্থির হয়ে গেল। বৃষ্টির বিরাম নেই।

প্রায় সমস্ত রাত সেই দানোপাওয়া মড়ার অন্ধ উন্মত্ত দাপদাপি। সেই কুকুরের ডাক, শিয়ালের ডাক, বিড়ালের কান্না, সেই তক্তা টানাটানি, সেই দুমদাম শব্দ। সে যে মরেনি, সে যে বিকারগ্রস্ত মরণোন্মুখ রোগী, তার বিকৃত প্রাণশক্তি এইভাবে যে নিঃশেষ হচ্ছে,— একথা বিচার করার মতো বিচক্ষণতা কারো ছিল না। আমরা আতঙ্কে মূঢ় নির্বাক হতচেতন।

শেষরাত্রে সেই মৃতদেহ শান্ত হোলো।—আকাশ তখন বর্ষণ ক্লান্ত, মেঘমলিন। ভূধরবাবুকে নিয়ে গেল শ্মশানে।

*　　*　　*　　*

জলে কল্লোলে

নৈহাটি স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘাট অল্প কিছু দূর। সকালের দিকে পথের দুইধারে কালো কালো শূয়োর ঘুরে বেড়াতো। নোংরা রাস্তা। গঙ্গার ভাঙাঘাট অনেকখানি চওড়া। নৌকা দাঁড়িয়ে থাকে ঘাটের ধারে, মাথা পিছু এক পয়সা দিলে ওপারের চুঁচুড়ার একটা শানবাঁধানো ঘাটের কাছে নামিয়ে দিত। এখন কত লাগে জানিনে।

কী আনন্দ, কী আতঙ্ক সেদিন আমার জীবনের প্রথম নৌকাযাত্রায়! কে যেন টানছে, কী যেন টানছে। গঙ্গার অন্তরঙ্গলীলা যেন আমার নাড়িতে নাড়িতে। হেমন্তের সকাল, মেটে কুয়াশা রয়েছে জলের ওপরে এপার থেকে ওপারে। ছেলেমানুষের চোখ বেশী দূর পৌঁছয় না,—কিন্তু কী ভালো লেগেছিল সেদিনকার গঙ্গার এপার ওপার। নৌকা দুলছে জলে,—তার ভিত্তি নেই, তার স্থিরতা নেই। জীবনটা যেমন দোলে পরমায়ুর উপরে অস্থির হয়ে, কখন বুঝি বা ডুবে যায়। সকালের বাতাস বইছে হু-হু করে। আমার চুল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, উড়ছে প্রাণ, উড়ছে সকল সত্তা। তরঙ্গের করুণার উপরে ছেড়ে দিতে হবে আমার এই আনন্দময় মোহময় প্রাণ! যদি অকূলে নিয়ে যায়, যদি ধরে রাখতে না পারা যায়? যদি তলিয়ে যাই, যদি কিছু খুঁজে না পাই? কত লোক যাবে নৌকায় এপার থেকে ওপারে। শুধু পারাপার, শুধু পারাবার। একূলের পুরনো পরিচিত জীবন, নিত্য অভিজ্ঞতার পৃথিবী—কিন্তু ওকূলের জীবন নতুন, অনাবিষ্কৃত, বিচিত্র। কেবলই পার হতে চায় সবাই, কেবলই ছেড়ে যেতে চায়, কেবলই পুরনো থেকে নতুনে, পরিচয় থেকে অপরিচয়ে, জানা থেকে অজানায়। কিন্তু কী আছে ওপারে? কে আছে ওপারে? মাঝিমাল্লার আর সবুর সইছে না, কর্ণধার ডাকছে, বন্দরের বন্ধন খুললো, রসারসি ছিঁড়লো, নৌকা উঠলো দুলে, বাতাস উঠলো উতল হয়ে, পাল ছেড়ে দিল নৌকায়। আমরা উঠে বসলুম।

নৌকা ঘুরলো, পৃথিবী ঘুরলো, বিশ্বসংসার ঘুরে গেল, নদীর দীর্ঘ পাড় চক্রাকার হয়ে গেল, নোঙর ছেড়ে দিল, আমার নিমীলিত চোখে যেন নেশা লাগলো। তারপর? কী নিবিড় নিস্তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নতা। জলের উপরে দাঁড়ের শুধু ছপ ছপ শব্দ তাল গুণে গুণে। দাঁড়ের সঙ্গে দড়ির ঘর্ষণের ক্লান্ত আর্তনাদ। তারপর কী নীরবতা! পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু শব্দ নেই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তটাই স্তব্ধ, মূক। হয়ত এবার জলের ভিতর থেকে দুর্বোধ্য নিগূঢ় ভাষায় কথা কইবে, সেই কথা কান পেতে শোনার জন্যই এই নীরবতা, এই চরাচরব্যাপী

স্তব্ধতা। কারো মুখে কোনো কথা নেই, যেন আকণ্ঠ উদ্বেগে সবাই চুপ। শুধু আশেপাশে এজলে-ওজলে, নৌকার তলায় ঘননিবিড় জলকল্লোল—যেন ভিতরে ভিতরে মকরবাহিনী ইষ্টমন্ত্র জপছে—যেন সেকথা কেউ না শোনে। চোখ বুজে থাকো, কান পেতে শোনো ; চোখ খুলে থাকো, প্রাণ দিয়ে শোনো।

দিদিমা গল্প করেছিলেন, তাঁর মায়ের আমলে কোন্ দুরন্ত ছেলে নাকি নাছোড়বান্দা হয়ে তার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল গঙ্গাসাগরের তীর্থে। নদীতে উঠেছিল ঝড়, নৌকা বানচাল। মাঝিমাল্লারা বললে, দেবতারা কুপিত হয়েছে, একটি বলি তাদের দিতে হবে। সকলের কান্নাকাটি, কেউ মরতে চায় না। অবশেষে মায়ের কোল থেকে সেই ছেলেকে নদীতে ফেলে দেওয়া হোলো। বরুণ আর পবন শান্ত হলেন। মায়ের কাছে শুনেছি, তাঁর বৃদ্ধ মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু ভাটপাড়া থেকে কোথায় যেন নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন, কালবৈশাখীতে তাঁর নৌকা বানচাল হয়ে ডুবে যায়। পুণ্যবান নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—মা গঙ্গা তাঁকে কোলে টেনে নিলেন। দিদিমা তাঁর বোনপো নিবারণকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন, সেই নিবারণ গঙ্গায় সাঁড়াসাঁড়ির বানে কোথায় ভেসে চলে যায়। কাঁসারীদের বিধবা মেয়ে সুনয়নীর একটি শিশু ছেলে যেদিন আচার্যিদের পুকুরে ডুবে মলো, সেই রাত্রেই সুনয়নী সোজা চলে গেল গঙ্গায়—আর ফিরে আসেনি। আর গোয়াবাগানের হরকুমারী? শাশুড়ীর অত্যাচারে বউটা দেখা-সাক্ষাৎ গঙ্গায় ডুবে জীবনের সকল জ্বালা জুড়োলো। শ্বশুরের ভিটের পাঁচিলে ঘুঁটে দিয়ে গেছে,—সেই ঘুঁটে নাকি আজও শুকোয়নি।

সেজমাসিমার কৃপায় ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি ফরাসডাঙ্গা এই কাছেই কোথাও। সেখানে নাকি শুধু তাঁতীরা থাকে, আর কাপড় বোনে। হালকা নীলরঙের সরুপাড় ধুতি যারা বোনে, তারা নাকি দিনরাত বাঘের আর সাপের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। তারা অন্ধকার রাত্রে চুঁচুড়ার পথে আসে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য—সেজমাসিমা। সাপ আর বাঘের আবির্ভাব তিনি বুঝতে পারেন গন্ধে। তাঁর উঠোনে আর ওই শিউলী গাছতলায় সাপের সরসরানি সন্ধ্যের পর থেকেই আরম্ভ হয়। চোখে দেখা যায় না বটে, তবে হাপরের মতন তাদের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সেগুলো হেলে কিম্বা ঢোঁড়া—একথা কেউ বললেই সেজমাসিমা চ'টে আগুন হতেন। তিনি বলতেন, কেউটে কিম্বা কালনাগিনী, কিম্বা চন্দ্রবোড়া। গোখরোসাপ ত'

যখন তখন—ওদের নিয়েই আমি ঘর করি। কী ভয়ানক বিষ—মানুষ পচে মরে যায়।…

জরৎকারোমুনিঃপত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে!

আর বাঘ?—সেজমাসিমা বলতেন, নীচের ঘরে শুয়ে যদি কেউ দক্ষিণের জানলা খুলে রাখে—তার আর নিস্তার নেই। শনিবার শেষরাতে আসে…চুপটি ক'রে শুয়ে থাকিস, একটুও নড়বিনে বাবা…ওরা মানুষের গন্ধ পায়।

ফরাসডাঙ্গার নামই যে চন্দননগর অনেকদিন পরে একথা জেনেছিলুম। পৃথিবীতে ইংরেজ রাজত্ব ছাড়া যে আর কোনো রাজত্ব আছে, অথবা আর কোনো সভ্য জাতি যে পৃথিবীতে বাস করে—একথা আমার মতন অনেকেই জানতোনা। একটু বড় হ'য়ে জানলুম, চন্দননগর নাকি ফরাসীদের রাজত্ব। ভাবতুম কী বিরাট রাজ্য,—নিশ্চয় সবটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে যারা যায় তাদের গর্দান থাকেনা। কয়েক বছর বাদে জেনেছিলুম, চন্দননগরে নাকি মদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। সেখানকার সবাই নাকি মদ্যপায়ী। তারা মিহিধুতি পরে, চাঁদের আলোয় শুয়ে থাকে আর মদ খায় পাগলের মতন। কি ভাগ্যি তাড়াতাড়ি ভুলটা ভেঙেছিল! সেজমাসিমা ব'লে রেখেছেন, চুঁচুড়ায় ডাকাত পড়ে যখন তখন। সুতরাং ডাকাতের নৌকা কখন আসবে চন্দননগরের গঙ্গার পথ ধ'রে, কখন আসবে কুমীর কখন বাঘ আর চন্দ্রবোড়া—এই নিয়ে জল্পনা চলছে মনে মনে। উ-ই দেখা যায় মস্ত একখানা নৌকা আসছে এপারে। ভাসতে ভাসতে সেখানা কাছে এলো, কিন্তু যাত্রীদের দেখে হতাশ হ'তে হোলো। ওখানা নাকি কোন্ জমিদারের ময়ূরপঙ্খী বজরা,—নৌকার উপরে চমৎকার বারান্দা, ওদিকে রান্নাঘর, ভিতরে ফরাস বাইরের দিকে আরাম কেদারা,—একদিকে গান বাজনার আয়োজন! কত কারুকা[illegible] নৌকায়, কত ফুলের গোছা, কত সুন্দর বিলাসের আয়োজন। কতবার ভেবেছি জলের ভিতরে বাসা বাঁধবো, নৌকা আমার একূল আর ওকূলের মাঝখানে ভে[illegible] বেড়াবে, আমি কোনো পারের নই, কোনো পার আমার জন্য নয়, মাটির সঙ্গে স্পর্শ রাখবোনা কোথাও। কতবার মনে করেছি, মন্থরগামী কোনো এক নৌকা[illegible] পাটাতনে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে থাকবো, পিঠের তলায় বইবে গঙ্গার প্রবাহ, দুইপারের দূর কোলাহল আসবেনা কানে, আকাশের তারারা আ[illegible] আমি—দিনের সূর্য আর রাত্রির চন্দ্র বিদায় নিয়ে যাবে আমার কাছে, নদী[illegible] পাখীরা ঘুম ভাঙাবে আমার ভোরের দিকে ক্বচিৎ কূজনে—আর আমি থাকবো

দুইকূলের ঠিক মাঝখানে, আমি থেকে যাবো সাক্ষ্য দুই পারের, আমি নির্লিপ্ত, আমি নিরপেক্ষ, আমি পক্ষপাতহীন।

হেমন্তের মধ্যাহ্ন বেলা। বৃহৎ একটা গাছের ঝুরি নেমে এসেছে গঙ্গার জলে। হু হু শব্দে বাতাস বইছে গঙ্গায়, বনস্পতির শাখাপ্রশাখায়। গাছের শিকড় বেরিয়ে পড়েছে তটের ভাঙনে, তারই গোড়ায় এক গেরুয়াপরা সাধু আস্তানা পেতেছে। গাছের শিকড়ে ঝুলিয়ে রেখেছে তার গেরুয়া উত্তরীয়। এক ভক্ত এসে বসেছে তার পায়ের কাছে। সামনে একটা ধুনি জ্বলছে ধোঁয়ায়। অদূরে চুঁচুড়ার খেয়াঘাট। চারিদিকে রৌদ্র প্রখর, কিন্তু এখানে বনস্পতির ঝিলিমিলি আলোছায়া। সহসা নাবালকের চোখে পৃথিবীকে কেন ক্লান্তকরুণ মনে হয়, বুঝতে পারিনে। উদাস আলস্য আর মন্থর চিন্তা ছড়িয়ে রয়েছে যেন গঙ্গার দুইপারে। জীবনের স্পন্দন রয়েছে, কিন্তু কোথাও তার ক্রিয়াশীলতা নেই। একখানা নৌকার গতির দিকে চেয়ে রয়েছি, চেয়ে রয়েছি সেই অনেকক্ষণ থেকে,—কিন্তু কী যে ক্লান্ত তার গতি! যেন ঘুমিয়ে পড়েছে নদীর ফেননিভ শয্যায়, যেন জলের ভিতরকার সুখস্বপনলোকের দিকে কান পেতে রয়েছে, যেন প্রাণ দিয়ে শুনছে কি একটা মন্ত্র!

স্নান সেরে ঘাট থেকে সবাই উঠে গেছে—সব মেয়ে আর পুরুষ। একজন পসারী তা'র চুপড়ি রেখে নেমেছে জলে। পরিশ্রমের ক্লান্তি নামিয়ে দিচ্ছে অবগাহন স্নানে। অনেকগুলো ডুব দিল। তারপর একসময় গলা জলে দাঁড়িয়ে ওষ্ঠাধরের সীমানায় গঙ্গার ধারাটিকে রেখে হঠাৎ গান ধ'রে দিল—'চন্দনচর্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী।'

সন্ন্যাসী মুখ বাড়িয়ে তাকালো, জমিদারের বজ্‌রার ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো পিতলের রেলিং-বাঁধানো বারান্দায়, খেয়াঘাটের জন দুই মাঝি নৌকার ভিতরে রান্না ফেলে মুখ বাড়ালো। আমার বুকের ভিতর থেকে রক্তোচ্ছ্বাস উঠে যেন কণ্ঠরোধ করলো।

"চন্দন চর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী!"

সেদিনকার হেমন্তের আকাশ-গঙ্গায় দূর থেকে দূরান্তরে পীতবসন বনমালীর নীলকলেবর সত্য হয়ে উঠেছিল বৈকি! পসারীর সুমধুর ব্যথাতুর কণ্ঠস্বর জলের উপর দিয়ে কতদূরে গিয়ে পৌছেছিল জানিনে। মনে হয় বহুদূর,—আমার চিন্তার সীমানা ছাড়িয়ে, সকল কূল ডিঙিয়ে, ভাটপাড়ার ঘাট পেরিয়ে, দক্ষিণ প্রবাহের

পথ ধরে—কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে চ'লে গিয়েছিল। ঘাটের ধারে আমি দাঁড়িয়েছিলুম, পসারীও তা'র স্নান সেরে গান গেয়ে উঠে চ'লে গেল, কিন্তু আমাকে সে যেন বিবাগী মনের বাহির দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে গেল,—আমি চললুম মকর-বাহিনীর পিছু পিছু অনন্ত অকূলের দিকে,—যেদিকে কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পীতবসন বনমালী!

ছেলেমানুষ ভাবলো, গঙ্গার রং মেলানো রয়েছে সমস্ত জীবনে। প্রিয় রং হোলো গৈরিক, প্রিয় বসন হোলো পীত, প্রিয় বর্ণ হোলো স্বর্ণ। রৌদ্রের রং কি হরিদ্রাভ নয়, শুদ্ধবস্ত্র কি পট্টবস্ত্র নয়, নারায়ণের অঙ্কশায়িনী যিনি তাঁর রং কি গঙ্গার মতো নয়, আর—আমি-তুমি-সে-তা'রা—আমাদের সর্বাঙ্গে গঙ্গা, আমরা গঙ্গাবর্ণ, আমরা গাঙ্গেয়!

ছায়া ঝিলিমিলি বনস্পতিতে, বটের ঝুরিনামা গঙ্গার প্রবাহে, মধ্যাহ্ন-পাখীর কাকলীতে, ভাঙ্গাতটের সহস্র শিকড়ের জটিলতায়, হেমন্তের রৌদ্রবেলায়—যেন ওই গানের ছত্রটি ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, আবর্তিত হ'তে লাগলো। আমার দুইকানে বাসা বাঁধলো, দুই চোখে ছবি এঁকে রাখলো চিরদিনের মতো!

সে-ছবি মোছেনি কোনদিন। ইস্কুল থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়েছি গঙ্গার ওই মোহমন্ত্রে। সঙ্গে আমার বন্ধু বলাই। বলাইয়ের বাবা জীবিত, সুতরাং তা'র অবস্থা ভালো। পিতার রাজকোষ ভেঙে চার আনা পয়সা সে সংগ্রহ করতো অতি সহজে। তারপর ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডারের পাশের গলিতে সে দাঁড়িয়ে থাকতো। দুজনে বেরিয়ে পড়তুম। গরাণহাটা আর নাথের বাগান পেরিয়ে সোজা চ'লে যেতুম আহিরীটোলার ঘাটে। সেখানে ষ্টিমার আসে বড়বাজারের ঘাট থেকে। আহিরী-টোলা থেকে আড়িয়াদহ শিবতলার ঘাট ছয় পয়সা ভাড়া। চার পয়সার চানাচুর। দুখানা টিকিট আর চানাচুর নিয়ে জলপথে যাত্রা করতুম। কী যে আকর্ষণ ওই জলে, ওই মন্ত্রে! ষ্টিমারের নীচের তলায় গিয়ে ঢুকলে আর কোনো উদ্বেগ নেই,—মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যা ওই ছয় পয়সা টিকিটে বড়বাজার আর শিবতলা আনাগোনা চলতো। বড়বাজার থেকে আহিরীটোলা, তারপর শালকিয়া, সেখান থেকে বাগবাজার, তারপর কাশীপুর, কাশীপুর থেকে বেলুড়, তারপর কুটিঘাট, কুটিঘাট থেকে বালি, আর বালি থেকে এপারে শিবতলা। ষ্টিমার থেকে নামতুম না, ধরাপড়ার দায় ছিলনা, সারাদিন চলছে এঘাট থেকে

ওঘাট, একূল থেকে ওকূল। দিনের আলো ফুরিয়ে যেতো, কৌতূহল ফুরোতো না। উপর দিকে ছোট জানলাটা থাকতো প্রায় জলের কাছাকাছি,—উচ্চতার হিসাব ক'রে দেখতুম, আমরা যেখানে ব'সে আছি সেই ষ্টিমারের খোলটা থাকতো জলের নীচে। অর্থাৎ জলের তলায় আমরা দুই বন্ধু আশ্রয় নিয়েছি। পৃথিবীটা উপরতলায়, সেখানে জনসমাজ, আকাশের আলো আর বাতাস,—আমরা জলের নীচে, আমি আর বলাই। বলাই গল্প বলতো, তা'র বাড়ী শিবপুর, তা'র ঠাকুরদাদা পণ্ডিত। সে নাকি বড় হয়ে অধ্যাপক হবে। বলাইয়ের চোখ দুটো বড় বড়, সামনের দাঁত দুটি বড়, সে সিল্কের জামা পরে পূজোর সময়, সে টেবিলে ব'সে পড়াশুনা করে। সে ছোট বড় চুল ছাঁটলে কেউ বকেনা। ইস্কুলে আসবার সময় সে দু-পয়সা হাত খরচ পায়। মস্ত বড়লোক তারা। সে এক্সারসাইজ বুকে আঁক কষে, হাতের লেখা লেখে। আমার চোখে আর কপালে কী দেখতো বলাই? মার খেলে কথা বলিনে, তিরস্কার গায়ে মাখিনে, দৈবাৎ প'ড়ে গিয়ে কেটেকুটে গেলে কাঁদিনে, বন্ধুদের ফাইফরমাস খাটি। আমার গায়ে জোর নেই, মনের শক্তি নেই, ইচ্ছার তেজস্বিতা নেই, নৈতিক আদর্শ কিছু নেই। ভীরু, সশঙ্ক, আড়ষ্ট, চতুর, ফতুর আমি। বলাইয়ের অনুগ্রহপুষ্ট, বলাইয়ের মুখাপেক্ষী। তা'র সঙ্গে চলেছি, যেন তার ভৃত্যের মতো অনুগত। বলাইয়ের পায়ে না কাঁটা ফোটে। বলাই যেন খুশী থাকে। আমাকে যদি সে ভালো না বাসে ক্ষতি নেই, কিন্তু তা'কে ভালোবাসবার অধিকার যেন আমার চিরস্থায়ী থাকে। সে ছাড়া আমি নই, সে ছাড়া রাত্রির স্বপ্ন নেই,—সে থাকে মিশে আমার পাঠ্যবইয়ের ছত্রে ছত্রে। আমার জীবনের প্রথম চিঠি পাই বলাইয়ের হাতের লেখা শিবপুর থেকে। এক পয়সা দামের লক্ষ টাকার পোস্টকার্ড—গেরুয়া রঙে রাজার মুণ্ড ছাপা।

গেরুয়া রংটা ছিল আমার রং, কারণ ওটা গঙ্গার রং, ওটা সকল নদীর রং। বহুকাল পরে দেখেছি গঙ্গার অকূল মোহানায় ওই গেরুয়া গিয়ে মিলেছে নীলকান্ত সাগরে। পীতবসন পরেছে বনমালী আপন নীলকলেবরে। মেঘের চন্দনচর্চিত তা'র ললাট!

কিন্তু বলাইকে নিয়ে ভাবতুম, আমরা দুটি জলবালক। আমরা বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে যেতুম বেলুড়ে, বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে ব'সে থাকতুম দক্ষিণেশ্বরের জঙ্গলে, যেতুম চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকায় শিবপুরে, মাঠের বৃষ্টিতে ব'সে ফুটবল খেলার কথা ভাবতুম। জল ছাড়া কোনো কথা মনে আসতোনা, দুজনে সাঁতার শিখবো, একখানা

নৌকা কিনবো, সুন্দরবনে গিয়ে হাঙ্গর কুমীর দেখবো, অথবা চন্দননগরের ঘাটে নৌকা বেঁধে দুজনে দিনরাত ক্যারম্ খেলা করবো। অর্থাৎ জলে ভাসবো দুজনে, জীবনটাকে জলাঞ্জলি দেবো। পুণ্যার্থী যেমন গঙ্গার জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়, সেটা ভাসতে ভাসতে চ'লে যায়—তেমনি আমাদের কত পরিকল্পনা ভেসে ভেসে কেঁপে কেঁপে অকূলের দিকে গেছে, অতল তলে তলিয়ে গেছে।

ষ্টিমারের বাঁশী বাজে—কেমন যেন ভগ্ন উদাস কণ্ঠে। অমনি কান পেতে সমস্ত শব্দটা মর্মের ভিতরে মিলিয়ে নিই। মাঝি মাল্লাদের দেখলে যেন মনে হয়, ওরা পৃথিবীর জীব নয়, ওদের সর্বাঙ্গে যেন গঙ্গার ধারা, ওদের গৃহসংসার জীবন-মরণ সবই যেন জলে ভেসে বেড়ায়। ওরা গঙ্গাপুত্র। ষ্টিমার জলের উপর ঝক্‌ঝক্ শব্দ ক'রে চ'লে যায়, আমার প্রাণ ধক্‌ধক্ ক'রে ছুটে যায় তার পিছু পিছু। বাগবাজার থেকে বেলুড়, সেখান থেকে শিবতলা। ভারতের বড় বড় সভ্যতার কেন্দ্র ব'সে রয়েছে গঙ্গার দুই পারে,—তারা যেন আবহমান কাল থেকে তীরে ব'সে বিশ্বমানবতার মন্ত্র জপ করছে। আমার দেহ মন প্রাণ তা'দের স্পর্শ করে, চুম্বন করে, সাদর সম্ভাষণ করে, আলিঙ্গন করে। যত দেশ, যত নগর, যত জনপদ, যত শস্যক্ষেত্র, অরণ্য অটবী গঙ্গার দুইপারে,—যেন তা'রা আমার আত্মীয়, যেন বড় প্রিয়, যেন বড় আপন। আহ্লাদে, উল্লাসে, উৎসাহে, আনন্দে আমি তাদের সবাইকে আদর ক'রে চ'লে যাই। আমার দেহ-মন-প্রাণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে প্রতি ভগ্নাংশ যেন সকল দেশে সকল গাঙ্গেয়নগরে ছড়িয়ে থাকে। গঙ্গার জলে আমি প্রাচীন আদিম ভারতকে স্পর্শ করতে পাই।

দেখতে দেখতে বয়সটা কৈশোর আর তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। সামনের ভবিষ্যৎটায় কোথাও আশা আর আনন্দের চেহারা দেখছিনে। কোথা থেকে নৈরাশ্য এসে জোটে, কোথা থেকে ওঠে দীর্ঘশ্বাস, কেমন ক'রে যেন সংশয় জমতে থাকে ইস্কুলের শেষ ক্লাসের দিকে এগিয়ে এসেছি, লেখাপড়ার দিকে টান কম। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কোন্ কাজ নেবো, কোন্ কাজের যোগ্য আমি, সেই কথাটা তোলাপাড়ার দিন আগত ওই! হেদুয়ার বাগানে দেখতে পাই বিষণ্ণ নৈরাশ্যের ছায়া, বন্ধুমহলের কথালাপ ক্লান্তিকর,—একা আমার মন ভারাক্রান্ত। গোয়াবাগানের পূব দিকে কারবালা ট্যাঙ্কের আশে পাশে মুসলমান পল্লীতে বন্ধুদের জুটিয়েছি,—তাদের নাম আলতাব, নাসিরুদ্দিন, সেলিম, রহমন ইত্যাদি। একজন পার্শি যুবক জুটেছে,—

চোখে মোটা চশমা, মাথায় কালো পাকানো টুপি, রং ফর্সা—বাপ যেন বোম্বাই আর কলকাতার কোন্ ব্যবসায়ী। ছেলেটির নাম গজ্জদার আহমদ। তা'র সঙ্গে চিনাবাদাম খাই, ম্যাকলেয়ড স্ট্রীটে ঘোরাফেরা করি। আর সন্ধ্যায় ফিরে এসে মিমি আর তা'র বোন বুবুর সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ঢুকি। কোনো কোনোদিন শীতলা মন্দিরের বাড়ীর উঠোনে গিয়ে ব্যায়াম অভ্যাস করি। তখন উল্টোডিঙি আর বেলগাছিয়ার পথটা ছিল অনেকটা দুর্গম। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওদিকটায় ছিল জলা, বিল, কচুরিপানা, নারিকেলের বন, আর একটা আধটু ধান ক্ষেত। খালের ওপারটায় মালগাড়ী এসে দাঁড়ায়, আর কয়লা নামায়। শ্যামবাজারের ওদিকটায় ছিল মুড়ি-মুড়কি আর দু'একখানা মাড়োয়ারির দোকান, রাস্তায় তেলের আলো জলতো, সন্ধ্যার পর চুরি হোতো, পাহারাওয়ালারা একা হাঁটতে সাহস করতো না। খোলার বস্তি, মেটে অলিগলি, কাঁচা নর্দমা আর এদিকে ওদিকে জলা মাঠ। দেশবন্ধু পার্ক ছিল স্বপ্নবৎ।

ওই পথঘাটে ভয় ছিল বলেই আমাদের কয়েকজনের আকর্ষণ ছিল। জলভরা উঁচু নীচু মাঠে আমরা যেতুম ফুটবল খেলতে। মাঝে মাঝে খাল পেরিয়ে যেতুম নৌকায়, বেলগাছিয়ার জলাভূমির ভিতর দিয়ে অভিযান করতুম।

জীবনের চেহারাটা তখন চোখে পড়ছে। থাকতে পারিনে স্থির হয়ে, কারণ ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত। কেমন করে যেন মনে করতে আরম্ভ করেছি আমি কারো প্রিয় নই, অনাদরের বেদনাবোধটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে মনের উপরতলায় উঠে আসছে। মুখে তখনও ভাষা এসে পৌঁছয়নি, অভিব্যক্তির পথটা যেন কিছু জটিল। ব'সে ব'সে একান্তে তখন ভাবছি পৃথিবীর চারিদিকে ভারি অবিচার ঘটে চলেছে। নিজের কাছে নিজে আস্তে আস্তে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছি। যেন কোনো কাজের যোগ্য আমি নই। সুতরাং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধ'রে তিন বন্ধু হাঁটতে থাকি। রবি, অমৃত আর আমি। ইতিমধ্যে কত বন্ধু এসেছে, কত মোহগ্রস্ত হয়েছি, কত মোহ রামধনুর মতন মিলিয়ে গেছে। শচীনের সঙ্গে বিবাদ, বিজয়ের সঙ্গে মারামারি—আর ইন্দু, সে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছিল, তাই তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। পুলিশকে ভয় করি বৈকি—কারণ পৃথিবীতে বাঘ আছে সাপ আছে পুলিশ আছে কালোরংয়ের কাঁকড়া বিছা আছে। একবার ছুঁলে আর রক্ষে নেই। পাড়াপল্লীর ভিতরে লালপাগড়ি একবার ঢুকলে তখন বাড়ী বাড়ী দরজা বন্ধ হয়ে যেতো। সেদিন বুঝতে পারিনি যে, আতঙ্ক মানেই অশ্রদ্ধা।

রবি, অমৃত আর আমি—তিনজনে পথ হাঁটি। কত যে হাঁটি যে তা'র ইয়ত্তা নেই শুধু হাঁটি। সকল পথ সকল ঘাট হাঁটি। কলকাতার পথ ঘাট যেন বিরাট অঙ্কের একটা জটিল জাল। আমরা হেঁটে হেঁটে তার গেরোগুলো খুলে দিই। আগে আগে রবি আর অমৃত, পিছনে পিছনে আমি একা। আমার কথা যোগায়না, পাঁচরকম কথা বলিনে। শুধু মনের মধ্যে অনন্ত কথা আর কাহিনী পাক খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। কে বাঁকাকথা বলেছে, কে আঘাত দিয়েছে, কা'র কাছে অনাদর পেলাম, কে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিল, কে আমাকে দেখলেই ক্ষেপায়, কোন্ ছেলেটা কবে আমাকে মারবে বলেছে—এই সব ভিড় করে আসে। কাত্যায়নীদের বস্তিতে থাকে হারু, তাঁতিদের বাড়ীর সত্য, পুটিবাগানের পুণী নামক মেয়েটা, ওবাড়ীর নাদু আর খাঁদি, স্যাকরাদের মিনি,—এরা আমার কাছে পুরনো হয়ে এসেছে। চেয়ে দেখছি সংসারটা দুঃখের আর দুর্ভাগ্যের। মরা পালকের দিকে চেয়ে দেখছি, পাখী একদিন জীবন্ত ছিল, ডিমের খোলায় দেখেছি শাবকের ভবিষ্যৎ। সবাই আছে আনন্দে, সকলের রথ চলেছে রাজ-পথে, বর চলেছে চতুর্দোলায়। সবাই গেল এগিয়ে,—আর আমি? আমি যেন পিছনে প'ড়ে গেছি। চাকাটা ঘুরছে আমি যেন কেবলই তার নীচের দিকে। কেন? কেন এত জল? কেন এত হাবুডুবু খাই? কত প্রশ্ন ভিড় করে আসে মনে, কত প্রশ্ন দুই কান ভ'রে তোলে, কত প্রশ্ন অর্থহীন আর অসঙ্গত। তবু দেখি প্রশ্ন বাসা বাঁধে ঈশান কোণের নিমগাছে, প্রশ্ন ঘোরে বিষ্ণুবাবুর ছাদে আর মিত্তিরদের বাগানে, প্রশ্ন দেখতে পাই পথে চলার আশে পাশে। শীলেদের বাড়ীর ছাদে ওই পাথরের পুতুলটা মাথা হেঁট করে রয়েছে আমার শিশুকাল থেকে আজ অবধি—যেন প্রশ্নের ভারে ওর মাথা ভারাক্রান্ত। বৃষ্টিতে বর্ষার জলের ধারায়, নালায়—ওই একই কথা, নিজেকে জানতে পেরেছ কি? কি চাও তুমি? কি পাওনি? প্রশ্ন আবর্তিত হয়ে ওঠে জলে, খালে, জলায়, গঙ্গায় আর জোয়ার ভাঁটায়। এমনি করে ভাঙা বাড়ীর অন্দরে কন্দরে ঘুরে ফিরে এসে পৌছলুম বাইরের দরজায়। পথ ঘাট তখন চিনেছি।

চাঁদপাল ঘাট থেকে বাবুঘাট—সেখান থেকে গঙ্গার তীর ধরে অনেকদূর দক্ষিণে গেলে তবে তক্তাঘাট—মাঝপথে আউটরাম ঘাট পেরিয়ে যেতে হয়। এদিকটা কলিকাতার প্রান্ত, তাই কিছু নিরিবিলি। আমরা বেড়িয়ে বেড়াতুম বিকাল আর সন্ধ্যায়। গান গেয়ে বেড়াতুম খোলা দক্ষিণ হাওয়ায়। গঙ্গার দুই পারে আলোক-

মালা জ্বলতো। তখনও দেশের নাড়ি গরম হয়ে ওঠেনি অসহযোগ আন্দোলনের আভাসে। আমরা দুচারজন প্রায় নাবালকত্ব কাটিয়ে উঠেছি। মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটেছে। ইস্কুলের শান্তি উৎসবে তামার পদক পেয়েছি। ইংরেজের জয়ে তখন আকাশ বাতাস মুখর।

আজকে আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু সেদিন ইংরেজের প্রত্যেকটি পর্বদিনে আমরা সমারোহের সঙ্গে উৎসব পালন করতুম। বড়দিন—সে যে কত বড় ছিল আমাদের কাছে! মস্ত বড় একবাণ্ডিল মোমবাতি কিনে এনে দীপালী সাজাতুম আমাদের ওই ভাঙা পুরীতে। দিদিমা তাঁর নতুন তসরের থানটি পরতেন। রঙীন কাগজের শিকল তৈরী ক'রে সকল দরজা অলঙ্কৃত করতুম। কমলা লেবু, চকোলেট, সার্কাস, পাঁঠার মাংস, মোজা জুতো,—এইসব ছিল আমাদের উৎসবের অঙ্গ। খৃষ্টান বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের উৎসবে যোগ দিতুম। মিমি আর তা'র বোন নুরুর সঙ্গে যেতুম পাদরীকে প্রণাম করতে। গির্জার উপাসনায় গিয়ে বসতুম হাসি হাসি মুখে। যুদ্ধের সময় যেবার লর্ড কিচেনার জাহাজ ডুবি হ'লেন কোন্ উত্তর সাগরে, আমরা সেবার রাস্তায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ। কত শোকযাত্রা, কত শোকসভা, কত শোকপালন। এক বাঙ্গালী কবি কোনো এক বাংলা মাসিক পত্রে কিচেনারের উদ্দেশে কবিতা লিখলেন, ইংরাজ-ভক্ত প্রকাশক সেটি প্রকাশ করলেন প্রথম পৃষ্ঠায়। দেশে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল। আজও কিচেনারের চেহারাটা মনে পড়ে। মাথায় নাবিকের টুপি, বড় বড় চোখ, মস্ত একজোড়া গোঁফ,—পুরুষ সিংহ। উত্তর সাগরের অথৈ জলে তিনি তলিয়ে গেছেন, কিন্তু শোক-বিহ্বলতায় যেন আমাদের পাড়ার লোকের বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়েনা। সে কী কান্না আর হাহুতোশ!

বাবুঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলে বাঁহাতি ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ডবাদ্যের বেদী। সামনে মস্ত বাগান। প্রতি সন্ধ্যায় ওই বেদীটার ওপর গোরার দল ব্যাণ্ড বাজায়, আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে তা'র সঙ্গে তাল দিই। আমারা কয়েক-জন। সুধেন্দু, বেবি, বাদল, রবি, লিলি, সুষমা, আর এই অধম। কৈশোরে তখন সবেমাত্র তারুণ্যের রং ধরছে। রবির পাশে আমি, বেবির পাশে সুধেন্দু, লিলির সঙ্গে সুষমা। এপাশে বৃহৎ দাঁতের পাটি বিস্তীর্ণ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আসে বাদল। বাদল হাসে, যেন কাঠ ফাটে। আমরা ইডেন গার্ডেনে ঢুকে সোজা চ'লে আসি বর্মী প্যাগোডার পাশে। সেখানে বিলের ধারে বাঁধা থাকে

দুখানি নৌকা এক বৃদ্ধ চাপরাশির জিম্মায়। একঘণ্টা নৌকাচালনার মূল্য চার আনা। আমরা ঘড়ি দেখে নৌকায় উঠতুম, আর উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরিয়ে একঘণ্টা সময়কে দীর্ঘতর ক'রে নিতুম। কোনো কোনোদিন বুড়োর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ অবধি ওই বিলটীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঘুরে ফিরে বেড়াতুম। সুধেন্দু গান গাইতো মিষ্ট কণ্ঠে। তা'র গলায় ছিল মস্ত এক গল-গণ্ড, সেইজন্য সে সব সময়ে উড়ুনী জড়িয়ে থাকতো গলায়। এম-এ পাশ করার পর সে বিলাত যায়, গলায় অস্ত্রোপচার করায় কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে কিছুকাল বাদে মারা যায়। তা'র মতো মধুরপ্রকৃতি বন্ধুকে হারিয়ে আমরা বড় ব্যথা পেয়েছিলুম। লিলি ছিল অতি সুশ্রী আর চঞ্চল, সুষমা ছিল লিলির চেয়ে একটু বড়। আমাদের আমোদে, বন-ভোজনে, সর্বপ্রকার অভিযানে মেয়ে দুটি ছিল আমাদের নিত্য সহচর! অথচ কী বিবাদ আমাদের সঙ্গে! নৌকায় ওরা ভালো জায়গাটি চায়,—আমরা দেবোনা। ওরা ভাঙা কমলালেবু নেবেনা,—আমরাও আস্ত কমলা ছাড়বোনা। ওদের হিল-তোলা জুতোয় পা মচকে গেলে আমরা খুশী হই, ওরা পা পিছলে পড়লে আমরা হাততালি দিই, ওরা হোটেলে ব'সে কেউ ডানহাতে ফর্ক ধরলে আমরা খুব বিদ্রূপ করি। অথচ ওরা না থাকলে আমাদের নৌকাবিহার ম্লান হয়ে যেতো।

ইডেন গার্ডেনের নৌকায় বিলাস ছিল, আমোদ ছিল, আকর্ষণ ছিল, কিন্তু পরিতৃপ্তি ছিলনা। সে জলে আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ নেই, দুর্ভাবনা নেই—সে যেন বাঁধাধরা। দুঃসাহসিকতায় সে জল চঞ্চল উদ্বেল নয়, সে-জলে কল্লোল ছিলনা কোথাও, সে শুধু বদ্ধজলা। তবু ওরই মধ্যে সৌখীন নেশা কিছু ছিল বৈকি। পশ্চিমের আলোটা কাঁপতো বাগানে, কৃত্রিম অরণ্যলোক একটা সৃষ্টি করা, টানাবোনা একটুখানি কবিত্ব, একটা ভদ্রবেশী সভ্যতা, জীবনের ফ্রেমে আঁটা ছোট সাধারণ ছবি। আমি চাইতুম বন্য জীবন, দুর্বার গরলাধার জীবন,—বেপরোয়া জল! আমি চাইতুম একটা প্রবাহ,—অস্থির অশান্ত একটা কিছু, যার গতির সঙ্গে আছে একটা চণ্ডতা, একটা অন্ধতা। আমি যেন বিদীর্ণ হয়ে বৃহৎ কোনো একটা জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইতুম—যা'র আদি অন্ত নেই, যা ঘরে ফিরিয়ে দেয়না, যা আমার প্রাণকে বহুমুখী ক'রে তোলে উদ্দামতায়।

দুর্বার জল ছিল আমার স্বপ্ন। অন্ধের মতো কোনো বন্য দুরন্ত জল ছুটে এসে আমাকে গ্রাস করেছে, আমার সমগ্র সত্তা অকূলের দিকে ভেসে চলেছে—এই ছিল

আমার কল্পনা। সেই বিশাল জলধারা—যা আমার শিরা উপশিরার ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটে যাবে দেশকে ভাসিয়ে মহাদেশকে প্লাবিত ক'রে,—আমার হৃদ্‌পিণ্ড নেচে বেড়াবে তার তরঙ্গে তরঙ্গে। সেই একটা আরণ্যক বিপুল জলাশয়,—যার নিগূঢ় কালো জলের উপরে নেমে আসবে অন্ধকার ছায়া, আমি তার অতল তল থেকে উঠবো জলস্তম্ভের মতো,—উঠে চীৎকার করে ছুটবো বায়ুবেগে, তারপর একসময় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়বো সকল ব্যবস্থা আর শৃঙ্খলার উপরে, সর্বপ্রকার প্রচলনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবো রসাতলে।

কূলহারা জলকে অনুভব করতুম আমার প্রত্যহের জীবনে। অশ্রান্ত শ্রাবণ বাসা নিয়েছিল আমার ঘরে। আমি জল খুঁজে বেড়াতুম কলকাতার আনাচে কানাচে। জল পেতুম, কিন্তু বদ্ধ জল। লাল দীঘিটা ছিল আমাদের চোখে অভিশপ্ত। ওর চারিদিকে মানুষের দুর্নীতি আর দোহনের চক্রান্ত; জড়বুদ্ধির ধনপিপাসা আর সর্বস্বান্তের দীর্ঘশ্বাসে ওর জল নিত্য আন্দোলিত। আপিস পাড়ার ছুটীর ঘণ্টার সঙ্গে ওটার প্রয়োজন যায় ফুরিয়ে। চৌরঙ্গীর ধারে আছে দুটো দীঘি—কিন্তু অতিরিক্ত ভব্যতা আর নিয়মানুগত্যে ওগুলো বন্দী; তা ছাড়া য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ওখানে মধ্যে মাঝে আত্মহত্যা করে থাকে। সেন্টপল্‌স্ গীর্জার দক্ষিণে আছে এক জলাশয়,—সন্ধ্যাকালে কিছু মোহ জ'মে ওঠে সেখানে। সেখানকার নিরিবিলি বাতাসে কিছু মেলে রোমাঞ্চ, কিছু বা বিবাগী বাতাসের সুর। আর গোলদীঘি? গোলদীঘি যেন একটা রেলিং ঘেরা চতুষ্কোণের চীৎকার। গোলদীঘি মানে বিপিন পাল আর শ্যামসুন্দর। গোলদীঘি মানে লিয়াকৎ হোসেন আর আনিবেসান্ত। গোলদীঘিতে গেলে জল দেখা যায় না, দেখা যায় মানুষের মাথার অরণ্য। তারপর রইলো হেদুয়া। কিন্তু ওর আনাচে কানাচে আমার বাল্য ইতিহাসটা ঘুরে বেড়ায়; ওর বায়ুকোণের দেবদারু গাছের মাথায় আমার কৈশোর স্বপ্ন দোলে; ওর জবা শিউলী আর অপরাজিতার ঝাড়ে আমার শিশু জীবনের গুঞ্জন গুন গুন করে। তার পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাইনে।

মাকে ডেকে দিদিমা বলেন, ছেলের ষোল বছর পেরিয়ে গেছে, মনে আছে ত? সেই কথাটা ভুলে যাও কেন মা?

মা বলেন, কোনটা?

সেই-যে সেই—পুত্রমিত্রবদাচরেৎ, ওর এখন হাত পা হয়েছে, ঘুরে ফিরে বেড়াতে দাও। তা ছাড়া পাস করা ছেলে, ওর দাম কত?

জলে কল্লোলে

বরাহনগরের ওদিকে যেতুম দিদির বাড়ীতে। বাড়ীটা বড়। চৌহদ্দি তার চেয়েও বড়। মস্ত দুটো পুকুর ছিল পুব দিকে। আশেপাশে নারিকেল আর খেজুর গাছ। এই পুকুরে ডুবে গেছে ছোট বউয়ের ছেলে, এই পুকুরে ডুবেছে গ্রামের একটি সুন্দরী বউ—আর পুকুরের তলায় সেই বহুকালের যক্ষীবুড়ি, ভরা দুপুরে নিশুতিকালে যখন চৈত্রের বাতাস বয় নারিকেল বনে—যক্ষীবুড়ি তখন নাকি জলের তলা থেকে ঘাটের সিঁড়িতে উঠে আসতো। ছোট ছেলে মেয়েকে ডাকতো নাম ধ'রে নাসাকণ্ঠে, আর বয়স্ক লোক এলেই নেমে যেতো জলের নীচে। একদিন চাঁদের আলোয় নাকি জলের ওপরে যক্ষীবুড়ির শাদাচুল ভাসতে দেখা গিয়েছিল।

সেই পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি। সেই শিশু ছেলেমেয়েদেরকে জল থেকে দূরে-রাখার অনুশাসন। এই পুকুরে নেমে চেষ্টা করেছি সাঁতার শিখতে, জলের তলায় গিয়ে যক্ষীবুড়ির ধাপ্পা খুঁজে বার করতে। কিন্তু সাঁতার শেখা হয়নি, যক্ষীবুড়ি চিরদিনই নিরাপদে রয়ে গেল।

যারা পল্লীগ্রামের মানুষ, তারা কেমন করে বুঝবে কলকাতার জলের পিপাসা! কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি হোতো আষাঢ় শ্রাবণে,—ডাফষ্ট্রীটে, ঝামাপুকুর আর ঠনঠনিয়ায়, চোরবাগান আর চাষাধোপাপাড়ায় অথবা আমাদের পুঁটিবাগানে। বছরে একবার দেখতে পেতুম ঐ জলরাশি। বাকি সময়টা ছিল কলের জল নিয়ে খেলা। আর জল ছিল রাস্তার জলদারদের হোজ পাইপে। পথের ধারে লোহার চাকতির তলায় পাওয়া যেতো জল,—সেখান থেকে একবার একটা ল্যাটামাছ ছিটকে পড়েছিল, ব্যাঙ বেরিয়েছিল একদিন নালার ধারে,—সে আমাদের কী উল্লাস! মাছরা জলে থাকে জানতুম—কিন্তু জল থেকে মাছ তোলা কবে দেখলুম?—পরেশনাথের বাগানে কৃত্রিম জলাশয়ে মাছ দেখতে যেতুম—গৌরীবেড়ের ধূলাধূসর পথ দিয়ে। বড়লোকদের বাড়ীতে কাচের আধারে দেখেছি রঙীন মাছ। কিন্তু ইলিশ মাছরা কোথায় থাকে, কোথায় থাকে কচ্ছপ, চিংড়ির বাসা কোন্ জলায়,—এসব ছিল আমাদের কাছে কল্পনা। ধান গম যব, বেগুন আলু পটল,—এরা আহার্য বস্তু, কিন্তু এদের ফলন কোথায় হয়, এদের গাছ কেমন—চোখেও দেখিনি। লঙ্কা হলুদ সরষে আদা,—এদের জন্মবৃত্তান্ত কিছুই আমাদের জানা ছিলনা। ভাবতুম, বেনেরা ছাড়া ওদের সন্ধান কেউ জানেনা। পাঠ্যবইতে জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই থাকতো না। থাকতো জনি আর টনির সমুদ্র যাত্রার গল্প, ক্যানিউট্'

এবং তার চাটুকারদের কাহিনী ! চাটুকাররা বলতো, হুজুর, তুমি আদেশ দিলে জল অবশ্যই উঁচুতে উঠবে। ক্যানিউটের আদেশে জল উপরের দিকে ওঠে নি !

রেলপথে যেতে দেখেছি খাল বিল নদী জলা, আর ফসলের ক্ষেত। সেটা কিন্তু ক্ষণ পরিচয় ; তাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যহের বাস্তবতার যোগ ছিলনা—তাই তা'রা থেকে যেতো মাত্র মস্তিষ্কে, মাত্র কল্পনায়। পল্লীগ্রামের নিঃঝুম নৈঃশব্দ্য, কিংবা কোনো জনহীন নদীতীর, কোনো পাখীডাকা গ্রামের তাল-তেঁতুলে ঢাকা সরোবর—এরা ছিল আমাদের কাছে অবাস্তব। শুনেছি বর্ষার পল্লীগ্রাম আশ্চর্য। অনেক জেলায় নাকি ধানক্ষেতের মধ্যে কোঁচ দিয়ে মাছ মারা হয়, অনেক গ্রাম নাকি ডুবে যায় জলে,—গৃহস্থের মেয়েরা রান্নাঘর থেকে পুকুর ঘাটে যায় নৌকায়,—লোকের বাড়ীর উঠোন নাকি সাঁতরে যেতে হয়, বর আসে চতুর্দোলায়—এইটি আমাদের কলকাতার বালক-বালিকারা জানতো ; কিন্তু বর যায় নৌকায়—সে আবার কেমন বিয়ে ? নৌকা-যোগে ধান পাট তেল তিসি তামাক যায়,—সে আবার কোন জলপথ ? পল্লীর জীবন, দেশের সত্যকার জীবন কোথায়—আমরা খুঁজে পেতুম না। কলকাতার পাঠ্যপুস্তকে পৃথিবীর নানা দেশের কথা পেয়েছি,—তার বেশী পেয়েছি শ্বেত কীর্তির কথা,—কিন্তু দেশের কথা পাইনি। সুতরাং কলকাতার বাইরে বাঙ্গলাদেশ কেমন, এ বহু বালক-বালিকার জানা ছিল না। তারা শানের মেঝেতে মানুষ, পাথরের সিঁড়িতে তাদের মাথা ঠুকেছে, পীচ্ আর পাথুরে রাস্তায় জুতো পায়ে তারা হেঁটে ফিরেছে, খেয়েছে কলের জল আর কলের চাল, তাদের দেশ যে নদীমাতৃক, এ কথা কান পেতে তারা শুনতো স্বদেশী বক্তৃতায়, এবং শুনে সংশয়ের দোলায় দুলতো !

নদীমাতৃক ! শিরায় রক্ত আমার চন্‌ ক'রে উঠতো, গোলদীঘির বক্তা ব'লতো আমাদের দুর্দশার কথা, আমাদের পিতৃপুরুষের গ্রাম ছেড়ে শহুরে চলে আসার কথা ! সেখানে নাকি দরিদ্রা দুঃখিনী নদীরা শুষ্ক বক্ষে হা হা করে জলের অভাবে। কত ছিল আমাদের, এখন কিছুই নেই। নদীমাতৃক বাঙ্গলার ছেলে আর মেয়ে জলের অভাবে কলেরায় মারা যায় ! মনে পড়ে গেল মায়ের জপমন্ত্রের কথা। গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী। এই সাতটী ভগ্নীর উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে ভারতবর্ষ আবদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন। প্রতিদিন আমরা আহ্নিকের মন্ত্র স্মরণ করি ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড একাঙ্গ ভারতকে। ঐক্যই আমাদের প্রত্যহের সাধনা। কিন্তু কোথা গেল বাঙ্গলার মধুমতী আর শীতললক্ষ্যা, কোথা গেল পদ্মা আর ইচ্ছামতী, নবগঙ্গা আর

ভৈরব, কোথা গেল মেঘনাদ আর ব্রহ্মপুত্র। বাঙ্গলার পুণ্য সলিলে অবগাহন ক'রে ধন্য হয়ে গেল সবাই। নদী থেকে এনে দিলুম অঞ্জলি ভ'রে জল, সোনার বরণ অমৃত ফলের রস এনে দিলুম তোমাদের ভোগে, বুকের রক্ত নিংড়ে যোগালুম অন্ন যুগ-যুগান্তর, দেখালুম তোমাদের পথ, দিলুম পাথেয় তোমাদের ঝুলি ভ'রে, দিলুম ঐশ্বর্য আর সম্পদে, আত্মিক আর প্রাঞ্জিক সাধনায় বলশালী ক'রে তুললুম সবাইকে—কিন্তু সেই নদীমাতৃক বাঙ্গলা আজ অশ্রুমুখী। তা'র মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নিলে, লজ্জাবাস হরণ ক'রে নিলে, প্রাণশক্তির টুঁটি টিপে মারলে, বুকের রক্ত নিঃশেষে পান ক'রে নিলে লক্ষ লক্ষ যক্ষ শিশু! দুর্নীতিতে ভ'রে দিলে, অপমানে ডুবিয়ে দিলে, অধঃপতনে তলিয়ে দিলে! হে নদীমাতৃক বাঙ্গলা—

গোলদীঘির বক্তৃতায় রোমাঞ্চিত দেহখানা টানতে টানতে বেরিয়ে আসতুম।

ভাবতুম, কলকাতায় জল নেই, জল আছে বাঙ্গলায়। এ জীবন ঠিক নয়, অন্য কোথা। সেখান দিয়ে আসবে জোয়ারের স্রোত, দুরন্ত প্রাণধারা। সেই জল চাই যেটা বিশাল যেটা সর্বব্যাপী! আমাকে সেই জল টানছে, আমি টানছি সেই জলকে। আমি ঘুরে বেড়াতুম খড়দায় আর শিবতলায়, দক্ষিণেশ্বরে আর কুঠিঘাটে। দক্ষিণেশ্বরে ছিল পঞ্চবটীর শান-বাঁধানো ফাটলধরা বেদী,—ওইখানে ব'সে পশ্চিম পারে নেমে যেতো দিনের আলো, রক্তোচ্ছ্বাস লাগতো জনহীন গঙ্গায়,—সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম সাহেব কুঠির পাশে কাঁচা ঘাটায়। বা'র বা'র স'রে গেছি গঙ্গাপথ থেকে, বা'র বা'র টেনে এনেছে অচ্ছেদ্য আকর্ষণে, সাপের কুণ্ডলীর মতো লোলুপ জল এসে পায়ের উপর লাগে —আমি এই জলে স্পর্শ করতে পারি ভারতের সকল নদীর জল, সাত সাগরের তল। যারা নৌকা চালায়, নদী যাদের বাসা, নদীর জলে যাদের প্রাণ সঞ্জীবিত, নদীর মাটি তুলে ঘর বাঁধে যারা, তারা কেমন?

আমার প্রশ্নের জবাব পেলুম সেই সময়ে।

কুঠিঘাট থেকে একটা পথ চ'লে এসেছে পূর্বদিকে—সেটা বরাহনগরের ভিতর দিয়ে সোজা চ'লে গেছে ঘুঘুডাঙ্গায়, সেখান থেকে আবার পাতিপুকুরের ওদিকে ছোট রেলপথ ডিঙ্গিয়ে বিদ্যাধরীর ওদিকে। এই ঘুঘুডাঙ্গার পথের এক সাঁকোর উপর একদিন একা বসেছিলুম। সেই সময় চলেছিল একদল জেলে। আমার পোষাক আর চেহারায় মধ্যবিত্তের কৃত্রিম আভিজাত্য ছিল না, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে আলাপ

করার বাধা ছিল কম। তাদের ডেকে বসালুম। বললুম, তোমাদের জীবনের কথা বলো। রোজ তোমাদের কাটে কেমন ক'রে।

ভাঙ্গড়ের দিকে তাদের বাড়ী, তারা পূব দক্ষিণের লোক। তারা মাছের ব্যবসা করে, জলেই তাদের বাস। তারা মাছ ধরে, মাছ মারে, মাছের চাষ করে। গ্রামে তাদের বাড়ী আর জমিজমা, তাদের জলকর জমা নেওয়া, তারা কলকাতা আর শহরতলীতে মাছ চালান করে। রোজ তারা নৌকায় আসে কলকাতায়। ওদের মধ্যে একটি লোকের নাম শোভারাম। তা'কে বললুম, তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে চাই।

শোভারাম বললে, কোথায়?

বললুম, তোমাদের কাজে। আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে।

কিন্তু সে যে জলের দেশ, বাবু? আমরা থাকি বাদায়, বাদা জলে ভর্তি।

বললুম, তা হোক, সেই জল আমি দেখবো। সেখানে মাছের কাজে নামবো।

তর্ক বাধলো,—কত নিষেধ, কত অনুনয় বিনয়। তাদের আর আমার মধ্যে কত তফাৎ। যারা হাল আর শাবল ধরে, যারা লাঙ্গল কাঁধে তোলে আর জাল ফেলে জলে, যারা তাঁত বোনে আর পুতুল গড়ে,—তারাই দেশ, আমরা নয়। আমরা একদল আছি জাতিচ্যুত হয়ে। শোভারাম জানায়, আমার কষ্ট হবে, আমি সুখী জাতের লোক, আমি নাকি এক অদ্ভুত সমাজে থাকি—সেটা হোলো ভদ্রলোকের সমাজ। শোভারাম আমাকে কিছুতেই সঙ্গে নেবেনা,—এবং আমিও তাকে ছাড়বো না। অবশেষে স্থির হোলো, আগামী কাল বেলা দশটায় উপস্থিত থাকবো উল্টোডিঙ্গির খাল ধারে—যেখান থেকে ষ্টীমলঞ্চ ছাড়ে কেষ্টোপুরের দিকে। সেইখানে শোভারাম উপস্থিত থাকবে।

পরদিন যথাসময়ে আমি উদ্বিগ্ন উৎসাহে আর কৌতূহলে ঠিক সেইখানে হাজির। খালের ঘাটে দু'খানা নৌকা বাঁধা রয়েছে, কয়েক জন যাত্রী এসে জুটেছে। আমার এই নতুন অভিযানের কথা কারো কাছে প্রকাশ করিনি। আমার সেদিনকার বন্ধুরা—রবি, অমৃত, লিলি, সুষমা,—এদের অগোচরে রেখেছি সমস্ত ঘটনার ইতিবৃত্তটা। আমি চ'লে যাচ্ছি বৃহৎ জীবন আর জলাশয়ের দিকে, সুতরাং কানাকানি এখন থাক্। আমি যাচ্ছি আমার দেশের অগণ্য নগণ্যের সমাজে। আমি যাচ্ছি মাটি আর জল আর মাছের দেশে।—

একটু পরেই শোভারাম এসে হাজির। আমি নতুন টিকিট কিনেছি, ওদের কাছে ছিল মাসিক টিকিট। আমরা পাঁচ ছয় জন মিলে নৌকায় উঠলুম। খুব অপরিসর

জায়গা, সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না। ওরই মধ্যে নৌকাটীর আবার দোতলা আছে। যারা উপরতলায় বসবে, তাদের প্রত্যেককে একটী পয়সা বেশী দিতে হবে। আমরা সানন্দে নীচের তলায় বসলুম।

দোহাই, স্বাচ্ছন্দ্যের আশা ক'রোনা। সুখের অসহনীয় যন্ত্রণায় এই জলযাত্রা ভরিয়ে তুলোনা। অভিজাত তুমি নও, তুমি এদেরই একজন। চেয়ে দেখো এই খালের জলে তোমার নিজের প্রতিচ্ছায়া। ধনাঢ্যের সমাজে তোমার ঠাঁই নেই, সেখানে তুমি উপেক্ষিত। এদের জীবনের সঙ্গে তোমার সংশ্রব নেই, এদের কাছে তুমি অপরিচিত। এবার তুমি পরিচিত হও এদের সঙ্গে, এদের মধ্যে তুমি মিলে যাও। অভিমান ত্যাগ করো—ব্যবধান কিছু রেখোনা। এদের গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, শিক্ষার পালিশ নেই,—তবু এদের মধ্যে এসে না দাঁড়ালে তোমার অবধারিত মৃত্যু। তুমি মধ্যবিত্ত, ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা তোমার, তুমি আকাশের নও, মাটীরও নও। তোমার উন্নাসিকতা, তোমার ভ্রূভঙ্গী, তোমার জাত্যভিমান,—এই সামনের মরা খালের জলে ভাসিয়ে দাও।

নৌকা ছাড়লো ঝক ঝক শব্দে। উল্টোডিঙ্গির ধার ছেড়ে নৌকা ঢুকলো নতুন খালে এক পুলের তলা দিয়ে, এ জলপথটা আমার জানা ছিল না কোনো কালে। এই সব উপশিরা-পথ কলকাতাকে খাদ্যসম্ভার যোগান দেয়—কলকাতার ধনশালিতা আর আভিজাত্য এই সব পথেরই কৃপায়। আমি আনমনে গল্প ক'রে চলেছি শোভারাম আর তা'র সঙ্গীদের সঙ্গে। তাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি ধীরে ধীরে।

আশে পাশে শহরতলী। উত্তর দিকে বিশাল রেলওয়ে ইয়ার্ড, আর এ পাশের পথ চলে গেছে কোন দিকে তা'র হদিস মেলে না। পথের ধারে ধারে কাঁচামালের মহাজনী আড়ৎ। কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে নৌকা আমাদের বাঁক নিল এবার গ্রামের দিকে। আকাশে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, সেটা বৈশাখের শেষ। আমার সঙ্গীদের এ কথা ব'লে রেখেছি যে, মাছের কাজে আমি নামবো! একথা বলিনি যে, জীবনটাকে বিচার ক'রে দেখবো ওদের স্তরে নামিয়ে। জল আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, অথবা নৌকায় ভেসে চলেছি—এ তর্ক মনে নেই। কিন্তু একথা জানি, এ জলটা নিরীহ, এটা আনাগোনার পথ মাত্র। কিন্তু আমার চোখে এর সমস্তটাই বিস্ময়। একেবারে একা অপরিচিত জগতে ছিট্‌কে পড়েছি, যার সঙ্গে আশৈশব নাড়ির যোগ নেই। গ্রামগুলি দেখে ভাবছি, গ্রামে মানুষ থাকে কেমন ক'রে? এখানে গ্যাসের

আলো, ট্রাম, মনিহারী দোকান, হোটেল— এ সব নেই, অথচ মানুষ দিব্য বেঁচে থাকে। ছোটবেলা থেকে শুনেছি, পাড়া গাঁ মানে ডাকাতের বাসা। সেজমাসিমা বলতেন, তাঁর চুঁচুড়ার বাড়ীর চারিদিকে গ্রাম্যভাব আর জঙ্গল,—সুতরাং তাঁকে দিবারাত্র দুর্গানাম জপ করতে হয়। এখানে দেখছি কারো বাড়ীতে পাঁচিল নেই, একটু আধটু বেড়ার সীমানা—আর চারিদিক খোলা। ইংরেজি শিক্ষায় জেনেছি, আমাদের দেশে ইংরেজ আসার আগে বর্গীরা গলায় ফাঁসি টেনে মানুষকে মেরে লুঠ করতো। ভাগ্যি তা'রা এসে আমাদের দেশের বাকি হতভাগ্যদের বাঁচালো!—আর দেশী শিক্ষায় জেনেছি, ইংরেজ এদেশে আসার আগে আমরা নাকি ঘরে তালা চাবি ব্যবহার করতুম না!

কেষ্টোপুরে এসে আমাদের নৌকা থামলো। এখানে পুলিশের ফাঁড়ি দেখা গেল। যারা গ্রামের ভিতর থেকে মাল অথবা মাছ নিয়ে যায় কলকাতায়, এখানে তাদের কাছ থেকে নাকি প্রত্যহ চুঙ্গি আদায় করা হয়। কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করে না, প্রতিরোধ করে না। এটা অসঙ্গত কি না, বে-আইনী কিনা, কর্তৃপক্ষের শোষণ-নীতি কিনা—এ নিয়ে কেউ আন্দোলন করে নি। তারা চায়, এরা দেয়। তারা কারণ দেখায় না, কৈফিয়ৎ দেয়না—এরাও রসিদ নেয় না। পাবার অধিকার নিয়ে তারা জন্মেছে, এরা বংশানুক্রমে দিয়ে চলেছে।

নৌ'কায় ব'সে দুধারে গ্রাম দেখছি। চোখ দুটো এরি মধ্যে স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে কোমল শ্যামলতায়। কোথাকার কোন্ হাট থেকে লোক ফিরছে। ঘাট থেকে উঠে পায়ে হাঁটা পথ নিরালা গ্রামের কোন্ রহস্যলোকের দিকে চলেছে। ছোট ছোট শালতি নিয়ে ছেলে মেয়েরা খেলা করছে জলে। কেউ ডোঙ্গা ভাসিয়ে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ওদের মধ্যেও আছি। ওদের শালতি আর ডোঙ্গায় আমিও যেন বাসা নিয়েছি। ওদের হাতে পায়ে চোখে মুখে আমার প্রাণ যেন ভ্রমরের মত গুঞ্জন করছে। এধার ওধারে আম কাঁঠালের বাগান, তাল তেঁতুল আর নারকেলের বন,—সমস্ত যেন আমার দুই আলিঙ্গনের মধ্যে। আমি যেন বহুকাল পরে আপন ঘরে ফিরে এসেছি; জন্মান্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যেন সবাইকে ধীরে ধীরে চিনে নিতে পারছি। কোলকাতার এত কাছে, অথচ আমাদের কাছ থেকে এরা কত দূরে। এখান থেকে বহুলোক পায়ে হেঁটে যায়, বেলেঘাটায়, ট্যাংরায়, রাসমণি বাজারে অথবা বেলগাছিয়া আর শ্যামবাজারের দিকে। সকালে গিয়ে সন্ধ্যার দিকে

সবাই ফিরে। মেয়েদের দেখেছি চুপড়ি মাথায় নিয়ে হন্ হন্ করে চলেছে কোলকাতার দিকে আনাজ তরকারী বেচতে।

বেলা আন্দাজ বারটার সময় একটা গ্রামের ঘাটে আমরা কয়েকজন নামলুম। লঞ্চখানা ছেড়ে চলল আবার ভাঙ্গড়ের দিকে। ঘাটের ধারে শোভারামের বাড়ী, দেখে আমি অবাক্। অন্তত দু'বিঘা জায়গার ওপর তাদের মস্ত কাঁচা পাকা ভদ্রাসন। তার বাপ জীবিত, নাম অক্ষয় মোড়ল। আমার জীবনে এই প্রথম অপরিচিত লোকের বাড়ীতে আতিথ্য নিলুম।—

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় গ্রামের ঘাটে একখানা শাল্‌তি এসে লাগলো। বিস্ময়ের কথা নৌকা ছাড়া এদিকে চলা যায় না। এ পাড়া থেকে ও পাড়া, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম, এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী—নৌকাই বাহন, কোথাও কোথাও পায়ে চলা পথ দেখছি, কিন্তু সে-পথ এক সময়ে কোন্ খাল' বিলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোলকাতার লোক নিয়ম বেঁধে থাকে; তাদের স্নানাহারের সময় বাঁধা থাকে ঘড়ির কাঁটায়। এখানে এরা জলে জলেই মানুষ, জলে ঝাঁপ দিচ্ছে যখন তখন—জলের সঙ্গে এরা অচ্ছেদ্য। আমি সাঁতার জানিনে শোভারাম অবাক। সাঁতার যে জানতে হয় না, ওটা আপনা থেকেই শিক্ষা হয়, ওটা যে মানুষ মাত্রেই জানে—এই হোলো তা'র বিশ্বাস।

অত্যন্ত সরু লম্বা একখানা নৌকায় আমরা উঠলুম। ছোট ছোট তা'র দাঁড়, তাই দিয়ে জল আঁচড়ে আঁচড়ে নৌকা চললো। এ গঙ্গার নৌকা নয়, এ দোলা খায় না, এর তলায় কোন উদ্বেগ নেই,—এ অত্যন্ত শান্ত পরিচিত জল, মাঝে মাঝে পাড়ের ধারে নৌকা ঠেকে যাচ্ছে।—ভ্রূপেক্ষ নেই, তা'রা গল্পে মেতে রয়েছে। তাদের গল্পে মাঝে মাঝে আমি শ্রোতা, মাঝে মাঝে বক্তা, আমার নতুন বন্ধুদের নাম হোলো শোভারাম, মান্ত, চন্দর, জীবন—ইত্যাদি কয়েকজন। তাদের গায়ে কারো জামা নেই, পায়ে জুতা তাদের কাছে স্বপ্ন; ধোপদস্ত প্রমাণ সাইজের ধুতি তা'রা পূজার সময়েও পরে না। জীর্ণ শতছিন্ন এক একটি ময়লা কাপড়ের টুকরো ছাড়া তাদের পরনে আর কিছু নেই। অবশ্য এক একখানা গামছা প্রায় সকলের কাছেই রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তারা শ্রমিক, পুরুষানুক্রমে মাছ মারার কাজেই তারা নিযুক্ত। শোভারামরা হোলো মোড়ল,—আর যারা তার সহচর, তারা কেবল মজুরি

পায়। তারা দৈনিক রোজগার করে, আর ফ্যান ভাতের সঙ্গে মাছ ভেজে খায়। ভালো খাওয়া পরা তারা জানেনা, ভোগের সময়ও তাদের নেই, সঙ্গতির অভাব। বিলাসের মধ্যে গাঁজা তামাক অথবা তাড়ি। তা'রা মাছ মারে, পাইকারি হারে পাজারিদের কাছে বেচে আসে, এই তাদের নিত্যকার কাজ। আমার দিদিমা বলেন, "জেলেদের পাছে ট্যানা, পাজারীদের কানে সোনা।" অর্থাৎ এদের কাছ থেকে মাছ কিনে যারা বাজারে বসে খুচরো বিক্রী করে, তাদের অবস্থা খুব ভালো। পাজারিরা. প্রতি মণে পাঁচ সের মাছ এদের কাছে বেশী নেয়,—এ তারা নেবেই, তা ছাড়া খদ্দেরকে ওজন দেবার সময় প্রতি সেরে আধপোয়া তারা কম দেবেই। এ ছাড়া দাঁড়ি পাল্লা তৈরী সেই মতো, বাটখারাগুলি ওজনে কম। কলকাতার বাজারে বহু জালিয়াৎ কম ওজনের বাটখারা তৈরী করে।

একটা ত্রিকোণাকার জলাশয়ের কাছে আমাদের নৌকা এলো। দুইধারে উঁচুতে পাড় দেখছি, তার ওপারে হু হু করছে প্রান্তর। ওরা বললে, বিদ্যাধরীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। বিস্তৃত জলাশয়ে আরো দু' একখানা নৌকা দেখা যাচ্ছে, তারাও জেলের দল,—যাচ্ছে জলের গান গেয়ে। কোন্ কন্যার প্রণয়ী নাকি নৌকাযোগে অথৈ জলে ভেসে গেছে, আর সে ফিরবে না। এদিকে কন্যার চোখের জল নদীতে পড়ে প্রতিদিন, "কন্যা ভাসায়ে প্রদীপ জলে, কেন্দে কেন্দে বলে!"—গান গেয়ে গেয়ে নৌকা গেল দূরে। অপরাহ্ণের দিগন্তব্যাপী নৈঃশব্দে সেই মাঝির গানের রেশটুকু এজল থেকে ওজলে কোথায় যেন গেল হারিয়ে। মাণ্ড তার দাঁতের পাটি বার করে বললে, গলাটা বেশ, মাইরি।

যতক্ষণ কাটা খালের পথে নৌকায় চলেছিলাম, ততক্ষণ ঠিক বুঝতে পারি নি, কোথায় এবং কতদূরে চলেছি। প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি আমাদের নৌকা এসে লাগলো এক মাঠের আলের গায়ে। আমরা নেমে পাড়ের উপরে উঠলুম।

বেশ মনে পড়ছে আমি ভয় পেয়েছিলুম। সহসা যেন ছিটকে এসে পড়লুম সৃষ্টির আদিযুগে—কোথাও জনমানবের চিহ্ন দেখিনে। সভ্য জগৎকে কোথায় যে ফেলে এসেছি, আর হয়ত কোনোদিন খুঁজে পাবো না। এই যারা আমার মাত্র দুদিনের বন্ধু, তাদের চিনি কতটুকু? এই ত আসবার সময় তারা একটা বাঁধের কাছে এসে বললে, এটার নাম মানুষ-মারার-বাঁধ। এখানে সেকালে নাকি যোগিনী-অমাবস্যার রাত্রে মানুষ বলি হোতো। এদের বিশ্বাস করেছি, এদের কাছে আত্ম-

সমর্পণ করেছি,—কিন্তু এদের ইতিহাস জানি কতটুকু? ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো, —কই, আমি থাকবো কোথায়, এরা ত' কই বলে না? তাছাড়া যতদূর চাই, কোথাও গ্রামের চিহ্ন নেই। দেখলুম, দিক-দিগন্তব্যাপী শুধু সীমাহীন জল! পূবদিকে ছেলে মানুষের দৃষ্টি যতদূর যায়, কোথাও সেই জলের তটরেখা নেই, কেবল পশ্চিমে দিগন্তের প্রান্তে দেখা যায় আলোর রেখা। শোভারাম বললে, ওইটে কলকাতা!

পরনে আমার আধময়লা একখানা ধুতি, গায়ে একটা গেঞ্জি, খালি পা,—হাতে একটি পুঁটুলি। বাঁধের ওপর দিয়ে আমি তাদের সকলকে অনুসরণ ক'রে চললুম। এক সময় বাঁধ ছেড়ে তা'রা নীচের দিকে নামলো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। শোভারাম বললে, ওই আগে আমাদের আলা।

হু হু ক'রে চারিদিকে ঝড়ের বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে সেই বাতাসে ঘোলাটে আঁসটে গন্ধ পাচ্ছি, মাঝে মাঝে চতুর্দিক্‌ব্যাপী জলরাশির ভিতর থেকে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ শুনছি। যতদূর দেখতে পাই নীলাভ সীসার মতো জল—আর তার উপরে আকাশের প্রতিবিম্বিত তারাদল। দূর পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে কেমন যেন আগুনের আভা দিগন্তে মাখানো,—ওটা কলকাতার আলোকমালার আভাস। কাল দিনের বেলায় এখানকার স্পষ্ট চেহারাটা বুঝতে পারবো।

'আলার' ভিতরে এসে আমরা জন তিনেক উঠলাম, বাকী কয়জন যেন কোন্ দিকে চ'লে গেল। চারিদিকের অকূল সমুদ্রের মাঝখানে এ যেন একটি প্রবাল দ্বীপ,—কোনো দিকে পা বাড়াতে গেলেই জল, আলা শব্দটি বোধকরি আলয়ের অপভ্রংশ। একটি ছোটঘর, গোলপাতা আর বাঁশের খুঁটীতে তৈরী,—জেলেরা কোনো প্রকারে এখানে রাত কাটায়। মেঝেটা কাঁচা, বেড়ার গায়ে বড়বড় ফুটো, ঝড়ের বাতাসে মাঝে মাঝে ঘরের খুঁটীতে টান পড়ছে,—দড়ির বাঁধনটা যেন আর্তনাদ করে উঠছে। এক এক সময় বেড়াটা দুলে উঠছে বাতাসে,—ভয় হচ্ছে ঘরখানা বুঝি হুড়মুড় ক'রে মাথার উপরেই কাৎ হয়ে পড়ে। আমাদের আসবার আগেই এখানে একটী লোক মোতায়েন ছিল। লোকটি এতই কালো যে, ভিতরে কেরোসিনের কুপির আলোয় আর কালিঝুলিপড়া বেড়া ও খুঁটির পটভূমিকায় লোকটাকে বীভৎস মনে হচ্ছে। একপাশে দু'-তিনটি পিতল ও কলাইয়ের বাসন, রান্নার মেটে হাঁড়ি আর কালিপড়া একখানা কড়াই দেখছি, বাঁশের খুঁটির গায়ে সরষের তেলের শিশি ঝুলছে। ও ধারে একটি ছোট্ট শিল নোড়া, দু'টি মাটির কলস, একটি চকচকে ঘটি, এ পাশে একখানা

ভাঙা নড়বড়ে তক্তা, তার উপরে খানদুই চাটাই, আর একখানা ছেঁড়া ময়লা কাঁথা, আর গোটা দুই ছোট বালিশ, আশ্চর্য, বালিশে ওয়াড় পরানো আছে, এবং সেই ওয়াড়ের চেহারাটা রান্নার কড়ার তলাটার চেয়েও কালো। আমি ওদের সম্মানিত অতিথি, সুতরাং তক্তাখানা আমাকে ছেড়ে দিল। বললে, আজ্ঞে, আপনি থাকো ওই তক্তাখানায়। আমরা জনমজুর 'বৈ ত' নয়!

যাক্, জলে এসে পড়লুম। আমার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এখানেই থাকবো চিরকাল,—ছেঁড়া কাঁথায়, এই ভাঙা তক্তায়। মাছের গন্ধে, নোনা রসে, ময়লা পরিচ্ছদে, গোলপাতার ঘরে, অর্ধনগ্ন ছিন্ন-বসন জেলেদের দলে। আমি শ্রমিক, সেই আমার গৌরব,—দেশের অগণ্য অর্ধভোজী দরিদ্রের মধ্যে আমিও একজন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে না, বিলাস থাকবে না, শিক্ষার অভিমান থাকবে না, শ্রেণীগত আভিজাত্য বোধ থাকবে না,—আমি বঞ্চিতের বুভুক্ষিতের দলে থাকবো সকল ব্যক্তি-পরিচয় বর্জন ক'রে। এই জল, এই বিশাল জল,—এই আমার বন্ধু, এই আমার অন্নদাতা। জল আমাকে ছাড়বে না, আমি এ জলকে ছেড়ে কোথাও যাবোনা। বাদার জলে আমি আমার ভাগ্যলিপির পাঠোদ্ধার ক'রে নেবো।

একটি লোক উঠে এলো খেলো হুঁকো হাতে নিয়ে, কলকেয় ফুঁ দিয়ে। বললে, আপনি তামাক ইচ্ছে করো বাবু?

মনে পড়ে গেল, মামার তামাক সাজতে গিয়ে সাত বছর বয়সে গোপনে সিঁড়ির তলায় ব'সে তামাক খেতুম, তারপর বছর দশেক ওটা আর অভ্যাস নেই। সাত বছর বয়সে ওটা ঠিক নেশা ছিল তা নয়, কিন্তু হুঁকোর খোলের মধ্যে যে জলের গুড়গুড়ি—সেইটার দিকে আমার মন প'ড়ে থাকতো। আগুনের সঙ্গে ওই খোলের জলের একটা বিচিত্র মিশ্রণ আমাকে কৌতূহলে ভরে তুলতো। সেই জলের কল্লোল-ধ্বনি কান পেতে শুনতে আমার ভারি ভালো লাগতো।

লোকটার প্রশ্নের উত্তরে একবার যে হাত বাড়াইনি তা নয়, কারণ এক হুঁকায় তামাক খেলে তবে আত্মীয়তা ঘটে, তাদের অভ্যাস প্রকৃতি এবং প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীযোগ স্থাপন হয়,—কিন্তু মনে প'ড়ে গেল, ধূমপান করতে এখনও শিখিনি, আপাতত ওটা থাক। হাসিমুখে বললুম, তোমরা খাও; দরকার হ'লে তোমাদের আমি ফিরে সেজে দেবো।

কাঠের উনুনে ভাত চড়ানো হোলো, তা'র সঙ্গে আলু সিদ্ধ। একটি লোক একখানা হাত-জাল নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল, এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গোটা তিনচার বাটা, মিরগেল, আর অমলেট মাছ জালে বেঁধে নিয়ে এলো। মাছগুলো তখনো লাফালাফি করছে। তাদের চোখে মুখে দেহে কী চাঞ্চল্য,—যেন বাইরের ওই বৃহৎ জলরাশির রহস্য সংবাদ ওদের সর্বাঙ্গে। মাছ-ধরা আমি দেখেছি,—ছুটির দিনে কেরানীরা যেমন ছিপ নিয়ে বন্ধুর সুপারিশে দমদমার ওদিকে মাছ ধরতে যায়। তা'তে খেলা আছে, উল্লাস-অধীরতা আছে, সেটা কেরানীদের একঘেয়ে জীবনের বৈচিত্র্য। মাছ নিয়ে বাড়ী ফিরে তারা যায় তাসের আড্ডায়, আর বউরা হলুদ বেটে রাঁধতে বসে। রাত্রে কেরানীরা সেই মাছের মুড়ো চুষে আর চেটে গল্প করে,—যে-মাছটা হাতছাড়া হয়ে পালিয়েছে, সেটা কত বড়। কিন্তু এই মাছ যেন ঘর-পোষা —এদের মারবার জন্যই পুষে রাখা হয়। মাছগুলি দেখে আমার কেমন যেন চিত্ত-বিকার দেখা দিল!

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙলো,—এখানে ভোর হয় কলকাতার অনেক আগে। সমস্ত রাতের ঝড়ের বাতাসে শীত ধরেছে, কিন্তু কোনো মুহূর্তেই বাতাসের বিরাম নেই। দিনের বেলায় সে-বাতাস গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা। আলার বাইরে এসে আমার কী বিস্ময়! সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে জনহীন লবণ-হ্রদ,—তা'র যেন আদি অন্ত নেই। মাথার উপরে আমার দিগন্ত-জোড়া আকাশ,—আমি যেন চরাচর সৃষ্টির সীমানায় দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনদিকে গ্রাম নেই, ক্বচিৎ কোথাও কেবল একটি 'আলা' চোখে পড়ে। হ্রদের দূর পূর্বপ্রান্তে অস্পষ্ট একটি সীমারেখা চোখে পড়ে, কিন্তু সেই বাঁধের পরে নাকি আবার জলরাশি আরম্ভ। আমি কী স্বাধীন, কী একান্ত,—নিষেধ আর বাধা কোনাদিকে নেই, শাসন আর সমাজ আর বাধ্য বাধকতার চিহ্ন মাত্র কোনোদিকে দেখিনে। ছোটবেলায়-পড়া একটি ইংরেজি কবিতা মনে প'ড়ে গেল। চারিদিকে যতদূর তাকাই, আমিই রাজা আমিই সব,—আমার অধিকার নিয়ে বিরোধ করবার মতো কেউ কোথাও নেই! দেখতে দেখতে লাল সূর্য সাদা হয়ে উঠলো, জলের উপরে সহস্র বৈদূর্যমণির জল-জ্যোতির্লেখা। চারিদিকে মাছের ছপ্ ছপ্ শব্দ জলে। শঙ্খচিল আর মাছরাঙারা উড়ছে জলের উপর,—কাকের দল ঘোরাফেরা করছে। আমাদের আলার গায়েই একটা মিঠে

জলের ডোবা—কাল রাতে এখান থেকেই মাছ নেওয়া হয়েছিল। অদূরে আর একটি আলা,—শোনা গেল ওটা মুক্তোরামের ভেড়ী। এটা শোভারামদের। আমি মাল-কোঁচা দিয়ে কাপড় প'রে মাথায় গামছা বেঁধে খালি পায়ে খালি গায়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। সকাল বেলায় আমার কাজ হোলো, নালার মুখে শরকাঠির তৈরী পলো বেঁধে রাখা। চুনো, কাঁকড়া, ট্যাংরা, মাগুর—ইত্যাদি পলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। একটা নতুন খেলা পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ঢোঁড়া সাপ ছুটে বেড়ায় জলে, তা'রা পলোর মধ্যে ধরা পড়ে। সেই সাপটা ধ'রে বাঁকারির সাহায্যে শূন্যে ছুড়ে দিই, অমনি কোথা থেকে শঙ্খচিল এসে সেটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে পালায়। যাদের সঙ্গে কাল আমি এখানে এসেছি তাদের আর দেখছি নে। তারা মাঝ-রাতে উঠে ছিপ নৌকা নিয়ে চলে গেছে তাড়দার দিকে, সেখান থেকে মাছ নিয়ে পাড়ি দিয়েছে কলকাতায়। এখানে এসে পৌছবে সন্ধ্যার দিকে। যে নতুন সঙ্কীর্ণ খাল দিয়ে আমরা এখানে এসেছি সেই খাল মিশে গেছে বিদ্যাধরীর সঙ্গে। বিদ্যাধরীতে এখন জল নেই, নীচেকার বালুমাটি উপর দিকে উঠে পড়েছে, আর সেই মাটি কাটার জন্য একখানা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরে। নদীটি ছোট্ট কিন্তু তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিদ্যাধরীর নাম শুনে এসেছি ছোট বেলা থেকে, এখানে নাকি কলকাতার ময়লা জল এসে পড়তো আগে, কিন্তু এখন আর পড়ে না। জলের সমতা থেকে মজানদী উঁচু হয়ে উঠেছে। এখন শহরতলীর জল দাঁড়িয়ে থাকে নালা নর্দমায় রোগের বীজ উৎপন্ন করে।

সকাল কাটে নোনাজলের হাওয়ায়, মাছের গন্ধে, শঙ্খচিল আর মাছরাঙার ডাকে, কাঁকড়া আর বাগদা চিংড়ির খেলায়, ঢোঁড়া সাপ ছোড়াছুড়ীতে। আমাকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে একটা কাজের জন্য, সেই কাজটা জলকে কেন্দ্র করে,—সেই কাজে আমাকে জীবনের অবলম্বন খুঁজে নিতে হবে। শৃঙ্খলা আর ব্যবস্থার মধ্যে আমার ঠাঁই হয় নি, আমি ছিট্‌কে এসে পড়েছি এই লবণ হ্রদে,—এর ভিতর থেকে আমার পেশাকে তুলে নিতে হবে। আমি সেই ভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিলুম। এই বাদা ছেড়ে আমাকে যেন কোথাও যেতে না হয়।

রান্নাবান্নার আয়োজন করেছি। এরা কৈবর্ত, মালো, পোদ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর, আমি নিজে বামুন। কিন্তু পৈতাটা ত্যাগ ক'রে মাথায় গামছা বেঁধে দাঁড়ালে আমার সঙ্গে ওদের আর কোন তফাৎ নেই। আমি ওদেরই একজন। ওদের

সঙ্গে আমি মিলে একটি পরিবার। ওদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখবো, ওদের রান্না ক'রে খাওয়াবো, পরিপাটি ক'রে ওদের ঘরখানি গুছিয়ে রাখবো। দুপুর বেলায় একজন বৈরাগী এলো। পরনে তা'র গেরুয়া, বড় বড় চুল, মুখে এতখানি দাড়ি। এসে দাঁড়িয়ে বললে, আজ এখানে সে খাবে। তা'র কোঁচড়ে চাল আছে, চারটি ভাত যদি কেউ রেঁধে দেয়। বললুম, তোমার চাল কটা রেখে দাও, এখান থেকেই তোমাকে ভাত দোবো। মাছ খাও ত?

সন্ন্যাসী বললে, সংস্কার কিছু নেই, আমরা বোরেগী, মাছ খাই বৈ কি।

লোকটা খেল প্রায় তিন পোয়া চালের ভাত। তা'র সঙ্গে শুক্তো, ঝাল, ডাল, ঝোল আর মাছের অম্বল। অর্থাৎ যা রাঁধলুম তার বেশীর ভাগ,—একবারও না বললে না। আহারাদির পর ঘরের মেঝেতে তা'র জন্য মশারি টাঙিয়ে দিলুম। দিনের বেলা ভয়ানক মাছির উৎপাত, মাছির কামড়ে গায়ে ঘা ফুটে যায়। মশারির মধ্যে বসে লোকটা পান খেল গোটা আষ্টেক। আমি গামছাখানা নিয়ে স্নান করতে গেলুম। যে-লোকটা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল, তার নাম বদন। আজ সে এখানে আছে পাহারায়।

স্নান সেরে এসে আমি আর বদন উবু হয়ে বসলুম আহারে। কলায়ের থালায় ভাত, মাটির সরায় ডাল, কড়াইতে তরকারি আর ঘটিতে জল। আমরা যখন গিলছি বোরেগী মশারির মধ্যে ব'সে আমাদের উপদেশ দিতে লাগলো। আগেকার কালে অতিথিরা ছিল নারায়ণ, অতিথি অভুক্ত থাকলে গৃহস্থের অমঙ্গল। আমাদের ভক্তি যেন অটুট থাকে, আমরা যেন গুরুপদে মতি রাখি, তবেই একদিন ভগবানের দেখা পাবো, তবেই আমাদের মোক্ষলাভ। এই সব কথা বলতে বলতে বৈরাগী এক সময় গান ধ'রে দিল,

"এ মায়া-প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাজান সে তা সাজে॥
কর্ম্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে যবে গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ বন্ধু, কেহ ভ্রাতা!
কেহ সেজে এসেছেন পিতা
কেহ স্নেহময়ী মাতা
কত রঙ্গের অভিনেতা যাচ্ছে আসছে কত সাজে।"

ভক্তি-রসে আপ্লুত হ'য়ে বদনের চোখে জলধারা গড়িয়ে এলো। আমার বিশ্রাম নেবার দরকার ছিলনা, আমি বাইরে এসে বসলুম।

বৈরাগী চ'লে গেল অপরাহ্ণকালে। তা'র কিছুক্ষণ পরেই শোভারামের দল নৌকা নিয়ে এসে পৌঁছলো আলায়। আমি তাদের অভ্যর্থনা ক'রে তামাক সেজে দিলুম। তারা সুস্থ হ'য়ে গল্প করতে বসলো, আমি তাদের রান্নার জোগাড় করতে ব'সে গেলুম, বদনের সঙ্গে দিনের বেলায় অমি বাসনপত্র মাজাঘসা সেরে রেখেছিলুম।

শোভারাম আমাকে বললে, বাবু, এ পথ বড় নোংরা, আপনি কি পারবে? তা-ছাড়া আপনার লৌকা নেই,—মাল রপ্তানি করবে কি দিয়ে? তা আপনি করো কিছু দিন, তারপর—আমার যতখানি খ্যামোতা আমি করবো,—তা ছাড়া আজ্ঞে আপনি আবার চক্কোত্তিদের শ্বশুর হও,—আমাদের গুরু ওরা।

আমি যেন অনেকখানি ভরসা পেলুম।

সে দিন মাঝরাত্তিরে আমার ঘুম ভাঙালো। ওদের সময়ের আন্দাজ আছে। ওরা চাঁদ আর তারা দেখে রাত্রের নির্দেশ পায়। আমি ঘুম চোখে বাইরে এসে দাঁড়ালুম, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় গামছা বাঁধা। কিন্তু বাইরের সমস্তটাই যেন স্বপ্ন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। তারই জ্যোৎস্না পড়েছে জলরাশির উপর। অথৈ জ্যোৎস্নার সঙ্গে অথৈ জল যেন জড়িয়ে মিলে দূর-দূরান্তর একাকার হয়ে গেছে। চোখে আমার ঘুম, সেই ঘুম চোখে দেখতে পাচ্ছি বাস্তব আর অবাস্তবে মিলে কেমন, যেন ইন্দ্রজাল-মিশ্রিত কুহেলিকা।

আমরা কয়েকজন কলরব করতে করতে ছিপ নৌকায় গিয়ে উঠলুম। আমার পুঁটলিটা প'ড়ে রইলো বটে, তবে টাকা কয়টা সঙ্গে নিয়ে চললুম। ছোট ছোট লগি ঠেলে নৌকা চললো। খালের চেহারাটা সঙ্কীর্ণ হয়ে দেখতে দেখতে একটা নালার মধ্যে নৌকা ঢুকলো, তখন আর লগি চললো না। হাত দিয়ে পাড় ধ'রে জল টেনে নৌকা চললো। একটু পরে আবার নালাটা বিস্তৃত হয়ে এলো। রাত তখন দেড়টা, ওরা বল্লে। প্রায় সমস্ত বাদাটাই আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।

লতায় পাতায় ছোট ছোট গাছ পালায় খালের পথ আচ্ছন্ন, তারই ভিতরে ভিতরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বাতাস অতি লঘু, বসন্ত বাতাসের মতো স্নিগ্ধ। কোন্‌দিকে যাচ্ছি, কোথা দিয়ে চলেছি, আমার কিছুই জানা নাই। দুদিকে দুই উঁচু পাড়,—সামনে জলের আঁকা বাঁকা রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।

ওদের হাতের কৌশলে নৌকা চলেছে বেশ দ্রুতবেগে। একজন গান ধরেছে বাউল সুরে। এখন চাঁদের রাত, কিন্তু আর কয়েকদিন পরে আমরা এই খাল দিয়ে কেমন করে আনাগোনা করব তাই ভাবছি। এমন অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে নৌকা কেমন করে চলবে? ওদের কোনো ভাবনা নেই, এই ওদের পেশা, এটা ওদের পুরুষানুক্রমিক। কলকাতার লোকেরা মাছ কিনবে সকালে, ওরা সেই মাছ আহরণ করে এই গভীর রাত্রে। কিন্তু এখন কলকাতা ঘুমিয়ে, সুখের আর আরামের নিদ্রায় নিদ্রিত। আমরা চলেছি তাদের মৎস্য-বিলাসের ক্ষুধা মেটাবার জন্য,—আমরা মৎস্যগন্ধের দল। বারবার চোখে আমার ঘুম নামছে জ্যোৎস্নায় আর হাওয়ায়, বারবার চোখ টেনে খুলে রাখছি। আমি জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত, অল্প জল লগি দিয়ে ঠেলে যেতে হবে আমাকে, কাদায় ভরে যাবে আমার সর্বাঙ্গ, —কিন্তু তবু এই নিয়ে এদেরই সঙ্গে আমাকে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে। এটা আমার বাইরের দিক; ভিতরের দিকে আমাকে টানছে জলের আকর্ষণ—অচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন টান। আমাদের নৌকা চলেছে হেলে দুলে এঁকেবেঁকে অতিদ্রুত গতিতে।

ঠিক কয় মাইল জলপথ, এতকাল পরে আর মনে পড়ছে না। নৌকা বেয়ে বেয়ে আমরা এসে পৌছলুম এক ভেড়ীতে। জায়গাটার নাম তাড়দা। মাছের গন্ধ এত প্রবল যে, স্থির থাকা যায় না। এটা নাকি কোন্ বোসেদের জলকর। মস্ত মস্ত কারবাইড্ গ্যাসের আলো জ্বলছে। অন্ধকারে জাল ফেলছে জেলেরা। সেই মাছ এখানে কেনাবেচা চলছে। এ তল্লাটায় মাছ প্রচুর। জলজ্যান্ত মাছ হুড় হুড় করে ঢালা হচ্ছে, সেই মাছ পোরা হচ্ছে টুকরিতে। অসংখ্য ছোট আর বড় টুকরি। দেখতে দেখতে নানাদিক থেকে নৌকা এল। সব দল সেখানে ভিড় করে দাঁড়ালো। মাছ উঠলো নিলামে। ওজন দর নেই, তার সময়ও নেই—ওই টুকরিগুলোই মাছের মাপ। আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

অপব্যয় করার মতো সময় কারো নেই। গভীর রাত্রে সেই নোনা জলাশয়ের ধারে মাছের মতো মানুষরাও যেন কিলবিল করছে। আমাদের সঙ্গে টুকরি ছিল, দশসের, আধমণ, ত্রিশসের, একমণ—বিভিন্ন মাপের টুকরি। তিন টাকা থেকে আরম্ভ করে পঁচিশ টাকা অবধি প্রতি টুকরির দর। শোভারামের দল কয়েকটী টুকরী কিনে,

নৌকায় তুললো, তার পর ময়লা দুর্গন্ধ নোটের তাড়া গুণে দিল দুটী লোকের হাতে। সহসা আমিও সাহসী হয়ে পনেরোটি টাকা দিলুম শোভারামের হাতে। সে আমাকে তিনটি টুক্‌রি কিনে দিল, আমার মাছ উঠলো নৌকায়। কেনাবেচা করতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগলো না। নৌকা-ভরা মাছ নিয়ে আমাদের দু'খানা পান্‌সি আবার খালের জলে ভাসলো। রাত তখন সাড়ে তিনটা বাজে, ওরা বললে। এখান থেকে কলকাতা নয় দশ মাইল। এ নৌকা ভোরে গিয়ে পৌছবে উল্টো-ডিঙিতে। এই মাছ চালান হবে শ্যামবাজার, পাতিপুকুর, বরাহনগর ইত্যাদি কেন্দ্রে। অন্য পথে এখানকারই মাছ চ'লে যাবে রাসমনিবাজার, বেলেঘাটা আর কালীঘাট ভবানীপুরের ওদিকে। হাজার হাজার মণ মাছ প্রত্যহ।

ঠিক সময় মতো না পৌছলে মাছের দাম কতটুকু? এখনই যার দাম শত সহস্র টাকা,—কয়েক ঘণ্টা পরে তার দাম কানাকড়িও থাকবে না। একবার পচ ধরলে লোকে নাকে কাপড় চেপে পালাবে। সুতরাং এ কারবার লাভজনক আর বিপজ্জনক দুইই। আমাদের নৌকা চললো তীরবেগে অন্ধের মতন। কোথাও থামবার উপায় নেই,—একমনে অশ্রান্ত উদ্যমে। আমাদের পাশে ও পিছনে আসছে দু তিনটে নৌকা। কে যাবে আগিয়ে, কে প্রথম মাছ পৌছে দেবে পাজারিদের কাছে। আমি আজ ব্যবসায়ে নেমেছি; ভাগ্যের জুয়ায় বাজি ধরেছি,—আমি এখন জগতের বড় বড় ব্যবসায়ীদের সমগোত্রীয়, দিদিমা বলেন, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

জল তোলপাড় ক'রে আমরা ছুটতে ছুটতে চললুম। চললুম নিদ্রিত নগরীর ঘুম ভাঙাতে। পূবের আকাশে তখন ঊষার আভাস দেখা দিচ্ছে।

ভেড়ীর পর ভেড়ী পার হচ্ছি, বিদ্যাধরী আর খালের সংযোগ স্থল পার হলুম। আমাদের ভেড়ী ঠিক্ কোন্ খানটায়, এবার আর ঠাহর পেলুম না। তার পর একে একে গ্রাম পেরিয়ে, নারকেল বাগান আর কেষ্টপুর ছাড়িয়ে নৌকা চললো কলকাতার দিকে। দেখতে দেখতে নতুন খাল বেয়ে উল্টোডিঙিতে যখন এসে পৌছলুম, তখন ভোর হয়েছে,—সাড়ে পাঁচটা বাজে।

মাছওয়ালীরা এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সঙ্গে বড় বড় পাজারি। আমার মাছের দর আমার হাতে নয়, কারণ দরটা বাজারের মুখ চাওয়া। শোভারাম আমার অভিভাবক, আমার তিনটি টুক্‌রি সে ছাব্বিশ টাকায় বেচলো। দু টাকা নিল নৌকাওয়ালা,—অর্থাৎ আমিই দিলুম। আমার লাভ দাঁড়ালো নয় টাকা। সমস্তটাই তড়িঘড়ি, মাছের

কারবারে সময়ের অপব্যয় নেই। দর বেঁধে ব'সে থাকলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং সকাল সাতটার মধ্যেই আমার বাণিজ্য শেষ হয়ে গেল। নয় টাকা লাভ নিয়ে নাচতে নাচতে আমি বাড়ীর পথে রওনা হলুম, কথা রইলো আগামী কাল বেলা দশটায় আবার আমি ষ্টীম লঞ্চ ধরবো, শোভারামের অনুচর আমার অপেক্ষায় থাকবে।

বেশ মনে পড়ছে আমার সেই নব্য তারুণ্যের অক্লান্ত অধ্যবসায়। খালের জলে আর লবণ হ্রদে আমার ভাগ্য রচনা করতে বেরিয়ে পড়েছিলুম। বৃষ্টি নেমেছে, কাদায় ভ'রে গেছে সর্বাঙ্গ, বর্ষায় টৈটুম্বুর হয়েছে খাল আর জলা,—ভিজতে ভিজতে আমি ঠিক হাজিরা দিয়েছি। জাল পেতেছি জলে, হাল ধরেছি নৌকার, টুক্‌রি তুলেছি মাথায়, লগি ঠেলেছি পান্‌সির, ওদের ভিতরে হারিয়ে গেছি। ওদের জন্য রেঁধেছি, মাছ কুটেছি, বিছানা পেতেছি,—ওদের ঘর বাঁধার কাজে দড়ি আর বাঁকারি জুগিয়েছি। একদিন ওদের ভিতর থেকে আমাকে চিনে বার করবার উপায় ছিল না!

উল্টোডিঙির নতুন খালের ধারে মাসিক পাঁচ টাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলুম, সেখানে রেখেছিলুম একটি কাঠের দাঁড়ি-পাল্লা। সেখানে আসতো শ্রীশ, শোভারাম, বদন, মান্ত, চন্দর ইত্যাদি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা। তাদের জন্য রাখতুম তামাক, মুড়ি-চিঁড়ে, আখের গুড়—এইসব। কেউ প্রকাশ্যে গাঁজা খেতো, তার ব্যবস্থা; কেউ গোপনে তাড়ি খেতো, তার বন্দোবস্ত। ওদের কলহ-বিবাদে, বিতর্কে আর মনোমালিন্যে আমাকে সালিশ মানতো।

আমার ব্যবসা চলছে ভালো; টাকায় প্রায় টাকা আসে। দাসখৎ নেই কারো কাছে, চাক্‌রি খুঁজে হায়রাণ হতে হয়না, কারো মুখ চাওয়া নয়, পরাধীন নয়,—ঘড়ির কাঁটার কাছে অথবা নিয়মের কাছে কোনো আনুগত্য নেই। যেদিন খুশি উপার্জন করবো, যখন খুশি উপার্জন বন্ধ করে দেবো। উপার্জন করতেই হবে নিয়মিত,—এর চেয়ে শাস্তি আর কিছুতে নেই। এখানে আমার দিব্য স্বাধীন জীবন, বাধ্যবাধকতার বন্ধন আমার কোথাও নেই।

বন্ধু বান্ধবদের কাছে শ্রমের মর্যাদা নিয়ে গর্ব ক'রে বেড়াই। তাদের কাছে সব কথা প্রকাশ করিনে। লাভ লোকসানটা সেই বয়সে তখনও আমার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি, কিন্তু আমাকে আকর্ষণ করতো নতুন খালের ওই জল, গ্রামের ওই ঘাট, সীসার মতো নীলাভ বিশাল জলরাশি, অন্ধকারে মৎস-অভিযান; আর গভীর রাত্রের সেই জলকর! কলকাতার এত কাছে, অথচ সহসা সেখানে ছিটকে চ'লে গেলে একেবারে

অপরিচয়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ইতর সাধারণের ভিতর তলিয়ে যাওয়া! ভালো লাগে সারাদিন জলের দিকে চেয়ে থাকা, নিত্য দিন নৌকার সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করা, বর্ষায় কাদায় নালায় জলায় নিজের সকল রুচিবোধ আর শোভনতাকে ভাসিয়ে দেওয়া। ভালো লাগে নতুন বন্য জীবন।

কিন্তু মূলধনটা নিজের হলেও আমাকে অপরের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে থাকতে হোতো। আমার নিজের ভেড়ী ছিল না, নিজের আলা তৈরী করি নি, নিজের নৌকার কোনো ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারি নি। আমার দ্বিতীয় অনুচর খুঁজে পাই নি, জলকর জমা নেবার চেষ্টা ফলবতী হয় নি, এবং প্রতিযোগিতাও ছিল প্রবল। শোভারাম, বদন, মান্থ, জীবন—ওরা আমার যত অন্তরঙ্গই হোক, ওরা ছিল এক-জোট; ওদেরই নৌকায় ওদেরই সহচর্যে আমি ওদের অন্নে ভাগ বসাবো,—এ আমার নিজের কাজে ভালো লাগছিল না। তা ছাড়া দশ পনেরো মণ মাছ তুললে ওদের নৌকা ভ'রে যায়, আমার টুকরির জায়গা হয় না। আমাকে আলাদা নৌকার জোগাড় করতে হয়, কিন্তু সে-নৌকা পাবার কোনো সম্ভাবনা তখন ছিল না। তা ছাড়া জেলে মহলে আমার এই আল্‌টপ্‌কা উপার্জনের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের আভাসও

কিন্তু এও ত' বাঁধন! একটা বিশেষ কাজের ব্যবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন আনা-গোনা এও ত' নিজের কাছে দাসত্ব! মাছ ধরা নয়, মাছ মারা। যে-জলে স্রোত নেই, যা দুর্বার নয়, যার দুরন্তপনা বুকের রক্তকে অধীর চঞ্চল করে তোলে না,—সে যে বদ্ধ জলা! আমি কি চেয়েছিলুম দিনানুদৈনিক অনুকৃতি? আমি কি চাই নিত্য দিন একই কাজের পুনরাবৃত্তি? এটা জলের আকর্ষণ, কিম্বা নোনারসের মোহ,—একি আমি বিচার ক'রে দেখেছি। ওর মধ্যে তরঙ্গ কোথায় কোথায় উদ্দামতা, কোথা বা জল-কল্লোল? শুধু জিহ্বার স্বাদ, শুধু জারক রসের লোভ, শুধু সেই লোভের খাদ্য জুগিয়ে অসচ্চরিত্র উত্তমর্ণের মতো ময়লা নোটের তাড়া গুণে নেওয়া। বদ্ধ জলার সেই নোনা গন্ধ জড়িয়ে থাকে আমার জামা কাপড়ে, পকেটের ভিতরে। টাকা পয়সায় পাই মাছের দুর্গন্ধ, তেলারসের চটচটে ভাবটা লেগে থাকে আমার মুখে চোখে। আমার বিছানা বালিশে কাপড়ে চোপড়ে যেন বাসা বেঁধে রয়েছে লবণ হ্রদের লবণাক্ত বিকার। মাস তিনেক পরে আমি নিজেও ক্লান্তি বোধ করছিলুম।

নিজের দেহে কবে বিকার দেখা দিয়েছে বুঝতে পারি নি। আমার আঙুলগুলো

হয়ে উঠেছে ল্যাটা মাছের মতো, চোখ দুটো যেন বাটামাছের মরা চোখ, চুলগুলো বাগ্‌দা চিংড়ির দাঁড়া, চেহারাটা ভেটকী মাছের মতো কুঁজো, আর পা-দুখানা যেন কাঁকড়ার মতো। মাছের ইতিহাস আমার নখাগ্রে, মাছের জন্ম-মৃত্যু-রহস্য আমার চিন্তায়, মাছের বাজার সম্পর্কে আমি দক্ষ—আমি মৎস্যবিদ্, মৎস্য-ব্যবসায়ী, মৎস্য-পন্থী। মাছ আমাকে ছাড়ে না। কিল্‌বিল ক'রে ওঠে মাছ আমার কল্পনায় আর ভাবনায়,—চোখ বুজে থাকলে আমার সর্বাঙ্গে যেন বাগদা চিংড়ি আর কাঁকড়া দাঁড়া বেয়ে ওঠে। ওদের আক্রমণ থেকে আমি বাঁচতে চাই। কী যন্ত্রণা।—বাদার জলের নোনা রস আমার অন্ত্রে তন্ত্রে যেন ঘুলিয়ে উঠতে থাকে।

মাছ আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলুম জলবাসী হ'তে। যে জল ছল ছলে, ঢল্ ঢলে, যা অশ্রান্ত প্রবাহে নিত্য-নতুন। যে জল বোবা নয়, বাঁধনে আবদ্ধ নয়,—যার প্রাণের ভেতর থেকে উঠে আসবে আমার অচমনী মন্ত্র। কিন্তু এ-জল—সে-জল নয়।

একদিন আমি মাছ মারার কাজে ইস্তফা দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলুম।

*

* *

এমন দিনে আমাদের গরীব পরিবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেল ভাগ্যের বিড়ম্বনায়। দিদিমা কাশী গেলেন, আমরা গিয়ে পড়লুম পূর্ব কলিকাতার অপর প্রান্তে। চাকরি খুঁজে বেড়ালুম কতদিন লালদিঘীর পাড়ায় পাড়ায়। শীতকালে খেলুম চানাচুর, গরমে খেলুম শশার ফালা। কিন্তু চাকরি হোলো না। রবিরা থাকতো উত্তর কলিকাতার, তা'র বাবা ছিলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। লিলি আর সুষমা তখনো ইস্কুলে। তারা আমার পকেট থেকে চিনাবাদাম খুঁজে বা'র করে। আমি রোজ দুপুরে রবির ওখানে যাই খাল ধার দিয়ে। খালের দুইপারে কিছু কিছু গাছপালা, কিছু নির্জনতা কিছু পাখীডাকা। এপারে ওপারে আড়ৎদারদের গোলা, কিম্বা তেলের কল, ওদিকে পায়রাটুনি আর শেঠের বাগানের পথ। নীচের খালে নৌকা অগণ্য। নৌকায় আসে ধান, নুন, পাট, তেল, দড়ি, তামাক, তিসি,—আরো কত কি। পথটা কিছু দুর্গম, দীর্ঘ। ওই পথটা ধ'রে আনাগোনায় আমার ছিল ভবিষ্যতের জালবোনা, ওই পথটা ছিল আমার সাধনার পথ। ওখানে কোনো বন্ধু নেই, আত্মীয় পরিচয় নেই, —শুধু ওই পথে চৈত্রের নিঝুম দুপুরে শুনতুম শালিকের ডাক আর পৌষে দেখতুম শুকনো ধুলোর ঘূর্ণিপাক খাওয়া। মাঝে মাঝে শুনতুম মাঝিমাল্লাদের ভজন, মাঝে

মাঝে পুরাণো ঘোড়ার গাড়ীর ঝরঝরাণি শব্দ। এই খাল এসেছে বাগবাজারের গঙ্গা থেকে, তারপর পূবদক্ষিণ পথ ধ'রে কলকাতা ছাড়িয়ে কতদূর চ'লে গেছে, সেদিন তা'র হদিস পাইনি।

এই খালের ধারে দাঁড়িয়ে একদিন আমি আর রবি জলের উপরে আমাদের ভাগ্য এঁকে নিলুম। রবি বললে, হ্যাঁ, আমি রাজি। কবে যাবো বল্‌ত ?

সাগর-পার আমাদের ডাকলো জগতের সর্বপ্রান্ত থেকে। কলকাতার জীবন কিছু নয়, কলেজে পাশ করা আর ফেল্ করা তুচ্ছ, চাকরী খোঁজা বিড়ম্বনা, আত্মীয়-পরিজনের বন্ধন মোহময়, অভিভাবকদের শাসন যন্ত্রণাদায়ক, স্ত্রীলোকের স্নেহপাশ অতি অসহনীয়,—আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্য। আমরা কোনোদিন বিয়ে করবনা, গার্হস্থ্য জীবনের শতপাকে ঘুরবোনা, সমাজে আমাদের ঠাঁই নেই, ভদ্র ভব্য জীবন আমাদের কাম্য নয়,—আমাদের ছেঁড়া পাল, ভাঙা মাস্তল, ফুটো জাহাজের খোল। আমরা বর্বর, স্বাধীন, উদ্দাম, দুর্বার। সেদিন বৈশাখের আকাশে দেখলুম আগুনের লিখন, দেখলুম বন্য জীবনের পিপাসায় আমরা হা হা ক'রে জলে পুড়ে যাচ্ছি, দেখলুম আমাদের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে—কোথাও কোনো আসক্তি নেই। আমরা চ'লে যাবো, পালিয়ে যাবো !

কিন্তু কোথায় ?

রবি চুপি চুপি বললে, সে আমি ঠিক করেছি। এখান থেকে চীন, সেখান থেকে জাপান, জাপান থেকে আমেরিকায়। সাউথ কালিফর্ণিয়ায় আমরা থাকবো কিছুদিন, —তারপর আটলান্টিক পেরিয়ে আসবো ইউরোপ। কিন্তু বিলেতে যাবোনা। After all, ওখানে দেখবার কিছু নেই। যদি ইচ্ছে হয় আফ্রিকায় যেতে পারি। তারপর কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্ দিয়ে ফিরতে হবে।

কোথায় ?—আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করলুম।

কেন, দেশে ?—রবি বললে।

দেশে ! নন্‌সেন্স্ ! দেশে আর ফিরবো না !—ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি আমার সিদ্ধান্ত ব'লে দিলুম।

রবি আমার দিকে বাঁকাচোখে চেয়ে বললে, after all, আমি কলুটোলার সরকারদের ছেলে। আমাকে ফিরতেই হবে। তবে ফেরবার আগে না হয় সাউথ আমেরিকায় কিম্বা ইউরোপে তোর একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসতে পারি। বেশত

তুই থাকবি সেখানে। আর যদি ইঞ্জিনীয়র হয়ে ইউরোপে থাকতে চাস, তা'র ব্যবস্থাও খুব সহজ। After all, আমার বাবাকে ইউরোপের প্রায় সবাই চেনে!

আমাদের স্কুলের বন্ধুরা তখন কলিকাতার নানা কলেজে ছড়িয়ে পড়েছে। অমৃত একটু ভীরু প্রকৃতি আমাদের দলে—সে কোনোমতে একটি চাকরী পেলেই খুসী। সে বড় অভাবগ্রস্ত, তার কিছু রোজগার হওয়া দরকার। আমাদের আগেই সে সিগারেট খেতে শিখেছে সুতরাং তা'র হাত-খরচ চাই। তা'র জন্য একটা ট্যুইশনি ঠিক করে দেওয়া গেল। আমরা বেকার, বেশ দাম্ভিক রকমের বেকার। আমাদের কোথাও কিছু সম্বল নেই, সেইটি আমাদের গৌরব। পথে ঘাটে কেউ গরীবের ওপর চড়াও হয়েছে, অমনি বাঘের মতো সেই অত্যাচারীর ওপর লাফিয়ে পড়ি। আমরা খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার করে বেড়াই, বারোয়ারীর চাঁদা তুলি, বাড়ীতে লুকিয়ে লোকের বাড়ীর মড়া ব'য়ে শ্মশানে নিয়ে যাই। আমরা সাবালক হয়ে উঠেছি।

দুপুরবেলা কলেজে কলেজে ঘুরি। যারা ভালো ছেলে তাদের ডেকে এনে বিদ্রূপ করি, তাদের আঘাত দিয়ে কথা বলি, তারা যাতে পড়াশুনো ছেড়ে আমাদের মতন বেকার হয় তা'র জন্য এলোমেলো বক্তৃতা করি, বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলে কটূক্তি করি। অমনি ওই সঙ্গে জানিয়ে দিই, আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি—আমরা যাচ্ছি স্বাধীন দেশে, যাচ্ছি আমেরিকায়, যাচ্ছি আলাস্কায়, আর আফ্রিকায়। আমরা যাবো সাগরে, যাবো রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে, যাবো হাবসীদের মুলুকে, যাবো নরওয়ে —যেখানে ছ'মাস দিন ও ছ'মাস রাত। সুদূরলোকে যাবার জন্য ডাক এসেছে, চ'লে যাবো মেরুলোকে, সেই নির্জন তুষারাচ্ছন্ন দ্বীপে—গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে। আমরা এক এক দেশে নামবো, শ্রমিকের কাজ করবো, সেই দেশ ভ্রমণ করবো, আবার যাবো অন্যদেশে। আমরা কখনও মদ স্পর্শ করবো না, গরু ও শূয়োর খাবোনা, কোন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করব না। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য, আমরা হিন্দু,—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির প্রতিনিধি।

আমরা চৌরঙ্গীতে ঘুরে বেড়াই, রেড রোডের পাশে নির্জন ময়দানে গিয়ে বসি, ডায়মণ্ডহারবারের দিকে বেড়াতে যাই, কিম্বা চ'লে যাই বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে সোজা উত্তরদিকে। রাত্রে ঘরে ফিরে আসি ক্লান্ত অবসন্ন জন্তুর মতো। বাড়ীর লোকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তাদের সঙ্গে যেন আমাদের কেমন একটা দুস্তর ব্যবধান—আমাদের মনের জগতের সীমানায় তারা প্রবেশ করতে সমর্থ নয়। আমরাও যেন

তাদের আর নাগাল পাইনে। ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস নেই, ধর্মে আস্থা নেই, সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠিত নীতির আমরা বিরোধী। চুরিটা পাপ, লোভটা অন্যায়, এসকল নীতিকথা তাদের, যারা স্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদের দ্বারা পৃথিবীকে শাসন করতে চায়। আমাদের কেউ আর ডাকে না, কোনো কাজ নেই, আমরা যে সব জায়গা ছেড়ে এসেছি সেখানে আর ফিরে যেতে পারিনে। আমরা ঘরেও ঢুকতে পারলুম না, ঘাটেও জায়গা পেলুম না। যারা একদিন আমাদের বাহবা দিয়েছিল, তারাই বিদ্রূপ আরম্ভ করেছে। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গান্ধীজী বর্ণিত স্বরাজ একান্তই যখন পাওয়া গেল না, ছেলেরা তখন আবার স্কুল কলেজে ফিরে যেতে লাগলো। কেউ ক্ষমা চেয়ে মুচলেকা দিল, কেউ অনুতাপ করলো কেউ নাম ভাঁড়িয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকলো, কারো অভিভাবক জামিন রইলো। আমাদের মনে তখন অবিশ্বাস এসে গেছে, আমাদের মন সংশয়াচ্ছন্ন, আমাদের মধ্যে তখন অবসাদ জমে উঠেছে। কেউ সুখে আর আনন্দে আছে,—আমরা যেন সইতে পারিনে; কেউ ভদ্র-জীবন যাপন করছে, কেউ উপার্জনে মন দিয়েছে, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভ করেছে,—আমরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাদের ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুলি। অর্থ, সম্পদ, অট্টালিকা, মোটর, আভিজাত্য, সুন্দরী নারী, মূল্যবান পরিচ্ছদ,—এ সমস্ত আমাদের ঘৃণ্য। কেউ বিয়ে করেছে একথা শুনলেই তখন আমাদের মনে হোতো, সে যেন একটা নোংরা খানায় প'ড়ে গেছে। কেউ ডিগ্রি পেয়েছে খবর পেলেই মনে হোতো, সে দাসত্বের কালিমা কপালে এঁকে নিয়েছে। নিয়মানুগত্য আমাদের নেই, আমরা বিশৃঙ্খলায় আনন্দ পাই। আমরা শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করিনে কল্যাণকে বিশ্বাস করিনে, মহৎ আদর্শের কথা শুনলেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। আমরা সৈনিক,—রণাঙ্গনে গিয়ে আমরা মানুষের বীভৎসতা যেন দেখে এসেছি। এই সময় হঠাৎ রবিদের সঙ্গে কিছুকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটলো। মা আর সেজমাসিমারা যাচ্ছেন তীর্থে, তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। আমি দুরন্ত, উচ্ছৃঙ্খল—আমাকে রেখে যেতে কারো সাহস নেই, সুতরাং চললুম তাঁদের সঙ্গে। শিশুকালে বার দুই গেছি ভাগলপুরে পিসীমার ওখানে, পিসেমশাই ছিলেন সব-জজ,—কিন্তু ভাগলপুরের সেই বাড়ীটার কথা ছাড়া আর তেমন কিছু মনে নেই। তারপর নাবালক অবস্থায় গেছি রাণীগঞ্জে,—সেখানে শুধু য়লা খনির কুলীবস্তির আশে পাশে দিনরাত ঘুরেছি। আর কিছু মনে পড়েনা। াণীগঞ্জ থেকে গিয়েছি কাশী। সেই প্রথম কাশী—মনে পড়ে শুধু গঙ্গার ঘাট

আর অলিগলি, আর দশাশ্বমেধে প্রতিমা-বিসর্জন। সে বয়সটাও অজ্ঞান। এবারে চলেছি তরুণ বয়সের চোখ নিয়ে। যে গঙ্গাকে চিরদিন দেখে এসেছি নিমতলায় আর আহিরীটোলায়,—সেই গঙ্গা দেবলোক থেকে মর্তে আগমন করেছেন হরিদ্বারে। হরিদ্বার যেন স্বর্গ ও মর্তের সন্ধিস্থল। স্বর্গের অপরূপ স্বপ্ন আর পৃথিবীর স্তব-বন্দনা—হরিদ্বারের এই ছবি। নীল কাচের মত জল দেখলুম জীবনে এই প্রথম। ওদিকে চণ্ডীর পাহাড়, এদিকে মনসা। ব্রহ্মাকুণ্ড আর কুশাবর্ত ঘাট,—কত লোক বসেছে পিতৃ-তর্পণে। কত হাজার হাজার মাছ ঘাটের ধারে, নাকের ওপর তাদের কাঁটা,—কেউ সে মাছ ধরে না। গঙ্গা চলেছে গর্জনে দুই ধারায়। কত জায়গায় সাধুরা বসেছে ধুনি জালিয়ে। কিন্তু এখানকার নীলধারা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। চারিদিকে যেন জীবনের প্রথম বিস্ময়, প্রথম আবিষ্কার ছড়ানো। কী জলকল্লোল, কী মন্ত্রগঙ্গায়, কী ঝরোঝরো শব্দ! অদূরে গঙ্গার স্রোতের উপরে কাঁচা বাঁধ, ওপারে অরণ্যের জটিলতা,—এদিকে শঙ্খঘণ্টা আর দেবমন্দিরে হরিহরি ধ্বনি।

প্রথম আস্বাদন করলুম বৃহত্তর ভারতকে হরিদ্বারের সেই গঙ্গায়। উত্তর তীর ধ'রে আমরা চললুম ভীমগোড়া আর সত্যনারায়ণ, সেখান থেকে হৃষীকেশ। যেখানেই যাই, যেভাবেই দেখি, গঙ্গা ছাড়া আর কিছুই নাই। অরণ্য আর পর্বতের শোভা প্রকাশ পেয়েছে গঙ্গার সহযোগে। কত গুহা গঙ্গার তীরে, কত সন্ন্যাসীর আসন, কত পাথরের বিচিত্র কীর্তি, প্রকৃতির কত অপরূপ বিস্ময়। লছমনঝোলাতেও সেই কথা। একটী ছোট পাহাড় পেরিয়ে লছমনঝোলাতে নামাতে হয়। বিদেশী ভ্রাম্যমানরা বলেন, এই পুল এবং পার্বত্য নীলধারার শোভা সারা জগতের অন্যতম প্রধান বিস্ময়। বহুকাল পরে কালিম্পঙের পথে তিস্তানদীর পুলের উপর দাঁড়িয়ে এরই একটি ছোটখাটো চেহারা দেখেছি। বিরাট হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে এমনি সাঁকো অনেকগুলো পাওয়া যাবে—অবশ্য সেগুলো এত বড় নয়, এমন মহিমাও তাদের নেই। হরিদ্বার থেকে কনখল, দক্ষরাজার ঘাট, নীলধারার তীরে গুরুকুলের পথ। চঞ্চল গঙ্গার খরস্রোত চারদিকে—কিন্তু জীবন বড় মন্থর, বড় নিশ্চিন্ত। কান পেতে থাকলে শোনা যায়, যেন এখানকার প্রাকৃত জীবনের প্রাণলোক থেকে একটি ওঙ্কারধ্বনি উঠছে অনন্তলোকের দিকে, চোখ চেয়ে থাকলে দেখা যায়, এখানে ভারতের অধ্যাত্ম-জীবন আত্ম-সমাহিত আসনে ব'সে শূন্যলোকের দিকে অনন্তকাল চেয়ে রয়েছে।

তারই বার্তা বহন ক'রে ঘরঘর প্রবাহে বয়ে চলেছে জাহ্নবী আপন জলকল্লোলে দেশ থেকে দেশান্তরে।

বৃন্দাবনে দেখলুম, কৃশকায়া কালিন্দী। এপারে অসংখ্য ভাঙা ঘাট, আর প্রাচীন যুগের অবশেষ, ছায়া-নিরিবিলি পাথরের আঁকাবাঁকা পথ,—আর ওপারে বন থেকে বনান্তর। কিন্তু কী দেখবো ব'লে এসেছিলুম এখানে? শুধুই কি তীর্থ? ব্রজের সেই রাখাল বালক এখানে কোথাও কি নেই? তবে কি সবই প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনা? তমালের কালোছায়া কোথায়? কোথা গিরিগোবর্ধন? শুধুই কি দেখে যাবো কালীয়দমনের ভাঙা ঘাট, আর তা'র সামনে নদীর চড়া? যা ছিল একদিন, যা কল্পনায় রস যুগিয়েছে চিরদিন, যা প্রাচীন প্রবাদ, যাদের সঙ্গে জীবনের সর্বপ্রকার দর্শন আর দর্শন-ভঙ্গী জড়ানো,—সে সবই কি থাকবে এই সব নির্বোধ নিষ্প্রাণ পাথরের পাঁজরে পাঁজরে লুকিয়ে? শুধু রুক্ষ ধূলাধূসর বাতাস বয় যমুনার প্রান্তরের উপর দিয়ে, শুধু বট আর অশ্বত্থের বিপুল শুষ্ক নিশ্বাসে কী যেন কাহিনী শোনা যায়, শুধু অন্ধকার রাত্রে অগণ্য পাথরের ভগ্ন প্রাসাদসোপানের অন্ত্রে তন্ত্রে যেন আর্তকণ্ঠ ফুঁপিয়ে ওঠে। ব্রজধাম নেই, আছে সকরুণ কল্পনা; বৃন্দাবন নেই, আছে প্রাণবৃন্দাবন। তখনকার কালে কালিন্দীর চোখ জলভরা থাকতো, আজ সেই চক্ষু শুষ্ক কোটরগত।

তীর্থ সেরে এলুম মাসখানেক পরে। চিনে এলুম পথ, পথের জীবন। পথকে আর ভয় করিনে। দেখে এলুম ভারতের উত্তর অংশ, দেখে এলুম দেশটা কত বড়। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় আমার কল্পনা! আবার সেই কলকাতা, সেই হেদোর ধার, সেই খালের পার! কিন্তু জলের ধারে এসে দাঁড়ালেই দেখতে পাই কন্‌খলের দক্ষরাজার ঘাট, সেই নীলধারা, সেই হৃষীকেশের জলস্রোতের অবিশ্রান্ত কল্লোল! দেখতে পাই সেই বৃন্দাবনের ধীর সমীরের ঘাট, সেই যমুনার ছায়া! দেখতে পাই তাজমহলের নীচেকার সেই যমুনার কল্লোল-গান, কাশীর সেই অর্ধ-চন্দ্রাকার গঙ্গা—এদিকে দূরে সেই বেণীমাধবের ধ্বজা, ওদিকে দূরে রামনগরের সেই রাঙারংয়ের প্রাসাদ! দেখতে পাই রাজপুতনার সেই পুষ্করহ্রদের বিরাট জলভাণ্ডার। পৃথিবী বড় হয়ে উঠেছিল কিছুদিনের জন্য, আবার এখানে এসে ছোট হয়ে গেল। ঘরে এসে ঢুকলে শান্তি নেই, বাইরে বেরোলে কোথাও মুক্তি নেই। আকাশটাও যেন আমায় বেঁধে রেখেছে।

রবি বললে, কী চাস তুই ?

বললুম, কলকাতার হাত থেকে বাঁচতে চাই।

ভুরু কুঁচকে রবি বললে—মানে ? আর চাকরি খুঁজবিনে ?

বললাম, বরং ভগবানকে খুঁজে পাওয়া সহজ। কিন্তু……

রবি বিজ্ঞের মতো বললে, তোর কপালে দুঃখু আছে !

একদিন সিনেমায় কি একটা সামুদ্রিক ছবি দেখে বেরিয়ে আসবার পথে রবি বললে, আই-এ পরীক্ষা আর আমি দেবোনা তা জানিস ?

বললুম, সে কি ! তবে টাকা জমা দিলি কেন ?

রবি হাসিমুখে বললে, টাকাটা বাবার কাছ থেকে নিয়েছি বটে, তবে জমা দিয়েছি কে বললে ?

আমি অনেক ভেবে চিন্তে বললুম, কিন্তু আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে মিছে কথা বলবোনা ? টাকার কথা উঠলে কি বল্‌বি ?

থাম্ তুই।—শোন্, আমাদের সেই আইডিয়াটা মাঠে মারা গেল কিন্তু !

বললুম, কোন্‌টা ?

সেই যে চীন থেকে জাপান, জাপান থেকে আমেরিকা ? ভয় পেলি বুঝি ?

কিঞ্চিৎ !

ভারি ভীতু তুই। তোকে সঙ্গে না নেওয়াই ভালো, মাঝপথে হয়ত কান্নাকাটি করবি !

বিজ্ঞের মতো আমি বললুম, আমার পৌরুষকে খুঁচিয়ে তুলিসনে কিন্তু !

রবি বললে, যা যা, কেবল মেয়েলি কথা শিখেছিস !

সেদিন রবির সঙ্গে খানিকটা বচসা হয়ে গেল। বললুম চীন আর জাপানের কথা ভাবছিস—এদিকে যে টিকে ধরাতে জামিন লাগে। টাকা পাবো কোথা ?

টাকা ! কলুটোলার সরকার আমরা ! After all, টাকার পরোয়া করিনে !

মাথার রক্তটা চন্ করে উঠলো রবির কথায়। টাকার ভাবনা যদি নেই, তবে যাবার ভাবনা কিসের ? ভুলে গিয়েছিলুম কলুটোলার সরকারদের ছেলে আমার বন্ধু ! তার বাবা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তারা দুবেলা লুচি দিয়ে জলখাবার খায়, তারা ট্যাক্সি চড়ে যায় আলীপুরে, লিলি-সুষমা গাড়ী চড়ে যায় ইস্কুলে। কিন্তু শতলক্ষ ভাবনা যে আমার মাথায় ! কেমন করে ছাড়বো সবাইকে ? কেমন করে যাব বিরাট অপরিচয়ের

দিকে? যদি ফিরে না আসি? যদি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ফিরতে না পারি? যদি সবাই ভুলে যায় আমাকে?

কিন্তু, না। চোখ বুজে দেখলুম, আমি পাকা সন্ন্যাসী! কোথাও আমার টান নেই, কোথাও আসক্তি নেই। দায়িত্ব পালন করিনে, কর্তব্য করার প্রয়োজন মনে করিনে, হারালে খুঁজবেনা কেউ, ফিরে না এলে কেউ কাঁদবে না! সংগ্রহ কিছু করিনি, সম্পদ স্বপ্নবৎ, সম্পত্তি এক ফোঁটাও নেই, ভালোবাসা কাকে বলে জানিনে। দেশ-ত্যাগের অধিকার একমাত্র আমারই, পলায়নের সুবিধা একমাত্র আমারই সব চেয়ে বেশী। ভূগোলের ভাল ছাত্র ছিলুম, সুতরাং গোলকটা ঘুরতে লাগলো আমার মাথায়।

বড় সাধ শিশুকালে, বড় হয়ে কাবুলীওয়ালা সেজে লাঠি হাতে নিয়ে সবাইকে ভয় দেখাবো। কুকুরের মতন সবাই পিছন থেকে ঘেউ ঘেউ করবে, কিন্তু লাঠি হাতে দেখে ঘেঁষবে না কেউ। এখন ভাবতে লাগলুম আমি চীনাম্যান সেজে চণ্ডু বেচবো, জাপানী হয়ে চেরীর বাগান দেবো, আমেরিকান সেজে শিষ দিয়ে বেড়াবো নিউইয়র্কের পথে, কিম্বা আফ্রিকার জঙ্গলে নরখাদক সেজে বিষাক্ত বর্শা ছুঁড়ে সাহেবদের বিদ্ধ করবো, অথবা ইহুদীর বেশে তুর্কীগ্রামে গিয়ে টাকার সুদ আদায় করে বেড়াবো। কিছু না পারি ত' জাহাজের নাবিক। এক সাগর থেকে অন্য সাগরে, এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজ। কত রূপক কল্পনা, কত অভিসন্ধি। ভারতবর্ষ বড় অল্প-পরিসর, এখানে আমাকে ধরে না; কলকাতা ছাড়া বাংলাদেশ কেমন, চোখে দেখিনি। উত্তরে নৈহাটি-চুঁচুড়া আর দক্ষিণে ডায়মণ্ড-হারবারের গ্রাম,—এইটুকু পরিচয় বাংলাদেশের সঙ্গে। এবার আমি উল্কার মত ছুটে যাবো, ধূমকেতুর মতো অসীম শূন্যে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াবো। আমি কোন বিশেষ জাতির, বিশেষ ধর্মের, বিশেষ সমাজের নয়। আমি যে-কোনো ভাষায় যে-কোনা দেশবাসীর সঙ্গে কথা কইবো—কেউ যেন আমাকে চিনতে না পারে।

রবি আর আমি, আমি আর রবি। অমৃতর কাছে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যানটা চেপে রাখি। তবে আমাদের ভাসা-ভাসা উচ্চাভিলাষ আর দুরাশার কথা শুনে সে একটু হাসে আর জোরে-জোরে সিগারেট টানে। অমৃত কথা কম বলে, চুপ করে শোনে—এক সময় সহসা এক অভিব্যক্তিতে আমাদের প্রাণের উত্তাপের উপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেয়। বলে, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে। তা'র চেয়ে

শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপ রাইটিং শেখ—ভালো চাকরি পাবি। আমি একটা চেষ্টায় আছি।

তখন থেকে পনেরো বছর পরেও অমৃত আমাদের এই দিয়েছে। বলেছে, সাহিত্যই করো আর সভাসমিতিই করো, শর্টহ্যাণ্ড শেখা ছাড়া উপায় নেই। আমি নিজে সেই চেষ্টাতেই আছি।—বলা বাহুল্য, অমৃতর ভালো চাকরি সেদিনও জোটেনি।

যাই হোক অমৃতের কাছে আমরা অনেক কথা গোপন ক'রে যাই। পৃথিবীর কেউ যেন না জানে আমাদের গতিবিধি, আমাদের মনের কথা। দুপুর বেলাকার রোদে হেদোর বাগানে, কিম্বা বেলঘরিয়ার গ্রাম পথে, কিম্বা যশোর রোডের প্রান্তে, নৈলে চৌরঙ্গীর ফুটপাথ ধ'রে সেণ্ট পল্‌স্ গির্জার দিঘীর পাড়ে,—আমাদের যত কিছু গোপন পরামর্শ। শুধু কানে কানে কথা, শুধু আলোচনা, শুধু বিশ্বপৃথিবীর চক্রান্ত। ছোট ক'রে কোন কথাটা ভাবিনি। রবি লাখপতি হতে চায়না, অন্তত ক্রোরপতি। আমি আমার মনোভাবটা স্পষ্ট জানিনে। টাকা চাই কি প্রতিষ্ঠা চাই, কি বিশ্বভ্রমণ চাই, কিম্বা সাগর-তরঙ্গে দোল খেতে চাই,—ঠিক আমার কামনার স্বরূপটা কেমন, আমি বুঝতেও পারিনে, বোঝাতেও পারিনে। তবে এইটি বারম্বার উপলব্ধি করতে পারতুম, আমার ভিতরে একটা প্রবল দুর্বার প্রবাহ, প্রচণ্ড একটা গতিবেগ, কেমন একটা সর্বনাশা নেশার অন্ধতা,—কেমন যেন দিবারাত্রির একটা লালাসিক্ত লেলিহান ক্ষুধা। নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া যেন আর কিছুতেই নেই,—যেমন অসন্তুষ্ট, তেমন অপরিতৃপ্ত। আমার ভিতরে একটা দুরন্ত উদ্যম থাবা পেতে যেন জন্তুর মতো ব'সে হাঁপায়। হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে গুহা থেকে আপন খেয়ালে,—অরণ্য কান্তার পর্বত জলাশয় উপত্যকা—সব ঘুরে ফিরে আবার এসে ব'সে হাঁপায়। হঠাৎ খেয়ালে কা'কে আক্রমণ করতে ছোটে, হঠাৎ বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে,—আবার হঠাৎ সেই জন্তুটা নিরুপায় হয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে প্রার্থনা জানায়। তার সঙ্গে আমি কোনো মতেই রফা করতে পারিনে।

পরামর্শটা পাকাপাকি হোলো জ্যৈষ্ঠের শেষ দিকটায়। আমরা প্রথমে যাবো বর্মায় কারণ বর্মা যেতে পাসপোর্ট লাগে না। বর্মায় গিয়ে কিছু টাকা জমাবো। তারপর সেখান থেকে হয় দুর্গম পার্বত্যপথ দিয়ে ঢুকবো চীনে, নৈলে কৌশলে শিঙ্গাপুর যাবো। ঠিক করলুম দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের ঢুকতেই হবে, নৈলে

পথ খুঁজে পাবো না। পরামর্শ টা পাকাপাকি হবার পর আমরা কাজে লেগে গেলুম। স্থির কর্‌লুম, জনপ্রাণীকে আমরা ব'লে যাবো না। খড়্গপুরে ফুটবল ম্যাচ্‌ খেলতে যাবার নাম ক'রে সোজা ভোরবেলায় উঠে আউটরাম ঘাটে চ'লে যাবো। জাহাজ ছাড়ে শুক্রবার আর মঙ্গলবারে। সঙ্গে কিছু নেবার চেষ্টা করবো না, কেননা বাড়ীর লোক তাহলে সন্দেহ করবে। একটা হাফপ্যাণ্ট, দুখানা ধুতি, গোটা দুই জামা, একেবারে খালি-হাতে পৃথিবী-ভ্রমণে যাবার সাহস আমার ছিল না। সুতরাং কেঁদে ককিয়ে গোটা দুই টাকা কোনো মতে সংগ্রহ করা গেল। আমার বাড়ীতে এমন বাক্স ছিল না, যে-বাক্স ভাঙলে ভাগ্য-অন্বেষণ-যাত্রাটা সহজ হবে।

কিন্তু কলুটোলার সরকারদের যিনি বংশ-গৌরব, তাঁর টাকা সংগ্রহের ব্যাপারটাতেও আমাকে থাক্‌তে হোলো। তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী থেকে গোটা দুই পিতলের ফুলদানি, খানতিনেক বিলাতী জন্তুর বাঁধানো ছবি, পেপারওয়েট, বাতিদান, কয়েকটা কাচের পুতুল ইত্যাদি আত্মসাৎ ক'রে আনলেন। সেগুলি পুরনো বাজারে বিক্রি ক'রে আটটি টাকা হোলো। তারপর আরো গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা রবি কি ভাবে সংগ্রহ কর্‌লো সেটা প্রকাশ্যে আলোচনা করা সঙ্গত নয়। তবে একছড়া মুক্তাবসানো সোনার বোতাম আমার দিদিমার চেনা প্যারী শ্যাক্‌রার দোকানে বেচতে গিয়ে আমার কি দশা হোলো সেটুকু বলি।

প্যারী বোতামগুলি ওজন ক'রে বললে প্রায় দুভরি সোনা, তবে চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকার বেশী হবে না।

বল্লুম দিদিমা টাকার জন্যে ভারি বিপদে পড়েছেন। তা কি আর হবে। বেশ, তাই দাও।

বোতাম ছড়াটা রেখে প্যারী প্রায় টাকটা আমার হাতে দিয়ে ফেলেছিল আর কি। কাজ হাসিল করার আনন্দে আমি আড়চোখে একবার মাণিকতলা স্ট্রীটের দিকে তাকালুম। রবি সেখানে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সহসা প্যারীর কেমন একটা সন্দেহ হোলো। বুড়ো একটা বোতল বার ক'রে দুফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিল কষ্টি পাথরটির ওপর। বেতাম ঘষার দাগটা সেই ওষুধে ধুয়ে গেল। পরে জেনেছিলুম সেটা নাকি নাইট্রিক্‌ য়্যাসিড্‌।

প্যারী আমার দিকে তাকালো বক্রতীক্ষ্ণ চোখে। বল্লে, এ বোতাম তুমি কোত্থেকে পেলে?

তার কণ্ঠস্বরে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। বল্লুম কেন বলো ত?

এটা গিল্টি পেতল,—আট আনাও দাম নয়! প্যারী চেঁচিয়ে উঠলো।

ঢোক গিলে বল্লুম, সোনার জিনিষ ব'লেই ত' আমাকে পাঠিয়েছেন দিদিমা!

দিদিমা!—প্যারী আমাকে ধমক দিল, দিদিমার নাম তুমি মুখে এনো না, এমন কাজ তিনি জীবনেও কর্‌বেন না, তিনি গঙ্গাজল!—যাও, আর কোন দোকানে ঢুকো না, সোজা বাড়ী চ'লে যাও। কুলাঙ্গার কোথাকার!

কাঁপতে কাঁপতে দোকান থেকে উঠে চ'লে এলাম, রবির দিকে না তাকিয়ে সোজা চ'লে এলাম হেদোর বাগানে। রবি এলো পিছুপিছু। আমি তখনও কাঁপছি। বাড়ীর ভিতরে ছোটবেলায় চুরি-চামারি যে এক আধবার করিনি তা নয়, কিন্তু বাইরের লোককে প্রতারণা করতে যাওয়া এই প্রথম। বোতাম ছড়াটা রবির হাতে দিয়ে বল্লুম, এর দাম আট আনাও নয়! এটা গিল্‌টি—

মানে, এটা বাবার ডেস্ক থেকে এনেছি তা জানিস্? After all, কলুটোলার সরকার কখনো গিল্‌টি ব্যবহার করবে না, মনে রাখিস। ভারী তোর প্যারী শ্যাক্‌রা! চল্‌—

কথা বাড়াবার উৎসাহ ছিল না। জীবনে ওই প্রথম চিনলুম গিল্‌টি কা'কে বলে!

ব্যাপারটা অবশ্য এই দাঁড়ালো যে, দুজনে আর ওটাকে গায়ে মাখলুম না। ওটা হজম ক'রে ভুলে যাবার চেষ্টা করলুম। আমাদের নদীতে তখন জোয়ার এসেছে, আমরা ভাগ্য-অন্বেষণে যাবো—কত জায়গায় মান খোয়াবো, কত শত কাঁটা পায়ে বিঁধবে, কত অভাবনীয় বিপদ আর বাধা এসে আমাদের সামনে দাঁড়াবে। দেশ ছেড়ে যাবার আয়োজন করলে চারিদিক থেকে অগণ্য বন্ধনের টান পড়ে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আর কখনও চোখে দেখবো না, হেদুয়ার জলের ধারে এসে আর দাঁড়াবো না, মানিকতলার খালে তেমনি এসে মহাজনী নৌকারা জমবে, অমৃত ঘুরবে পথে একাএকা, মা অপেক্ষা করবে প্রত্যহ পথের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু আমরা আর ফিরবো না। বিদায় চৌরঙ্গী, বিদায় নিমতলার শ্মশান,—বিদায়, তোমরা সবাই যে যেখানে আছ।

যাবার আগের দিন সমস্ত রাত জেগে নিজের ঘর থেকে নিজের সকল চিহ্ন লুপ্ত ক'রে দিলুম। চিঠিপত্র ছিঁড়লুম, জামা কাপড় গোছালুম,—আর যা কিছু,"

সবগুলোর ওপর থেকে আমরা সামনের পথের সকল পদচিহ্ন মুছে নিলুম। আমার মৃত্যুর পর কে কোন্‌টা পাবে তা উইল ক'রে দিয়ে গেলুম। ছবি কয়খানা, টেবিল-চেয়ারটা, গরম কোট, বাঁধানো খাতা কাউণ্টেন, টিনের বাক্স, কয়েকখানা বই, খেল্‌না-বন্দুক,—অর্থাৎ আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। তারপর শেষ রাত্রি উঠে—তখন সবেমাত্র প্রভাত হচ্ছে,—কাগজ-জড়ানো ফালি-বাঁধা পুঁটলিটি নিয়ে নেমে এলুম। মা জানতো আমি আজ ভোরে খড়্গপুর যাবো। তবু মনে করেছিলুম মায়ের ঘুম থেকে ওঠবার আগে টুক্ ক'রে দরজাটি খুলে পথে বেরিয়ে পড়বো।

কিন্তু আমি তাঁর অষ্টম গর্ভের শেষ সন্তান, পাঁচ মাস বয়স থেকে আমি পিতৃহীন,—সুতরাং শেষ রাত্রি থেকে উঠে মা ব'সে রয়েছেন সদর দরজার পথ আগলে। সুতরাং তাঁর সামনে দিয়ে আমাকে যেতেই হবে। ভাবলুম, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে যাই মায়ের পা ছুঁয়ে। কিন্তু পা ছুঁতে গিয়ে পাছে কেঁদে ফেলি, পাছে সত্য কথাটা বেরিয়ে পড়ে,—এজন্য পলকের মধ্যেই নিজেকে সংযত করলুম।

মা প্রশ্ন করলেন, এত ভোরেই যাচ্চিস ?

মুখ খুলে কথা বলতে সাহস করলুম না, পাছে কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। শুধু ছোট ক'রে বল্লুম, হুঁ।

ক'টার গাড়ী ?

আমি আর জবাব দিলুম না, ততক্ষণে পথে বেরিয়ে পড়েছি। কেবল পিছন থেকে বাড়ীর সদর পেরিয়ে মায়ের শান্ত কণ্ঠস্বর কানে এলো, দুর্গা দুর্গা—

ওই দুটি শব্দ সেদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার কানে-কানে বাজতে লাগলো সমস্ত পথ ধরে। মাকে জীবনে ওই প্রথম প্রতারণা করলুম সেজন্য আমারও আর্তকণ্ঠ সেদিন ওই দুটি শব্দ ধ'রে কাঁপতে লাগলো। বোধ হয় বলতে চেষ্টা করেছিলুম, অন্ধ বাৎসল্যের আকর্ষণ বড় নিষ্ঠুর, সমস্ত জীবনকে সেই বাৎসল্য একটা অতি সঙ্কীর্ণ বদ্ধ জলায় বেঁধে রাখে। তুমি আমাকে হয়ত ক্ষমা করবে না জানি, আমাকে বিশ্বব্যাপী জীবনের পথে হাসিমুখে ছেড়ে দেবে না জানি, কিন্তু এও জানি তুমি আমার সম্মুখ-পথে সঙ্গে দিয়েছো তোমার ইষ্টদেবীকে, তোমার দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে, তোমার সর্বশেষ সন্তানের প্রতি তোমার চিরকল্যাণ-বোধকে, তোমার সমগ্র সত্তাকে।

সেদিনকার প্রভাতে কোন্ পথ দিয়ে কেমন ক'রে পার হয়ে গিয়েছিলুম, কে জানে। চোখের জলে আমার সকল পথ, সকল মিথ্যা, সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ

একাকার হয়েছিল কিনা, আজ তাও তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে চোখের জল গঙ্গার জলে অঞ্জলি দিয়েছিলুম।

পাপ রয়েছে নিজেদের মনে, সুতরাং ভয় আর সংশয় ছড়ানো চারিদিকে। আমরা দুজনে পালিয়ে যাচ্ছি, আমরা ছাড়া একথা আর কেউ জানে না। তবু মনে হচ্ছে সবাই যেন চারিদিক থেকে আমাদের তাড়া ক'রে আসছে। আমরা চুরি করিনি, ঠকাইনি কারুকে, তবু চোরের মতন আমরা চলেছি গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে। কি আতঙ্ক, কি উদ্বেগ, কি যেন সংশয়—চারদিক থেকে আমাদের গ্রাস করতে আসছে। আমরা যেন খুনী আসামী। কোনো প্রকারে টিকিট দুখানা কিনে জাহাজে চড়তে পারলেই কতকটা নিশ্চিন্ত, তারপর জাহাজখানা একবার ঘাটছাড়া হ'লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবো। নিজেদের মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন ক'রে রয়েছি।

ট্রাম থেকে নেমে,—কারণ তখনও কলকাতায় মোটর বাস হয় নি,—আমরা হন হন ক'রে চলেছি চাঁদপাল ঘাট পেরিয়ে আউটরাম ঘাটের দিকে। সকাল তখন সাতটা। রবি ছাড়া-ছাড়া হয়ে ওপাশ দিয়ে চলেছে। ভাবটা এই আমরা যেন পুলিশে ধরা না পড়ি, আমাদের দেখে যেন কারো সন্দেহ না জাগে। এক সময় ইঙ্গিত ক'রে রবি আমাকে বললে, খবরদার, পেছন দিকে চাসনে। সোজা চল্—

আমি প্রাণপণে শিষ দিতে দিতে চললুম। শুকনো ঠোঁটে শিষ আসে না।

টিকিট ঘরের ছোট ফোকরের কাছে এসে দাঁড়ালুম। আগে থেকে খোঁজ নিয়েছিলুম, এখান থেকে রেঙ্গুনের ভাড়া তখন তেরো টাকা। টাকাটা বার ক'রে টিকিট দুখানা নেবার সময় নিজের হাতখানা দেখি ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। নিজের ভাগ্য-অন্বেষণে যাচ্ছি পৃথিবী-ভ্রমণে, তবে এত ভয়টা কিসের? শুনেছি বিলেত থেকে বছরে কুড়ি হাজার ছেলেমেয়ে দেশ ছেড়ে পালায়, তারা ভয় পায়না কেন? এই ত' টিকিট কেনা হয়ে গেল, তবে কি পালানো এতই সহজ? তবে কি সকল মানুষের জন্য পৃথিবীর সব দরজাই খোলা, কেবল আমরাই কি অপরের অনুগ্রহজীবী হয়ে আমাদের পৌরুষকে নীতিভ্রষ্ট করেছি? আমাদের কেন ছাড়পত্র নিতে হয়? আমাদের জীবনটা সহজ নয় কেন? আমাদের জীবনের ভাগ্যোন্নতির জন্য কেন পররাজশক্তির অনুমতি ভিক্ষা করতে হয়?

কিন্তু ভাগ্যোন্নতির শত সহস্র প্রকার কলাকৌশল নিয়ে তখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমার জীবনের প্রথম সমুদ্রযাত্রা তখন হাতের মুঠোর মধ্যে। ছোটবেলায় এক গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল, তুই পরের ধন পাবি, তোর সমুদ্রযাত্রা আছে কপালে,—সেইটির একটি আজ সত্য হ'তে চললো। দুজনের টিকিট দুজনের হাতে নিয়ে আমরা জেঠির উপর এসে দাঁড়ালুম। এর আগে স্টীমারে আমরা বহুবার চড়েছি, কিন্তু এখানা জাহাজ—এর সবটাই বিরাট। জেঠির উপর থেকে একখানা সিঁড়ি অনেক দূর উপরে উঠে গেছে ডেকের গায়ে। সেই সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে অবিশ্রান্ত। দক্ষিণী, পাঞ্জাবী, পেশাওয়ারী, বর্মী, চীনা, নেপালী, উড়িয়া,—যতগুলো জাতকে তখনকার চোখ দিয়ে চিনতে পারি,—সবাই উঠছে। সকলের হাতে পুঁটলি, বাণ্ডিল, বাক্স, চামড়ার ব্যাগ,—কাঁথা, বিছানা,—সব মিলিয়ে কিন্তু ব্যাপারটা নোংরা। যুদ্ধের বন্দীরা যেমন নতমুখে প্রহরীদের কড়া শাসনের সামনে দিয়ে জাহাজে ওঠে, আমাদের ঠিক সেই অবস্থা। টাকা দিয়ে আমরা যেন চোর, যেন করুণাপ্রার্থী। যাঁরা করুণা করবেন অর্থাৎ হেডখালাসী, জমাদার, টিকিট চেকার, ব্যবস্থাপক, জেঠির কর্তা, গেটের প্রহরী,—সকলেই যেন পুলিশের এক একজন বড় সাহেব। নিজেদের অপ্রিয় করার, অশ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার এবং জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধান সৃষ্টি করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই পুলিশের লোকরা এদেশে ক'রে থাকে। কেন করে জানিনে, পিছন থেকে কোনো সঙ্কেত আছে কিনা তাও জানিনে,—শুধু দেখতে পাই পুলিশের লোক মানেই যেন কেমন একটা বন্য হিংস্রতা। অনেককাল পরে আমার এই ভুল অংশত ভেঙেছে,—দেখেছি অনেক সদাশয় ও ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি পুলিশ বিভাগে আছেন। তাঁদের অনেককেই বন্ধু ব'লে জেনেছি।

যাই হোক, কেন ঠেলা খেলুম, কেন ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির গায়ে আমাদের ছিট্‌কে দেওয়া হোলো, কেন সহসা অপমানবোধ করলুম,—সেসব আলোচনা ক'রে অসন্তোষ জমিয়ে তুলবো না। আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ তখন জাহাজে। আমরা চলেছি ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে। আমরা ছোট জীবনের মধ্যে থাকবো না, প্রত্যহের 'লাভক্ষতি টানাটানি অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশভাগ, কলহ সংশয়'—এসব নিয়ে দিন কাটাতে পারবো না, আমাদের যেতেই হবে। আমি কি ভাবছিলুম ঠিক জানিনে, তবে জাহাজখানার কঠিন লোহার শিকলের টানের মতো আমাদেরও পিছন থেকে যেন টান পড়ছিল। ভাগ্য-অন্বেষণের পদ্ধতিটা আমার জানা নেই, কেমন ক'রে উন্নতি করতে হয়,

উপার্জন করতে হয়, কেমন করে ঘর গোছাতে হয়, কেমন ক'রে কর্মজীবনের ভিতর দিয়ে নিজের পথটা কেটে বা'র করতে হয়, অথবা কেমন ক'রে নিজের কোলে ঝোল টানতে হয়,—এ শিক্ষা আমি তখনও পাইনি। আমি শুধু জানলুম আমি বেরিয়ে পড়েছি জাহাজে, সাত সমুদ্রের অজানা লোক থেকে যেন আমাকে আকর্ষণ করছে, আমাকে স্থির থাকতে দিল না, আমার নোঙর ছিঁড়ে গেল ঝড়ের হাওয়ায়,—আমাকে যেতে হবে অজানা থেকে অপরিচয়ের দিকে।

জাহাজের সকলের উপর-তলায় গিয়ে উঠলুম আমি আর রবি। এটাকে বলে আপার ডেক। মস্ত বারান্দা,—সারাদিন বেড়িয়ে বেড়ানো যায়। মাথার উপরে লোহা আর কাঠের বরগার সাহায্যে তেরপল টাঙানো রয়েছে। বহু নরনারী চারিদিকে ছড়ানো। বাইরে খোলা গঙ্গা। ওপারে দেখা যায়, একটা ময়দার কল, এপারে অদূরে হাইকোর্টের চূড়া। আমাদের পুরানো বন্ধু ইডেন গার্ডেন রয়েছে ওই যে। ওই দূরে সেই পিতলের চূড়া-বাঁধানো গম্বুজ, ওইটে হোলো মনুমেণ্ট, আর ওই হোয়াইটোয়ে লেড-লর চূড়া,—ওরা সবাই রইলো, ওরা সুখে থাক, অক্ষয় হয়ে থাক—আমরা বিদায় নিচ্ছি। জাহাজের ওদিকটায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন, অসংখ্য ঘর, অগণ্য সুব্যবস্থা। এদেশের যানবাহনের সর্বপ্রকার আরামদায়ক সুব্যবস্থাগুলি হয়েছে সাহেব-সুবোর জন্য, আমাদের জন্য নয়। ফার্স্ট ক্লাস বললেই সাহেবকে মনে পড়ে। কে সেই সাহেব জানিনে। কিন্তু সার্জেণ্ট মানেই সাহেব। লাট মানে সাহেব, কমিশনার মানে সাহেব, জাহাজের ক্যাপ্টেন মানে সাহেব। কিন্তু খালাসী, জমাদার, ঝাড়ুদার, কুলী, আরদালী, বাবুর্চি, পাহারাওয়ালা,—এদের নাম শুনলে আর সাহেব মনে পড়ে না। ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল শুনলেই দিব্যচক্ষে দেখতে পাই, গাড়ীর মধ্যে কেবল শ্বেতচর্মীরা চলেছে; যেমন অমুক ভারতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি শুনলে গোরা সাহেব-কেই মনে পড়ে। সে যাই হোক, জাহাজের ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাসের দরজাগুলিতে মেহগনি পালিশ করা, পিতলের হাতল, ছোট ছোট সুন্দর জানলা, বারান্দায় পিতল-বাঁধানো রেলিং,—ওদিকে আমাদের যাবার হুকুম নেই, শুধু পার্টিশনের ছিদ্র দিয়ে সভ্যজাতির সৌভাগ্যকে চুরি করে দেখার সুবিধা আছে। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলুম, আমরা যেন মস্ত একখানা চারতলা বাড়ীর ছাদের উপর উঠেছি, নীচের তলাগুলিতে প্রকাণ্ড সংসার। নীচের তলায় দোকান বাজার, আর অসংখ্য লোকের আনাগোনা। এক জায়গায় মস্ত উনুন জালিয়ে এক পুরি-কচুরি আর মিঠাইয়ের দোকান বসেছে।

ওপাশে কয়েকটা ঘরে সব শুদ্ধ চল্লিশ পঞ্চাশটে মহিষ, ষাঁড়, আর ঘোড়া চলেছে। একদিকে অসংখ্য বস্তায় স্তূপাকার খাদ্যশস্য। এদিকে এক পেশাওয়ারীর মস্ত বড় মেওয়ার দোকান। আমরা চিনাবাদাম কিনলুম। আমাদের ভাবটা এই, এরা সব অতি তুচ্ছ মানুষ, আমরা এদের চেয়ে অনেক বড়।

বেলা আন্দাজ প্রায় নটার সময় ইঞ্জিনের ভিতর থেকে নানাবিধ ঘণ্টা বেজে উঠলো। বহু নরনারী চীৎকার করলো, সকলে মালপত্র গুছিয়ে বসলো। রবি আর আমি আপার ডেকে রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ালুম। জাহাজ ছাড়লো। আমরা বিদায় নিলুম, কিন্তু কা'র কাছে তা স্পষ্ট জানি নে। আমার চোখ কাঁপছে, বুক কাঁপছে, পা কাঁপছে। জলের ভিতর চাকার প্রচণ্ড শব্দ, জলটা তোলপাড় হচ্ছে। একটু নড়ে, একটু বাঁকে, একটু পিছনে যায়, একটু সামনে ঘোরে, একটু দোলায়,—এমনি ক'রে জাহাজখানা গঙ্গার মাঝামাঝি এসে গতিবেগ দিল। প্রকাণ্ড জাহাজ—অন্তত আমাদের চোখে! জাহাজখানার নাম, এস্ এস্ এলিফ্যাণ্টা। আমরা কলকাতার তীর থেকে ছিঁড়ে এলুম। এবার সত্যই জাহাজ হু হু ক'রে চললো। আমরা নিয়তির ভেলায় ভেসে চললুম।

গঙ্গার দক্ষিণ পথ। তবে এ-পথের কতকটা অংশ, অর্থাৎ শিবপুর আর বটানিক্যাল গার্ডেনস্ পর্যন্ত আমাদের পরিচিত। এইটুকু গঙ্গাকে আমরা জানি, চিনি। চারিদিকে তখন শেষ জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রজ্বালা, সূর্যের অগ্নিবর্ষণ,—কিন্তু আমরা গঙ্গার দক্ষিণ সমীরণে অতটা কষ্ট পাচ্ছিনে। আমাদের গরম লাগছে না। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বয়লারের তাপের এক একটা গরম ঝলক আসছে, কিন্তু তা ছাড়া কি স্নিগ্ধ, কি অপরূপ জলযাত্রা! জাহাজ চলেছে গঙ্গার গতিপথের সঙ্গে তাল রেখে এঁকে-বেঁকে। মাঝে মাঝে ভাসমান বয়াগুলি দূরের থেকে স্রোতের বাঁকগুলির সঙ্কেত জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিচ্ছে, আর' ক্যাপ্টেন তাঁর নিজস্ব সাঙ্কেতিক ভাষায় ইঞ্জিন চালকের ঘড়িতে কাঁটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। খুঁটিয়ে সবটা আমরা বুঝিনে, কিন্তু অনেকটা এমনই মনে হয়। জাহাজখানি চলেছে ঠিক ময়ূরপঙ্খীর মতো হেলে দুলে এঁকে বেঁকে। আমরা দুই বন্ধু চলেছি নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

মনের মধ্যে বেদনার পাক খাচ্ছে কি ?—বুঝিনে। আনন্দের দোলায় দুলছে কি মন ?—তাও বুঝিনে। নিজেকে ভালো ক'রে বিচার করার জন্য একলা আমি সবাইকে এড়িয়ে রেলিং ধ'রে দাঁড়ালুম; বোধ করি রবিও সেই কারণে দাঁড়ালো দূরে গিয়ে।

ছোটবেলা থেকে সাধ, অকূলের দিকে পাড়ি দেবো। কল্পনা করেছি সেই জীবন—যে-জীবনটা পরিতৃপ্ত, কিন্তু পরিচয়হীন। বাসা বাঁধবো সেইখানে যেটা নির্জন সাগরবেলা; সেই কারণে কল্পনা করেছি আলাস্কা কিম্বা কামস্কাট্‌কা। দক্ষিণ আমেরিকার সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর আমি মানচিত্রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। দেখেছি এখানেও কিছু কিছু জন-হীন বেলাভূমি আছে,—সুতরাং সেটা ভেবে দেখতে পারি! আমি ভেবে রেখেছি উত্তর কিম্বা দক্ষিণ সাগরের মেরুপ্রান্তের শিখরলোক—সেখানে পাতালকন্যা উঠে আসে আলস্যের আলুলিত ভঙ্গীতে,—আপন মনে ব'সে ব'সে আকাশপ্রান্তে আলিম্পনা আঁকে, —আর আমি, রবিনসন ক্রুশোর মতো খুঁজে পাবো কোথাও এক নির্জন দ্বীপ তা'র কাছাকাছি। কোনো দূর তুষার নদীর তট,—যেখানে শিলমাছেরা কথা কয় পরস্পর, তিমিরা যেখানে নির্জনে বিশ্রাম নেয়! কিম্বা এস্কিমোদের সমুদ্রে, যারা জন্তুর ছাল গায়ে ঢাকা দেয়, বরফের ঘরে থাকে, কাঁচা মাংস খায়, চর্বি ছাড়া যাদের আর কোনো জ্বালানি নেই। অথবা আমি থাকবো ব্রেজিলের অরণ্যলোকের প্রান্তবাহিনী এমাজনের তীরে কোনো জনহীন ক্ষুদ্র ভূভাগে। আমার দিন যাবে নদীর মতন। এটা রসকল্পনা, অথবা রূপকল্পনা—এ আমার বিচার ছিল না, কিন্তু যখন আনমনে থাকতুম, এই সব দিবাস্বপ্ন আমার কাছে সত্য হয়ে উঠতো। এমন কি আমার কল্পজগতের কুটীরের ভিতরকার আসবাবপত্র ও তৈজসাদিও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেতুম।—শুধু জল! অর্থাৎ জলাশয়কে মনে মনে দেখি; জলের ভিতরে বাসা বেঁধে থাকি অন্ধ কালো জলের অতল তলে গিয়ে কিছু একটা পরম মূল্যবানকে তুলে আনি। সেটা কি —জানিনে। সেটাকে পেলে আমার সব পাওয়ার ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে কিনা তাও জানি নে!

সহসা জাহাজের গুরুগম্ভীর নাদে ঝট্‌কা ভাঙলো; যেন ঘুম ভাঙলো আমার। নদীর এক এক বাঁকে এক একটি কুঠিবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো বাড়িগুলি। দূরের থেকে দেখছি জানলাগুলি খোলা,—যেন প্রিয়জনের পথের দিকে জানলাগুলি তাকিয়ে। আমরা এখন সকল প্রকার শাসনের অতীতলোকে। আর আমাদের ধরাছোঁওয়া নেই, আমরা সকল বাঁধন কেটে এসেছি। আজ এবং আগামীকাল আমাদের কেউ না খুঁজতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিনে সকলেই একটু দুর্ভাবনায় পড়বে। খড়্গপুর এমন কিছু বিদেশ নয় যে, যেতে আসতে দুদিন লাগবে। দুদিন ধ'রে শুধু ফুটবল ম্যাচ্‌ খেলছি, এটাও তৃতীয় দিনে কারো পক্ষে বিশ্বাস্য হবে না। তাছাড়া

নির্দিষ্ট ঠিকানাও কিছু দিয়ে আসিনি। আমরা সবাইকে প্রতারণা ক'রে এসেছি, এর লজ্জা কতখানি তা দেখবার জন্য আমরা আর উপস্থিতও থাকবো না। সাতদিন পরে সবাই বুঝবে আমরা ঘোর বিপদে পড়েছি; কিন্তু নিরুদ্দেশ যারা হয়েছে তাদের বিপদই বা কি? কিন্তু এসব কথা আর ভাববো না, কারো কথা এখন থেকে আর মনে ঠাঁই দেবো না।

সহসা আমার মনে পড়লো—মায়ের দুটো চোখ; কঠিনে-কোমলে-মেলানো সেই চোখ। সেই চোখ দেখলে একই সময় ভয় করে, আর কান্না পায়। মনে হোলো চোখ দুটো যেন আমার সঙ্গ নিয়েছে, আমার সকল আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করছে। আমাকে প্রশ্ন করছে নিঃশব্দে, সমালোচনা করছে শান্ত দৃঢ়ভাবে, অথচ আকুল হয়ে রয়েছে আমারই প্রতীক্ষায়।—না থাক্, ওই চোখের দিকে তাকাবো না, তাকাতে পারবো না।

আমি ধীরে ধীরে রবির কাছে স'রে গেলুম। কে যেন আমরা পিছু নিয়েছে!

মধ্যাহ্ন কখন্ পেরিয়ে গেছে, এখন অপরাহ্ন। ক্ষুধা কিছু পেয়েছে, কিন্তু খাবার হুকুম আমাদের নেই। চার পয়সা চিনাবাদাম দুজনে খেয়েছি, আজকে আর কিছু নয়। সবশুদ্ধ গোটা পঁচিশেক টাকা আমাদের কাছে আছে, এইটিই আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ। দৈনিক চার আনা থেকে ছয় আনা—আমরা ব্যয় করতে পারি, তার বেশি কিছুতেই নয়। এই টাকায় অন্তত দু-মাস থেকে আড়াই মাস চালাতেই হবে। পাছে আমি গোপনে কোথাও কিছু কিনে খাই, এজন্য আমার যথাসর্বস্ব দুটি টাকা রবি আমার ভিতরের পকেট খানাতল্লাসী করে নিয়েছে। আমাকে থাকতে হবে তার শাসনে, বাঁচতে হবে তার অনুগ্রহে। আজ সকালে তার বাড়িতে নাকি জলখাবার খেয়েছি একথা সে মনে করে রেখেছে! কিন্তু নদীর খোলা বাতাসে যে ক্ষুধা পায়, এ কথা সে মানবে না। সে বলবে, ক্ষুধা পাওয়া অনুচিত। যারা ভাগ্য ফেরাতে যায় সমুদ্র পারে, নদীর হাওয়ায় তাদের ক্ষুধা পায় কেন? তারা উপবাস করতে শিখুক। যদি তার কাছে দাঁড়িয়ে ঢেকুর তুলেছি, অমনি সে সন্দেহ করবে, কোথাও বুঝি খেয়ে এলুম। যদি বলি ওটা পিত্তের ঢেকুর,—রবি বলবে, তুই ডাক্তারী কিছু জানিসনে। After all, আমার দাদামশাই ছিলেন মস্ত বড় শরীরতত্ত্ববিদ্, আমাকে আর ডাক্তারি শেখাতে আসিস্ নে। আমি নীরব হয়ে থাকি। যাই হোক, রবি আমাকে ঘিরে রইলো গোয়েন্দার মতো। যদি চুপ

এগিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলেছি, কিম্বা একটু ও-ধারে গিয়ে ঝিরিঝিরি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছি,—অমনি রবি চোখ পাকিয়ে ডাকে আমাকে। বলে, ছিঃ, ওখানে হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়ে থাকিসনে। লোকের খাওয়া দেখতে নেই!

সে দেখতে চায়, না খেয়ে থাকলে আমার মুখের চেহারা কেমন হয়, তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটে কি না, ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমি ছট্‌ফট্ করি কিনা। অর্থাৎ সকল সময় আমার কাতর ভাবটি সে দেখতে চায়, আমাকে সর্বপ্রকারে প্রকৃতির কাছে পরাজিত দেখলে সে তুষ্ট হয়। আমি কেমন হাঁ করে নিশ্বাস টানি, কেমন ঢোক গিলি, কেমন অবসন্ন হয়ে পড়ি, কেমন তার কৃপার কাছে করুণ আবেদন জানাই,—এর জন্য সে অপেক্ষা করে। সে আমাকে কিছুতেই দেবে না, কারণ অত ঘন ঘন খেলেই যাবে টাকা ফুরিয়ে! খেয়ে-দেয়ে পেট মোটা করা যায়, কিন্তু ভাগ্য অন্বেষণ করা যায় না। এক সময়ে সে আমাকে নিয়ে নীচের তলায় ঘুরতে গেল। এক জায়গায় সুন্দর গরম কচুরি আর তরকারি বিক্রি হচ্ছে, কেউ পাকা আম অথবা কলা খাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে আঙুর কিনে, কেউ পাঁউরুটি আর মাখন আর ডিম নিয়ে বসে গেছে, কোথাও বা আইসক্রীম লিমনেড খুলে খাচ্ছে,—রবি আমাকে সেই সব কেন্দ্রে ইচ্ছাপূর্বক ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। বললে, খাচ্ছে সবাই, তাই বলেই কি তোকে খেতে হবে? সব ভুললি, খাওয়া ভুলতে পাল্লিনে?

বল্লুম, চেষ্টা করি বটে, তবে কি জানিস—?

জানবার দরকার নেই! রবি আমার হাত ধরে টানলো। পুনরায় বললে, চুপটি করে এখানে দয়া করে বসো, অত খাই খাই করো না। ড্যাম—গ্লাটন!

করুণ কণ্ঠে বললুম, তোর ক্ষিদে পায়নি?

আমার! আমি ত' কুকুর বেড়াল নই যে, ক্ষিধে পেলেই খাবো?

আমি মলিন মুখে চুপ করে গেলুম। অনেকক্ষণ যায়। দিনের আলো প্রায় ম্লান হয়ে এলো। নিজের পেটটা পেরিয়ে বাইরের দিকে আর চোখ দুটো যেতে চায় না। এক সময়ে তার কাছ ঘেঁসে এসে বল্লুম, আজ রাতে আমাদের কী খাওয়া হবে?

রবি যেন গর্জন করে উঠলো। বললে, পরশু দিন হেদোর মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলুম? মনে নেই যে, একবারের বেশী রোজ খাব না?

কিন্তু আজ একবারও ত খাইনি এখনও?

বটে। সকালবেলা মা যে তোকে হালুয়া আর চা দিল? সেটা বুঝি খাওয়া নয়?

হাসিমুখে বললুম, আরে, সে ত জল খাওয়া!

বটে! হালুয়াটা জল? এই ভাবে তোর পেট ভরাতে হবে জানলে কিছুতেই আমি আসতুম না।—বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রবি চুপ করে রইলো। অতঃপর আমাকে আমেরিকায় নিয়ে চলা যে তার জীবনে কতখানি নির্বুদ্ধিতা আর বিড়ম্বনা—এই কথাটি সে আমাকে সযত্নে বুঝিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু জাহাজ তখনও বাঙলা-দেশ ছাড়েনি! আমি ভাবছিলুম, ভাগ্যের নৌকা বেঁধেছি তবে কোন্ গাছে? হা ভগবান, মনে পড়ে গেল, রবি সেদিন বুঝিয়েছিল পথে কত বাধা, কত কাঁটা, কত অপমান, কত বিপর্যয়—সব সইতে হবে কিন্তু হাসিমুখে! রবি সে কথা ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি। সুতরাং এখন সে যতই আমাকে তিরস্কার করতে লাগলো, আমি ততই হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রইলুম।

তুচ্ছ খাওয়া! খাওয়ার জন্য এত লাঞ্ছনা! আমার গলায় দড়ি জোটেনি কেন? কিন্তু দিদিমা বলতেন, গয়া কাশী বৃন্দাবন—যেখানেই যাই না কেন, পোড়া পেট যায় সঙ্গে। বাস্তবিক পেটটা বাদ দিলে শরীরের আর থাকেই বা কি? হাত পা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সবাই খেটে খেটে হয়রান কিন্তু পেটটাই শুধু বসে বসে খায়! এই রকম একটা ষড়যন্ত্র শুনে একদা পেট বলে, আমি খাটি কেবা কোথা যায়? পেটকে ঠাণ্ডা রাখো, পেটের সেবা করো, পেটের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার সংগ্রহ করে আনো,—পেট খুব খুশি, হাত-পা খুশি, বিশ্বজগৎ তুষ্ট।

কিন্তু যাকগে। পেটের কথা পেটেই থাক। আমি একলা গিয়ে বসে রইলুম জাহাজের সামনের দিকটায়। তখন সন্ধ্যার ধূসর গোধূলি ছায়া বিস্তার করেছে দূরে।

গঙ্গার দুই পার ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ হয়ে এসেছে, দুই ধারে নদীর কূল আর চোখে পড়ছে না। দুই পারের কৃষ্ণবর্ণ রেখা দুটি কখন্ যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। গঙ্গার জল আর গৈরিক নয়, অনেকটা যেন বিবর্ণ, পানাপচা। ছোট ছোট ঢেউ লাগছে জাহাজের গায়ে। বয়ার আলো আর চোখে পড়ছে না, লাইটহাউসের সঙ্কেতও আর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না,—দূরে কেমন একটা ধূসর অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন সীমাহীনতা। শরীরের মধ্যে কেমন একটা বিকার দেখা দিল। সে বিকার শরীরে কিম্বা মনে কিম্বা মস্তিষ্কে, ঠিক মতো উপলব্ধি করা করা কঠিন। দুই দিকে দুই পার যতক্ষণ

দেখতে পাচ্ছিলুম, ততক্ষণ মনের মধ্যে একটা সাহস ছিল, একটা আশ্রিতভাবের স্বস্তি ছিল। কিন্তু ঘনায়মান সন্ধ্যার পটে দাঁড়িয়ে সামনে চেয়ে যা দেখছি, তা একটুও স্পষ্ট নয়। কোন্‌টা জল, কোন্‌টা আকাশ, কোন্‌টা শূন্যলোক, পৃথিবীর সীমানাই বা কোন্ দিকে—কিছুই স্পষ্ট করে বোঝবার উপায় নেই। জাহাজটিকে আগে মনে হয়েছিল বিরাট, এখন দেখি একবিন্দুও নয়। মনে হয়েছিল জল কেটে কেটে তরতর করে আমাদের ময়ূরপঙ্খী নাও চলে যাবে সাগরের বুকের উপর দিয়ে এখন দেখি সব ভুল! আমরা সবাই একটা দিকচিহ্নহীন পারাবারের মাঝখানে একখানা ভেলায় ভাসছি নিরাশ্রয় নিরুপায়ের মতন—আর ইতস্তত তরঙ্গে আহত-প্রতিহত হচ্ছি। আমার স্বকীয়তা কোথায়, কোথায় আমাদের সাহস, কে দেবে সান্ত্বনা? আকাশ অনন্ত জানি,—চোখে দেখতে পাই, বইতেও পড়ি; কিন্তু জল যে অনন্ত, একথা এমন করে কি জানতুম? সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে শোভা দর্শন এক, কিন্তু সমুদ্রের গহনলোকে এসে দাঁড়ানো অন্য কথা। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, তাই ভয় পাচ্ছি কোন্ দিকে চলেছি তা জানতে পাচ্ছিনে বলেই বিভীষিকা দেখছি। আমার সেই ছোটবেলাকার অগ্নিকোণ আর ঈশানকোণ কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায় গেল আমার আকাশের সেই তিন-তারা? কোথায় আমার সেই সন্ধ্যামণি?

শরীরের মধ্যে বিকার দেখা দিচ্ছে কেন বুঝিনে। মনে হচ্ছে আমি বড় ক্লান্ত কিন্তু না, এতটুকু পরিশ্রম করিনি, ক্লান্তি কেন হবে? হঠাৎ মনে হলো, আমি কি অসুস্থ? কই না, অসুস্থ হবার কোন কারণ ঘটে নি ত' আমার? তবে কি চিনাবাদামের সঙ্গে দুপুরবেলায় কিছু নোংরা গিয়েছিল পেটে? আমার যকৃৎলোকে এত অশান্তি ঘটছে কেন? জাহাজটি তখন নাগরদোলার মতো দুলছে

চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি, আজ একাদশীর নির্জলা দিনে মায়ের এতক্ষণে সন্ধ্যাহ্নিক সারা হোলো। তিনি জপ করছেন, অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে অনলে সাগরে···সাগরে !!

মা জপ করছেন, ত্বমেকাগতির্দেবী নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে!

আলোটা সামনে রেখে তিনি বসেছেন রামায়ণ খুলে। তাঁর ছোট ছেলে কাছে নেই, রামায়ণের নিত্য শ্রোতা নেই। বাড়িখানা ভয়ানক শান্ত; এত শান্ত—যেন বড় বুকচাপা। তিরস্কার নেই, চেঁচামেচি নেই, সকলেই আপন কাজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। পাঁচিলের ওপারে একটা মস্ত বড় গাছ, তার নীচে সাহাদের বড় পুকুর।

রামায়ণের উপর চোখ বুলিয়ে মা তাকাচ্ছেন সেইদিকে। ভাঁড়ারের কাজ আর কিছু বাকি নেই।

রামায়ণের সেই দৃশ্যটা মা পড়ছেন স্থর করে। বানরসেনা চলেছে দক্ষিণ পথে স্বর্ণলঙ্কার উদ্দেশে। সহসা বহুদুর অগ্রভাগে বাধা। অঙ্গদ চললেন তদন্তে। কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না। রামচন্দ্র পাঠালেন স্থগ্রীবকে। কিন্তু স্থগ্রীবও ফিরলেন না। উত্তেজিতভাবে রামচন্দ্র পাঠালেন লক্ষ্মণকে, কিন্তু লক্ষ্মণেরও আর দেখা নেই। তবে কি সীতা-উদ্ধার অসম্ভব? তবে কি এত আয়োজন সব মিথ্যে? অবশেষে রামচন্দ্র চললেন নিজে। বহু যোজন পথ অতিক্রম করে তিনি চললেন বানরসেনার অগ্রভাগে। দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তসীমায় তিনি যখন এসে পৌছলেন, বাল্মীকি তখন ছোট্ট একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন,—সমুদ্র!

ক্ষীণ প্রদীপের কম্পিত শিখাটি পেরিয়ে মায়ের নির্বাক ছুটি শান্ত চোখ বাড়ির উঠান পেরিয়ে গছেপালা ডিঙিয়ে আকাশ অতিক্রম করে চললো নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের সন্ধানে। সেই চোখ এসে দাঁড়ালো আমার সামনে ওই সীমাহীন বারিধি-পাথারের পটভূমিকায়। মনে মনে বললুম, সমুদ্র।

রামচন্দ্র ভুলে গেলেন বানর-সেনার কথা, সীতা-উদ্ধারের কথা, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা, রাবণ-সংহারের কথা। কান ভরে শুনলেন ওই কেবল একটি শব্দ, সমুদ্র। কথা এখানে স্তব্ধ, ভাষা চলৎশক্তিহীন, চিন্তা গতিরুদ্ধ। কিন্তু রামচন্দ্র সমুদ্রের শোভা দেখে বিমূঢ় অভিভূত হয়ে আত্মবিস্মৃতভাবে ডুবে ছিলেন। এখানে সেই শোভা কোথায়? দূরে নিকটে আশেপাশে ছায়াচ্ছন্ন বিভীষিকা ছাড়া আর কোথায় কি? তবে কি ভবিষ্যৎটাও অমনি অকূল কালো? তবে কি সেই কুহকলোক যা আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে অনিশ্চিতের দিকে, তার সমস্তটাই ছলনা?

চোখ বুজে কাৎ হয়ে পড়ে রইলুম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি আর উঠতে পারব না। বাহির সমুদ্রে বাতাস উঠেছে, স্থতরাং খালাসীরা দড়িদড়া নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন ঘরে পড়ছে টুং টাং ঘণ্টা। বাতাস উঠলে জাহাজের কি হয়, দড়িদড়া কোন্ কাজে লাগে, জাহাজ ডোববার কোন আশঙ্কা ঘটে কিনা, এ আমার জানা নেই। একবার কাঁচড়াপাড়া আর জামালপুরে গিয়ে যন্ত্র-বিজ্ঞান শেখবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সে সব জায়গায় যখন একান্তই ঠাঁই

করতে পারিনি, তখন ওটার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যও আর নেই। কে একজন আনাগোনার পথে আমার একখানা পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল—কিন্তু পা দুখানা অসাড় বলেই আর কোন সাড়া দিলুম না। কেন যে নড়তে পাচ্ছিনে, কেন যে চোখ খুলতে পাচ্ছিনে, কেন যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমার লোপ পেয়ে গেছে, এর কোন কারণ তল্লাস করার সামর্থ্য আমার ছিল না। জাহাজের ভিতরকার আলো ছাড়া বাইরে আর কিছু দেখার যো নেই, দেখবারও কিছু নেই—শুধু শুনতে পাচ্ছি জাহাজের দুই গায়ে প্রবল তরঙ্গের আছাড়িপিছাড়ি খাওয়া, আর গোঁ গোঁ গর্জন। জাহাজটা একবার উঠছে উপর দিকে, একবার নামছে অথৈ নীচের দিকে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, দিগন্তলোকের রেখা যেটি আকাশ আর সাগরের সন্ধিস্থল—সেটি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উপর নীচে নামাওঠা করছে।

দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, মনে হয় বসে পড়ি। বসে বসে চেয়ে থাকি। কথা কইতে রুচি থাকে না, কেউ প্রশ্ন করলে বিরক্তি বোধ হয়, খাদ্যের চেহারা দেখলে গা ঘুলিয়ে ওঠে। এক সময় মনে হয়, বসে থাকার চেয়ে শোওয়া ভালো এবং শুয়ে পড়ে চোখ বুজে থাকা আরো ভালো। কিন্তু চোখ বুজলেই মনে হয় যেন কোথায় কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছি—আরো নীচে, আরো নীচে···গেলুম গেলুম, আর নিজেকে ধরে রাখতে বুঝি পারলুম না ··· সহসা হুস করে ভেসে উঠলুম শূন্যে, অনেক উঁচুতে, আকাশের কিনারায়! আবার ··· আবার নামছি ··· আবার নেমে যাচ্ছি ··· নীচে ··· নীচে ··· অনেক ··· অগাধ নীচে ···

সহসা চোখ খুলে যায়, ডেকের পাটাতন নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরি। আমার নিজের উপরে কোন্ প্রভুত্ব নেই, এক্তিয়ার নেই,—আমি ভাগ্যের ক্রীড়নক, আমি নিয়তির খেলা। আমি কেন ভাসছি অগাধ জলে, কে আমাকে ভাসাচ্ছে অকূলে, কে আমাকে টেনে নিয়ে চললো ওই অনন্তলোকে, আমাকে দিয়ে কী কাজ সম্পন্ন করা হবে, কেন এই পৃথিবী-ভ্রমণ, কেন বা এই অভিযাত্রী—সমস্ত প্রশ্ন লণ্ডভণ্ড মথিত-প্রতিহত হোতে লাগলো তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে। সহসা ব্যঙ্গ করলো কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তুই যে বলিস, ঈশ্বরকে মানিনে? তুই যে বলিস, তুই চিরবিদ্রোহী, চিরপলাতক? তুই যে পথে-ঘাটে বলে বেড়াস, তুই দুঃসাহসী? এবার বল ঈশ্বরকে মানিস কিনা? চেয়ে ছাখ তরঙ্গের ওই প্রচণ্ডতার ভিতরে কে দাঁড়িয়ে, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝখানে ওই করাল ভয়াল,—ও কে জানিস্? ওই দিক্‌দিগন্তব্যাপী

মহানিশার ভিতর দিয়ে এই যে তুই ভেলায় চড়ে এখনও ভাসচিস, এ কার অনুগ্রহে? তোকে এই অন্ধকার-সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কতটুকু সময় লাগে? ঈশ্বরকে মানিস কিনা, এবার বল?

এই আকাশপথে যে আলো বাড়িয়ে ধরবে, সে কে? শান্ত হবে তরঙ্গ দল, জাহাজ আবার যাবে মরালগতিতে, আবার খুঁজে পাবে কূল,—এসব কার সঙ্কেত? ভিতরে ভিতরে কোন্ শক্তি নিহিত? কে ফুল ধরায়, আর ফুল ঝরায়? কোন শক্তি টেনে আনে সূর্যচন্দ্রকে? বায়ুপ্রবাহে কে জোগায় প্রাণশক্তি? মৃত্তিকায় কে পাঠায় রস? তরঙ্গের প্রাণে কে আনে প্রচণ্ডতা? জলকল্লোল কার ইঙ্গিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে? আমার ভিতরে কে ঘনিয়ে তোলে চিরকালীন অতৃপ্তি আর অনুসন্ধিৎসা? লতায়, পাতায়, শাখায়, মৃত্তিকায়, মক্ষিকায়, পিপীলিকায়—যে প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম কল্পান্তব্যাপী প্রসারিত—সেসব কার ষড়যন্ত্রে? কে—তা জানিনে। সেটা আমার জানবার বয়স নয়। সেটা জানবার জন্য আমার এ অভিযান নয়। আমি সোজা হয়ে স্থির হয়ে উঠে বসলুম।

আমাকে যেতেই হবে, পার হতেই হবে, আমি যে রবির পক্ষে অযোগ্য সঙ্গী নই, এ প্রমাণ আমাকে করতেই হবে। অসুস্থ হলে আমার চলবে না, ভয় পেলে আমার পৌরুষের হানি ঘটবে,—কিছুতেই আমার উন্নতি হবে না। আর যাই হোক, আমি ত সেই সব মহাপুরুষেরই একজন, যারা মেরুলোকে পাড়ি জমিয়েছে, যারা দুর্গমকে আয়ত্ত করার জন্য গেছে অরণ্যে রণে দারুণ শত্রুমধ্যে অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগৃহে, যারা গেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে, আফ্রিকার নরখাদকের দেশে, হিমালয়ের দুরারোহ তুষার শৃঙ্গে? তারাও ত হয়েছিল মায়ের অবাধ্য, তারাও ভাইবোনদের বাঁধন কেটে-ছিল, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, জীবনের সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে পা বাড়িয়েছিল? আমি তাদেরই একজন।

আবার কখন কোমর ভেঙে কাৎ হয়ে পড়েছি, কখন চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আবিল তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছি, কখন আবার অসুস্থ অনড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি—কিছুই মনে ছিল না। সহসা রবি কোথা থেকে এসে ঠেলা দিয়ে আমাকে ডাকলো,—কিরে, পড়ে আছিস যে?

চোখ খুলে তাকাতে পারছিলুম না। রবি বললে, এ হে হে, বমি করে ভাসিয়েছিস দেখছি। জামা কাপড় নষ্ট করলি ত?

বললুম, বড্ড অসুখ করেছে আমার।

রবি হা হা করে হেসে উঠলো। বললে, দুর গাধা,—এর নাম সী-সিকনেস। অসুখ কি রে? নে খা—ও-ও-অক্। বলতে বলতে তার নিজের পেটের ভিতর থেকে কাঠ-বমি সশব্দে উঠে এলো।

বাঁ হাতে সে আমার মুখের চিবুকের আর নাকের ওপর এক গোছা পুরি আর তরকারী রাখলো, আমার হাতে সেগুলি দেবার ধৈর্য তার ছিল না। আমি চিৎ হয়ে পড়ে আছি, আমার নাকের ডগায় আর ঠোঁটের ওপর পুরি-তরকারি—কিন্তু তখন আমার খাবার শক্তি এতটুকু ছিল না। রবির ততক্ষণে নাড়িভূড়ি পাকিয়ে গলার শির ফুলে চোখ দুটো রাঙা হয়ে কাঠ-বমি উঠছে পেটের ভিতর থেকে। বলছে, না, আমার কিছু হয়নি…বুঝলি, এ কিছু না, আমার এসব হয় না। যত সব নেটিভদের বমি দেখে আমার পেটটা ঘুলিয়ে উঠলো…

রবি আমাকে প্রায়ই নেটিভ বলে। কিন্তু আমার চেয়ে সে কালো।

এক সময় জড়িত কণ্ঠে বললুম, তুই যে বললি, আজকে আমাদের খাবার হুকুম নেই? তবে আবার খাবার আনলি কেন?

রবি বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে বললে, দয়া করে ঘড়িটা দেখবে কি? রাত এখন দুটো, অর্থাৎ টু এ-এ-এম…মানে শুক্রবার থেকে শনিবার। এটা আমাদের ব্রেক-ফাষ্ট মনে রেখো। ভোর বেলা যেন আর খাই-খাই করো না।

বললুম, রাত দুটো এখন?

ও-ও-ওয়াক্ … আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত দুটো এখন। এ আর তোমার দাদার দেওয়া সাত টাকার হাত ঘড়ি নয়,—বমি সামলে রবি পুনরায় বললে, এ ঘড়ীর দাম, after all, পঁচাত্তরটি টাকা … নগদ করকরে … ও-ও-ওয়াক—ক্—ক্ … উঃ—এই বলে সে বুক আর কপালের যন্ত্রণায় হাঁপাতে লাগলো।

আমি অনড় অচেতন।

রবি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, দয়া করে গোঁফের উপর থেকে খাবারটা নামিয়ে এবার খাবে কি? জল-টল বাপু আনতে পারবো না। নাও, চিবাও।

বললুম তোর খাওয়া হয়নি?

আমার? তোর মত হ্যাংলা নই যে, আড়ালে গিয়ে আমি চুরি করে কিনে খাবো। দিব্যি দোকানে গেলুম, বসলুম, পয়সা দিলুম—পেট ভরে খেলুম। ও-ও-ও…

বমির বেগে রবি কাত হয়ে বসে পড়লো। তারপর একটু সামলে বললে, যত সব নেটিভের পাল্লায় পড়ে···এসব জানলে তোকে আমি কিছুতেই আনতুম না। কী ভুল করেছি। এখনই ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ··· ও-ও-ওয়াক্—ক—ক ···

বিশ্বের বিরক্তি আর ঘৃণা তার মুখে চোখে। আর সাড়া দিলুম না, প্রতিবাদ করতে পারলুম না। আমার নাকে, চোখে, মুখে তখন পুরি-তরকারী মাখানো; গোঁফের গোড়ায় সেগুলোর গন্ধ পাচ্ছি তখন আমি আধমরা।

সর্বাঙ্গে বমি মাখা, তার সঙ্গে জামাকাপড়ে তরকারীর দাগ লাগা। এমনি অবস্থায় সকাল হল। ভোরের প্রভাতসূর্য্য কোন্ দিক থেকে উঠেছে দেখিনি, বোধ করি রাত্রি শেষে তন্দ্রা এসেছিল। বাতাস অনেকটা পড়ে গেছে, রোদ উঠেছে, তাই বোধ হয় আমরা কিছু সজ্ঞান হয়েছি। আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে জাহাজের বারান্দা দিয়ে চলা কঠিন,—পা অত্যন্ত টলে, মাথা ঘোরে পড়ি-পড়ি ভাব হয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, সকলেই এলোমেলোভাবে মাতালের মতো করে চলবার চেষ্টা করছে, সুতরাং আমিও সেইভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলুম। খালাসীরা তখন সমুদ্রের থেকে বালতি-বালতি জল তুলে ডেকের উপরতলা ধুতে আরম্ভ করেছে। সেই জল কোথাও দাঁড়াচ্ছে না, দ্রুত চলে যাচ্ছে পিছনে ডেকের নালি দিয়ে।

অবসন্ন চোখ দিয়ে দেখলুম, সমুদ্রের দিকে। এত নীল—এত নীল কখনও দেখিনি। চারিদিকে নীল,—ঘন কালির মতো হাতের কাছে নীল জল। হরিদ্বারের গঙ্গার সেই নীলধারা নয়, কারণ তাতে দেখা যায় স্বচ্ছতা। কিন্তু এ একেবারে ব্লু-ব্ল্যাক কালি যেন হাতে লাগলে রং লেগে যাবে। যত গভীর, তত ঘন, তত বিপুল। আমরা কোন্ দিক থেকে এসেছি, কোন্ দিকে যাবো, তীর কোন্ দিকে—তা'র কোনো সঙ্কেত কোথাও নেই। কতখানি সমুদ্র পেরিয়েছি জানি নে, কতটা বাকি তাও জানিনে। সমুদ্রে সময়ের নির্দেশ নেই। প্রতিক্ষণে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিটাই দুলছে। আমি, তুমি, জাহাজ আকাশ সমুদ্র দিগন্ত,—সমস্তটা দোলায়মান। অদূরে সাগর-পাখীরা আমাদের এই জাহাজটিকে আশ্রয় ক'রে চলেছে সমুদ্র অভিযানে। তা'রা অস্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে এই জাহাজে, এই জাহাজ থেকে নেমে তা'রা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে মাছ শিকার করছে। দুধের মতো শাদা পাখী মাঝে মাঝে ভাসছে গাঢ় নীল সমুদ্র শয্যায়। দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের ভিতর থেকে উড্ডীন মাছ লাফিয়ে প্রায় পঞ্চাশ

কি একশো গজ দূরে উড়ে গিয়ে আবার জলে ডুব দিচ্ছে। নীলবর্ণ তরঙ্গরাশির উপর দুগ্ধশুভ্র সর্পাকৃত ফেনা জমে উঠছে পলকে পলকে। যেন নীলকলেবর বনমালী খেলাচ্ছলে গলায় তুলে নিচ্ছেন যুঁইফুলের মালা। গতরাত্রে অনড়চক্ষে দেখেছি ফসফরাস জ্বলছে সমুদ্রে কোটি কোটি বৈদুর্যমণির মতো। দেখে অভিভূত হয়েছিলুম আজ সকালের রৌদ্রের আলোয় জ্বলছে ফেনার ফণাগুলি। সেই অপরূপ বিদ্যুতের আলোয় চক্ষে যেন ধাঁধাঁ লাগে।

রবি আমাকে অন্য একটা পথ ব'লে দিল, আমি সেই পথ দিয়ে নীচে নেমে গেলুম। আশ্চর্য হয়ে যাই, কত পথ কত অলিগলি। কত রাস্তা চ'লে গেছে কত দিকে,—অনেক সময় পথ হারিয়ে গিয়ে অনেক লোক হন্তদন্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীচের তলায় বাজার বসেছে, গয়লারা দুধ বিক্রি করছে, খাবারের দোকানে পরিবেষণ চলছে। একদল চলেছে স্নান করতে; কেউ জামা কাপড় নোংরা ক'রে সাবান ঘষতে লেগে গেছে। সমুদ্রের দোলায় মানুষের শরীরের নয়টি ইন্দ্রিয় যে কত আলগা হয়ে যায় তার প্রমাণ পাচ্ছি যেখানে সেখানে। আজ সকালে বাতাসের চাপ কিছু কম, তাই অনেকেই কতকটা সুস্থবোধ করছে। চোখ খুলে তারা দেখতে পাচ্ছে, কোথায় কিভাবে তারা অবস্থিত। দেশী স্ত্রীলোকদের খোলা ডেকের ধারে আসতে দেওয়া হয় না, পাছে ঝড়ের সমুদ্র দেখে তারা চীৎকার করে, অথবা তাদের সংজ্ঞা লোপ পায়। মেয়েরা নাকি আবেগপ্রবণ জীব। তাদের রাখা হয় হোলডের নীচে, অর্থাৎ সকলের নীচের তলায়। তাদের সঙ্গে শিশুরা আছে, তারা সকল সময় অসুস্থ—তারা যে জীবিত অবস্থায় জাহাজ থেকে নামবে এমন মনে হয় না। খালাসীরা থাকে ছোট ছোট ঘরে। একটি ঘরে কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি আলমারির তাকের মতো এক-একটি খোকর। প্রত্যেকটি খোকরে এক একজন খালাসী ঢুকে শুয়ে পড়লে সমুদ্রের দোলায় আর তাদের ছিটকে পড়ার ভয় নেই। নীচের থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত একটি মানুষের খোকরের উপর আর একটি মানুষ শুয়ে আছে,—এটি কৌতুক দৃশ্য। মাস্তলের দিকে অসংখ্য জীবনতরী লোহার শিকলে বাঁধা থাকে, তার সঙ্গে লাইফবেল্ট। যদি বিপদ ঘটে, যদি জাহাজ ডোবে, তখন সেইগুলিই শেষ ভরসা। ভেবে দেখলুম, জাহাজডুবির পর জীবনতরীতে ভেসে বেড়ানো, অথবা কোমরবন্ধ জড়িয়ে হাঙরের গ্রাসে যাওয়ার চেয়ে টুপ করে ডুবে যাওয়া অনেক ভালো। মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ ডুবির পর যারা বাঁচে আমি তাদের অতিমানব বলে মনে করি। নিয়ম হল এই, জাহাজ-

ডুবির সম্ভাবনায় আগে নামবে শিশু ও নারী, তারপর বৃদ্ধ, তারপর টিকিট-করা আর সব যাত্রী, তারপর জাহাজের কর্মীরা—সকলের নামবার পর ক্যাপ্টেন নামবেন, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সবশেষে। কিন্তু সেই অন্তিমকালের প্রাণরক্ষার সংগ্রামে এসব নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হবে কি না জানিনে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের বিচারই হলো সর্বশেষ বিচার। তিনিই একমাত্র অধিনায়ক; তিনিই সকলের অভিভাবক। আমাদের জাহাজের খালাসীরা সকলেই নোয়াখালি অথবা চট্টগ্রামের বাঙালী মুসলমান। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য অতিশয় ভালো, শক্তি অপরিমেয়, খায় প্রচুর, তাদের রান্না দিবারাত্রই চলছে। সর্বদা নীল রংয়ের পোষাক, তারা স্নান করে দিনে বহুবার সমুদ্রের অবিশ্রান্ত হাওয়ায় তাদের অসুখ করে না,—সমুদ্রেই তাদের সংসার, সমুদ্রেই তাদের বাসা, সমুদ্রই তাদের জীবন,—তারা সবাই সামুদ্রিক। অহোরাত্র তারা পরিশ্রম করছে, ছুটোছুটি করছে, লোহার শিকল টানটানি করেছে, মাস্তলের ডগায় উঠছে, নীচে নামছে, উপরে ছুটছে। জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার, সহকারী ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ওভারসীয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান, ইঞ্জিনচালক, বয়লারের লোক—প্রত্যেকের কাছেই খালাসী মোতায়েন থাকে। তাদের কাছে যাত্রীদের সুখ-সুবিধা অপেক্ষা জাহাজের কল্যাণের দিকটা বেশী লক্ষ্যণীয়। জাহাজ যেন নির্বিঘ্নে চলে জাহাজের যন্ত্রলোকে যেন কোথাও বিকলতা দেখা না যায়—প্রতি মুহূর্তে সতর্ক প্রহরী চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে জাহাজের সর্বপ্রকার সংবাদ বহন করে আনছে। জল বড় অবিশ্বাসী।

জামা-কাপড় কাচা হলো না, তবে কতকটা সুস্থ হয়ে যখন একটু দেখে শুনে বেড়াচ্ছি, পথে রবির সঙ্গে দেখা। দেখি তার সঙ্গে একজন বাঙালী সাহেব। ইতিমধ্যে কখন যে দুজনে আলাপ হয়েছে জানতে পারি নি। পরিচয় হবার পর জানতে পারলুম তিনি মিস্টার ভাদুড়ী, এই জাহাজেরই ইঞ্জিনীয়ার। বছর তিরিশ-বয়স, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান,—বুঝতে পারা গেল তিনি বিলাত ফেরত; কিছুদিন আমেরিকাতেও ছিলেন। এই জাহাজের এই সামান্য পাঁচশো টাকার চাকরি তিনি শীঘ্রই ছাড়বেন। তিনি আটলান্টিকের কোন জাহাজে ভালো চাকরির চেষ্টায় আছেন। দুজনের আলাপ চলছে ইংরেজিতে হাসি-হাসি মুখে। রবি আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইংরেজি বলছে, একটু অনর্গল হবার চেষ্টা করছে—তার জানানো চাই, ইংরেজি ভাষায় আলাপে সে দক্ষ। তার ব্যাকরণ ভুল হোক আসে যায় না, বাক্য সম্পূর্ণ না হোক ক্ষতি নেই, একবচন আর বহুবচনের গণ্ডগোলে ভাষা গোলমেলে হয়ে উঠুক, গ্রাহ্য

নেই,—তাকে ইংরেজি বলতেই হবে। সে ইংরেজি ভাষা আমাকে শোনানো চাই, আমার চেয়ে সে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত—এটি অবশ্যই প্রমাণিত হওয়া চাই। সে বলে **after all Native**রা **etiquette** জানে না, সুতরাং **awful.** তারা চকোলেট খেতে শেখেনি, **bread and butter** কাকে বলে জানে না, তারা **shabby** তাদের **launch** খাওয়া অত্যন্ত 'পুয়ার',—তাদের **sea sickness** হয় **Bay of Bengal**-এ; তারা **unfit for the sea**,তারা অত্যন্ত **home-sick .**

পরোক্ষভাবে কটূক্তিগুলি আমাকেই করা হচ্ছে। আমি একটু দূরে সরে গিয়ে পুরি-কচুরীর দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। রবি আর মিস্টার ভাদুড়ী তখন অসংলগ্ন আলাপে একেবারে মশগুল। আড়চক্ষে সেদিকে একবার তাকিয়ে আজ আমি বেপ-রোয়ার মতন মস্ত এক ঠোঙা পুরী-তরকারী আর মিঠাই কিনে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করে দিলুম। সবশুদ্ধ পাঁচ আনা হয়েছে শুনে একবার ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল! কিন্তু আর থামা যায় না, কেননা ক্ষীরের প্যাড়া তখনও আমার খাওয়া হয়নি। মরিয়ার মতন একখানা প্যাড়া চেয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ গালে পুরে একঘটি জল ঢক ঢক করে গিললুম। তারপর এক পয়সা পান নিয়ে মুখে পুরলুম। শুনেছি ফাঁসী যাবার আগে লোকে এমনি মরিয়া হয়ে ওঠে।

দোকানদার পয়সা চাইলো সওয়া ছ' আনা। রবি অদূরেই দাঁড়িয়েছিল, আমি গম্ভীর ইঙ্গিতে রবিকে দেখিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লুম। রবি এতক্ষণ আমার আহারাদির ব্যাপারটা কিছুই লক্ষ্য করেনি, এবার তার পাশ দিয়ে পান চিবিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলুম, আমি উপরের ডেক-এ আমাদের জায়গায় আছি, তুই আসিস।

মিনিট দশেক পরে রবি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, অনেকটা যেন কোন দস্যুর পৈশাচিক ভঙ্গিতে। রবির রংটা কালো,—বেশ ঘন কালো, মুখে বসন্তের দাগ, নীচের ঠোঁটটা পুরু, দুইটা সামনের দাঁতের মাঝখানে ঈষৎ ফাঁক, চোখ দুটো ছোট ছোট। হিংস্র শ্বাপদের মতো সেই চোখ জ্বলছে। চেয়ে দেখলুম, সে তার দুই বগলে দুই হাতের ঘুষি পাকিয়ে রেখেছে। দাঁতের উপর দাঁতের পাটি এমন চেপে ধরেছে যে, মুখখানার চোয়াল কঠিন, নিরেট।

তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে বললে, এই, উঠে দাঁড়া রাস্কেল ...

কাতর কণ্ঠে বললুম কেন?

পান খাওয়া হচ্ছে? সোয়াইন······উঠে দাঁড়া—

বললুম, রাগ করেছিস ভাই?

হুঁ। মেয়েলি গলা।—তোর বুকের ছাতির মাপ কত বল্?

ভয়ে ভয়ে একটু কমিয়ে বললুম, সাড়ে উনত্রিশ।

রবি বললে, আমার প্রায় একত্রিশ, তা জানিস? আর লড়ে যা। দেখতে পাচ্ছিস আমার বাইসেপসখানা? এক্সপ্যাণ্ড করলে বুকখানা বত্রিশ হয়, তা জানিস?

ভীতকণ্ঠে বললুম, এইবার জানলুম, মনে রাখবো। আরে ভাই, খুব ক্ষিধে পেয়েছিল তাই ছ' আনা খেয়ে ফেলেছি!

রবি দাঁত কামড়ে আমার নাকের ডগায় ঘুষি এনে বললে,—আমার একটা প্রেস্টিজ আছে, তা জানিস? জানিস আমি কলুটোলার সরকার? ছ' আনা রোজ খেয়ে আমাকে তুই অগাধ জলে ভাসাবি? ভিক্ষে করাবি? এঃ, আবার পান খেয়েছে এক পয়সার! পানের সঙ্গে আবার তাম্বুল-বাহার!—সে যেন খিঁচিয়ে উঠলো।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণের পর আমার দেহ তখন অনেকটা সুস্থ বৈকি। সুতরাং প্রহারের আগে অবধি তার তিরস্কার গায়েই মাখবো না। আর যাই হোক, দুজনে একটু ভালোবাসা আছে মানতেই হবে। আমি সমুদ্রের 'সিনারি' দেখতে লাগলুম।

এমন সময় ফস করে রবির বাঁ হাতখানা বগলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ পিঠের দিকে সে একটি রুমালের পুঁটলি লুকিয়ে রেখে আমাকে কটু তিরস্কার হানছিল। এবার দেখলুম রুমালে বাঁধা এক ঠোঙা পরম উপাদেয় গরম কচুরি, পুরি, নিমকি, আলুর দম, সন্দেশ—ইত্যাদি। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললে, কেন খাব না শুনি? তুই খাবি, আমি খাব না? বেশ করব? তোর পয়সায় খাই? নে তোর এক টাকা পৌনে দশ আনা ফিরিয়ে!—কিন্তু এ-দুদিন আর তোমাকে এক দানাও খেতে দেব না বলে রাখলুম। খেয়ে খেয়ে আমার সর্বনাশ করলে! গ্লাটন্?

বললুম,—কিন্তু না খেয়ে যদি পিত্তি পড়ে?

এঃ পিত্তি! গলা টিপে তোমার পিত্তি এখনই গালিয়ে দেব। ব্লাডি নেটিভ।—বলে রবি আমার মুখের সামনে বসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটি একটি করে চিবিয়ে খেতে লাগলো। ভাবটা এই, আমাকে সে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে, আমার চেয়ে বেশী খাবে, আমার চেয়ে ভালো জিনিস খাবে, এবং আমি যেন তার খাওয়ায় আর

ভাগ না বসাই। চেটে চুষে চিবিয়ে গিলে সে খেতে লাগলো পরম পরিতোষের সঙ্গে।

এক সময় তাকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে বললুম, খাবার জল এনে দেব কি?

সে বললে, দয়ামায়া কি আছে তোর?

উঠে দাঁড়ালুম তৎক্ষণাৎ। তারপর চললুম জাহাজের দোলায় টলতে টলতে। নীচে গিয়ে এক খালাসীর সঙ্গে আলাপ করে একটি টিনের কৌটা সংগ্রহ করা গেল। এক কৌটা মিঠাপানি এনে হাজির করলুম। কৌশলে জানালুম, জলটুকু আনতে আমাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে! অর্থাৎ আমি এত করি বন্ধুর জন্য, কিন্তু তার মন পাইনে। জলটুকু হাতে নিয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলুম। আমার মতো সেবা তার করে কে?

এক সময় রবির আলুর দম-মাখা এঁটো কালো হাতখানা আমার মুখগহ্বরের কাছে এগিয়ে এল। বললে, দয়া করে হাঁ কর, এ সন্দেশটি তোমার জন্যেই কেনা! —এই বলে সন্দেশটা সে সস্নেহে আমার গালে পুরে দিল অতি যত্নে!

আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষয় হোক।

আহারাদির পর আমরা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে-বেলাকার মতো সুস্থির হয়ে বসলুম একটু নিরিবিলিতে, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। সমুদ্র এখন কতকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারা গেল, ক্ষুধার তাড়নাতেই আমাদের মধ্যে পদে পদে বিবাদ বাধছিল। আহার-সংযমটা অবশ্য ভালো, তাই বলে উপোস করে ভাগ্য অন্বেষণ করতে যাব, এ কেমন কথা? রবি খুশী হয়ে বললে, টাকা ত' ফুরোবার জন্যেই। খরচ করতে জানলে তবেই টাকা আসে। ড্যাম্ মনি।

সমুদ্রের স্বভাবটি বুঝতে পেরেছি এই দুদিনে। সকাল থেকে দুপুর অবধি যেন কতকটা শান্ত থাকে, অপরাহ্ণের দিক থেকে বাতাসের চাপ আসে, চেহারাটা যায় বদলে। দেখতে দেখতে সমুদ্র আমাদের চোখ রাঙাতে থাকে। ফ্রান্সের প্রান্তে বিস্কে সাগরও নাকি বঙ্গোপসাগরের মত কর্কশ আর উদ্দাম। আমরা যদি কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারি, যদি সাহসে নিজেদের বাঁধি, যদি চলে-ফিরে বেড়াই, নিয়মিত আহার করি তবেই সমুদ্রকে বাগ মানাতে পারি। আমরা যেন অনেকটা সহজ হয়েছি।

একটা বিদঘুটে গন্ধ আসছে কোথা থেকে। আশপাশে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একটা ময়লা তেলের বাষ্প। গতকাল থেকে এই গন্ধটা আমাদের যেন পেয়ে

বসেছে। গন্ধটা নাকের ভিতর দিয়ে মগজে ওঠে, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে নাড়িতে পাক খায়, আর বমির ভাব আসে। কেমন যেন যন্ত্রণা হয় ওই গন্ধটায়, মন আর মস্তিষ্ক অস্থির-অসুস্থ হয়ে ওঠে, জাহাজে বাস করাটা অসহনীয় করে তোলে। গন্ধটার হাত থেকে কেমন করে আমরা নিষ্কৃতি পাব, এজন্য এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে বেড়াতে লাগলুম। আমাদের অশান্ত করে তুলেছে।

একজন ফিরিওয়ালা পান-চুরুট বিক্রি করছিল। ঠিক মনে নেই আমি কিংবা রবি—দুজনের একজন প্রস্তাব করল, আচ্ছা, সিগারেটের গন্ধ নাকে নিলে হয় না ?

সেই আমাদের প্রথম সিগারেট খাওয়া।

'হাতী' সিগারেট তখন নূতন। তখনও 'ট্যাটলার' ওঠে নি। 'হাওয়াগাড়ি' আর 'কলম্বিয়ার' যুগ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমরা দু'আনা দিয়ে এক প্যাকেট 'হাতী' সিগারেট কিনলুম। এই গন্ধের আক্রমণ থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতেই হবে।

তারপর ?—মায়ের নির্বাক দু'টো চোখ সামনে নেই, দিদিমার কপাল চাপড়ানো নেই, দাদাদের শাসন নেই, বোনেদের গোয়েন্দাগিরি নেই !—আমরা দিব্য সিগারেট ধরালুম। থুতুতে সিগারেটের ডগা ভিজে গেল, অসাবধানে ধোঁয়া গলায় ঢুকে কাসতে কাসতে প্রাণান্ত—আমি ধোঁয়া নিয়ে রবির নাকের কাছে দিই, রবি ধোঁয়া নিয়ে আমার নাকের কাছে ছেড়ে দেয়। আমাদের প্রথম ধূমপান ! এর আগে অনেক ছোটবেলায় মামার জন্য তামাক সাজতে গিয়ে সিঁড়ির ধারে বসে এক-আধবার হুঁকো যে টানিনি, তা নয়—কিন্তু সেটা অজ্ঞানের দুরন্তপনা, সেটা চিন্তাকৃত ব্যবস্থা নয়। আজকেরটা প্রয়োজন, নিতান্ত প্রয়োজন ! আমার ধোঁয়া রবির নাকে, রবির ধোঁয়া আমার নাকে। অন্তত ওই গন্ধটাকে ভুলতেই হবে।

মিঃ ভাদুড়ীর পরে আর দুজন বাঙালী বন্ধু জুটলো। রবির ধারণা, তাঁরা নিতান্তই নেটিভ, অর্থাৎ ভোতো বাঙালী। ডিম, পাঁউরুটি, মাখন আর চকোলেট যে দৈনিক খায় না সে রবির দুচোখের বিষ। তবু আলাপ হলো বৈকি। একজনের নাম হিতেন রায়, আর একজন তাঁর ভাগ্নে—কি যেন নামটা। মামা-ভাগ্নে দুজনেই আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। তাঁরা যাচ্ছেন রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনে হিতেনবাবুর কাকা থাকেন। ঠিক রেঙ্গুন নয়—শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে। কলকাতায়

চাকরি-বাকরি নেই, কাজকর্ম কিছু একটা করা চাই,—কাকাকে ধরে যদি বর্মায় কিছু সুবিধা হয়। তাঁরা খুব আশা করে চলেছেন সে দেশে!

কিন্তু আমরা?

রবি বললে, আমরা অবিশ্যি আপাতত বর্মায় যাচ্ছি—তবে সম্প্রতি চীন-জাপান হয়ে আমেরিকায় যাব। বর্মার লাটকে আর চীনের প্রেসিডেন্টকে আমরা একথা জানিয়েছি। তবে কি জানেন, আমেরিকানরা ভারি ব্যবসাদার। অবিশ্যি আমাদের বিশেষ বন্ধু হলেন ধনগোপালবাবু, দরকার হলে তিনি আমেরিকান গভর্ণমেণ্টকে ধমকে দেবেন। লীগ অফ নেশনস থেকে আমার জ্যেঠামশাইকে নেমন্তন্ন করেছিল, জ্যেঠামশাই যাবার সময় পাননি। আমরা ইউরোপে যদি যাই, তবে সুইস গভর্নমেণ্টের অতিথি হব। কিন্তু আমেরিকায় আমাদের অনেক কাজ, বোধ হয় ইউরোপের নেমন্তন্ন 'একসেপ্ট' করতে পারবো না!

ভাবলুম রবিকে চিম্‌টি কেটে একটু সংযত করি, কিন্তু হিতেনবাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে নতমুখে নিজেদের তরকারি আর বমির দাগলাগা জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারা রবির কথা অবিশ্বাস করছেন কিনা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে তবে অবাক হয়ে রয়েছেন বৈ কি। সুইস গভর্ণমেণ্টের অতিথি যারা হবে, তারা অন্তত ডেকের যাত্রী যে হবে না, তাদের জামাকাপড় যে আর একটু অন্তত ভদ্র হওয়া দরকার—সেদিকে রবির লক্ষ্য ছিল না। রবির কাঁধে ঝোলানো রয়েছে একটা বায়না-কুলার অর্থাৎ দূরবীণ, তার সঙ্গে একটা চামড়ার কেস,—সেইটাই যেন কতকটা আমাদের আভিজাত্যের পরিচয়। অনেকে মনে করতে পারতো সেটা চোরাই মাল,—কেননা তার সঙ্গে আমাদের পোষাকআসাক এবং ভাবভঙ্গি মেলে না। দূরবীণটি রবি শেষ মুহূর্তে পিতার পোর্টমাণ্টো থেকে হাত সাফাই করে চামড়ার ব্যাগে পুরেছিল। সে বলতো, এটি তার দাদামশাইয়ের বিলেত থেকে কেনা। দাম কত?—রবি টাকার অঙ্কটা বলতো না, বলতো উনিশ পাউণ্ড!

হিতেনবাবুদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা সারাদিনে বেশ জমে উঠলো। তাঁরা প্রতিবাদ করেন না, সন্দেহ প্রকাশ করেন না—নিতান্তই ভেতো বাঙালীর মতন নীরব শ্রোতা। এইটাই রবির পক্ষে সুবিধা। রবি জানিয়ে দিল তাদের জমিদারীর কথা, কলুটোলার সরকারদের কথা, তাদের রামবাগানের মামার বাড়ীর পরিচয়, ব্যাঙ্ক-জগতে তার পিতার প্রতিষ্ঠার কথা এবং তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার গল্প! আমি মাঝে মাঝে তার

আজগুবি গল্পে অস্বস্তি বোধ করছি দেখে সে হয়ত এক সময় বলে ওঠে, এটা বোধ হয় তুই শুনিসনি! তোকে বলা হয়নি! যা তুই এখান থেকে, আমাদের জিনিষপত্তরগুলো লক্ষ্য রাখিস।

আমি সামনে থাকলে তার গল্পের পক্ষে অসুবিধা।

হিতেনবাবুরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। বলে, আমাদের কাকার ওখানে যদি সুবিধে না পাই, তবে আপনার সঙ্গী হবো। কি বলেন?

রবি তৎক্ষণাৎ অস্বস্তি বোধ করে। উত্তরে বলে, কি জানেন, আমরা ঠিক টাকা-কড়ি রোজগার করে বড়োলোক হতে বেরোইনি, আমরা বেরিয়েছি লাইফ দেখতে—দেখতে চাই জীবনটা কেমন। **Alter all**, আমরা হলুম **rolling stone! We gather no moss.** হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

রবি কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠে হিতেনবাবুদের প্রস্তাবটাকে হাল্‌কা করে দেয়।

রবি পায়চারী করে আর সিগারেট ধরায়। মিঃ ভাদুড়ী আসেন অবসর সময়ে। দুজনে জাহাজের ডেকের উপর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি চলে ফিরে বেড়ায়। খুব ভাব দুজনে। হিতেনবাবুরা খালাসীদের রান্নাঘর থেকে ভাত সংগ্রহ করে খায়—রবি তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। আমি শুয়ে থাকি, বমির বেগ সামলাই। রবি বলে, আমাদের সঙ্গে Stroll করতে পারিস নে? Stroll করলে বমি আসে না। দিন রাত জাহাজের ডেকে আমার Stroll করতে ভাল লাগে।

অপরাহ্নের দিকে জানতে পারলুম Stroll শব্দটা সে ভাদুড়ীর কাছে সংগ্রহ করেছে। নতুন নতুন ইংরেজী শব্দ শেখবার জন্য সে ডালহাউসী আর চৌরঙ্গীর পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো। এতকাল পরেও তার সে অভ্যাস আছে কিনা জানিনে।

ভাদুড়ী হলেন সাহেব, দস্তুর মতো সাহেব। তাঁর সিগারেট খাওয়া, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকোন, তাঁর ইংরেজী ভাষার বাঁক, তাঁর মুখে টম্‌-ডিক-হ্যারির কথা, তাঁর শুষ্ক চুলের এলোমেলো চেহারা, তাঁর পালিশ করা আচরণ—সমস্ত মিলিয়ে তিনি সাহেব। রবি তার সম্বন্ধে গদগদ। হিতেনবাবুরা ভাত খায়, কোঁচার খুঁটে হাত মোছে, পুঁটলির ওপর বসে, গামছা পরে স্নান করতে যায়, চাকরি খোঁজার কথা বলে, সুতরাং তাদের কোন কালচার নেই। রবি তাদের দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকোয়। আমার মতন 'ভোতোকে' তাদের দলে ভিড়িয়ে দেয়। ভাবটা দাঁড়ালো, এই

ভাদুড়ীর সঙ্গে আমি অথবা হিতেনবাবুরা বন্ধুত্ব করার অযোগ্য। সন্ধ্যার পরে ভাদুড়ী বিদায় নেবার সময় রবি হাত তুলে কোন দিন বলে, চিয়ারো! কোনদিন বলে, অ রিভয়া।

রবির বিদায় সম্ভাষণটা কোনদিনই মাতৃভাষায় শুনিনি।

আমরা সোমবারে পৌঁছবো। কিন্তু রবিবারের দিনের শেষটা আর যেন ফুরোতেই চায় না। বাতাস উঠেছে সাগরে, অশান্ত সাগর ঢেউয়ে ঢেউয়ে থৈ থৈ করছে। জাহাজ দুলছে, ঝড়ো বাতাস লাগছে ডেকের তেরপলে। জল দেখে আমরা ক্লান্ত, স্থলভাগের কথা যেন ভুলেই গেছি। মানুষ যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পথ দিয়ে যে গাড়ি চলে, বড়িগুলো যে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে লোককে আশ্রয় দেয়,—এসব যেন আমাদের কাছে এখন অবাস্তব। নীল রং আমাদের চোখে নেশা ধরিয়েছে। কিন্তু অস্থির হলে আমাদের চলবে না, ধৈর্য রক্ষা অবশ্যই করতে হবে। আর এই ত' সবে আরম্ভ মাত্র। এখনও সম্পূর্ণ বঙ্গসাগর, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম প্যাসিফিক্, চীন সাগর, তারপর জাপান। জাপান আর আমেরিকার মাঝখানে সবচেয়ে বড় মহাসাগর আট্‌লান্টিকের কথা এখন না হয় ছেড়েই দিলুম। আমরা রাত্রে যখন বিশ্রাম করতে শুই পাশাপাশি, আমাদের দুজনের মাঝখানে থাকে বড় বড় সমুদ্রগুলি, আমাদের আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে তরঙ্গ দলের উচ্ছ্বাস ধ্বনিয়ে ওঠে। কাছাকাছি কেউ যখন থাকে না, তখন আমরা টাকাকড়ির হিসেব করি চুপিচুপি। এর মধ্যে এক টাকা সিগারেটে খরচ হয়ে গেছে হিসেব করে আমরা দুজনেই ভয়ে বিবর্ণ। এখন থেকে একটি সিগারেট দুজনে ভাগ করে খাবো এই স্থির হলো। কিন্তু জামাকাপড় কেমন করে কাচা হবে, ধোপা কোথায়, সাবান কোথায়, চুল, ছাঁটার খরচ, কোথায় গিয়ে উঠবো, লোকে সন্দেহ করে জায়গা দেবে কিনা, টাকা রোজগারের আগে পর্যন্ত কি-ভাবে খরচ চালাবো—এইসব বিবিধ সমস্যা ভিড় করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বমির ইচ্ছাও বেড়ে যায়। দীর্ঘরাত আমরা জেগে থাকি। সাগরের শোভা বিরক্তিকর লাগে। সমস্ত শুনে রবি বলে, তুই ত আমাকে তাতিয়ে তুলেছিলি, এবার সামলাও?

বললুম, কুলিগিরি করলে কিন্তু রোজ পয়সা পাওয়া যায়।

রবি বললে, তুই কি বলতে চাস্?

বলতে চাই যদি মুটেগিরি করি, রাস্তায় শুয়ে থাকি ছাতু কিনে খাই—

রবি মিনিটখানেক সিগারেট টানতে টানতে কী যেন ভাবলো। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ইম্‌পসিবল।

বললুম, আমাদের চেহারায় কিন্তু মানিয়ে যেতো রে।

রবি আর্তকণ্ঠে বললে, আমার একটা কাল্‌চার আছে মনে রাখিস! ভাদুড়ি যদি শোনে, আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না আমার প্রেসটিজ যাবে।

বললুম লুকিয়ে লুকিয়ে করবো, ক্ষতি কি?

রবি বললে, তুই বুঝি আমাকে এইজন্যে আনলি? জানিস, আমার বাবা এখনো বেঁচে? জানতে পারলে তিনি সুইসাইড করবেন!

আমার মুখে একটা পাকা কথা জুটে গেল,—সম্ভবত কোন বইয়ের কথাই চুরি করে বললুম, কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে নীচের ভিতটা শক্ত হওয়া দরকার। তাই বলে কুলিগিরি? আমি না হয় আই-এ পড়তে পারিনি। কিন্তু পড়লে গ্রাজুয়েট হতে পারতুম, মনে রাখিস। রবি বলতে লাগলো, দাদামশাই একটু বলে দিলে আমার এ-টি-এস চাকরি মারে কে? একশো পঁচাত্তর টাকা স্টার্টিং, তুই ভাবতেও পারিস নে। তুই বরং মুটেগিরি করিস,—কুলি এসেন্সিতে আমি সুপারিশ করে দেব। আমি কুলী? কী অডাসিটি তোর।

অর্থাৎ আমাদের অদূর ভবিষ্যতের কার্যপন্থা সে রাত্রেও অনির্দিষ্ট রয়ে গেল। আমি আর রবিকে না ঘাঁটিয়ে চুপ করে গেলুম।

সেই রাত্রে আমাদের প্রথম ভালো ঘুম হয়েছিল। জাহাজের দোলা ছিল কম, সুতরাং বমির চাড়ও কম। বমির বেগ কমবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সুস্থ বোধ করতে লাগলুম। আমাদের আতঙ্কও অনেকটা কমে গিয়েছিল।

পরদিন প্রভাত সাড়ে ছটা কিম্বা সাতটায় আমরা অস্পষ্ট তীরভূমি লক্ষ্য করলুম। প্রথম তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হলে জাহাজের যাত্রীরা আনন্দে কি প্রকার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সেই দৃশ্য দেখলুম। গ্রহলোকে নূতন একটি পৃথিবী সহসা আবিষ্কৃত হলে, অথবা মৃত প্রিয়জন সহসা বেঁচে উঠে দাঁড়ালে প্রাণে যে উল্লাস দেখা দেয়, অনেকটা সেইরূপ। কেউ চীৎকার করে, কেউ গান গায়, কেউ অনাবশ্যক ছুটোছুটি করে। শিশুরা, মেয়েরা, বৃদ্ধরা—সবাই নীচের থেকে উঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যেন মৃত্যুসাগরের অপর প্রান্তে জীবনের ইসারা দেখা দিয়েছে। দিগন্তলোকে একটি ঘন সবুজ সুতার রেখা দেখা যায়। রবি তার বায়নকুলার দিয়ে ঘন ঘন দেখতে লাগল,

কিন্তু আমাকে একটিবারও দিল না। আমার উৎপীড়িত কৌতূহল মাথা খুঁড়তে লাগল দিগন্তের শেষ প্রান্তে।

নদীর মোহানায় আমাদের জাহাজ প্রবেশ করেছে। একটি পাইলট জাহাজ—ছোট্ট জাহাজ—আমাদের আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। এইটিই নাকি নিয়ম। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে রেঙ্গুনের গম্বুজ, মিনার, চূড়া—আরো কত কি! বড় বড় প্রাসাদগুলো শ্বেতবিন্দুর মতো চিকচিক করছে! আমরা বিস্ময়কর একটি নূতন জগতের সীমানায় এসে পৌছেছি। কিন্তু এ কোন্ জগৎ?

বেলা প্রায় আটটা। রোদ তখনও কাঁচা। নদীর দূর কিনারায় প্রথম লক্ষ্য করছি চন্দ্রাকার শাম্পান,—ঠিক এক ফালি পঞ্চমীর চাঁদ। নদীর তট ছেড়ে উপর দিকে দেখতে পাচ্ছি, এক বিরাট স্বর্ণ মন্দিরের চূড়া। সেই সোনার চূড়াটি রেঙ্গুনে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। রৌদ্রে সেই চূড়া ঝলমল করছে।

আমরা বর্মায় এসে পৌছলুম।

বয়স আমাদের সবেমাত্র আঠারো ছাড়িয়েছে, সুতরাং বাইরেটায় যতই সাহস থাক্ মনে মনে সকল বিষয়ে একটা আড়ষ্টতা আছে বৈ কি। জাহাজখানা নোঙর ক'রে রেঙ্গুনের ঘাটে নামতে প্রায় বেলা দশটা বাজলো। আমরা আঁচ পেলুম আশপাশে পুলিশ পাহারা আছে, তা'রা নাকি প্রত্যেক যাত্রীর ওপর কড়া নজর রাখে। বলা বাহুল্য পুলিশের গন্ধ পেলেই আত্মগোপন করতে ইচ্ছে করে। আমরা তা'র জন্য প্রস্তুত ছিলুম।

শোনা গেল, জাহাজ ঘাটায় নামবার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে কোথায় যেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে। যারা ইতর যাত্রী, তাদের সারবন্দী ক'রে নেওয়া হোলো, আমাদের চলতে হোলো তাদেরই সঙ্গে। একটা শব্দ শোনা গেল, কোরেণ্টাইন্! কানাকানিতে জানা গেল, সেখানে আমাদের আটক রাখবে। কেন রাখবে, কোন্ অধিকারে, কে আটকাবে আমাদের,—এসব বিচার করার আগে আমি চোখ টিপলুম রবিকে, রবি চোখ টিপলো আমাকে। সুতরাং আমরা সুযোগ খুঁজছিলুম। আমরা ভয়ে ভয়ে সাহসী হয়েছি।

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটায় আমরা দুজন দুদিক থেকে যে চওড়া পথটায় এসে পৌছলুম, সেটার নাম স্পার্ক ষ্ট্রীট। অপরিচিত দেশ, সাগরের পার, অজানা পথ। দুজনে দুটো পুঁটলি আর চামড়ার ব্যাগ নিয়ে হেঁটে চললুম। গোড়া থেকে বুঝতে

পেরেছি কাঠ আর চালের কারবার এখানে প্রচুর, তা'র চেয়ে প্রচুর সংখ্যক সুসজ্জিত পানের দোকান। পুরুষরা বেড়াচ্ছে সিল্কের লুঙ্গি ছোট সুন্দর জামা আর রঙীন ছাতা হাতে নিয়ে, আর মেয়েরা পথের ধারে বড় বড় লম্বা লম্বা চুরুট বিক্রি করতে বসেছে। এক হাত লম্বা একটি চুরুটের দাম এক পয়সা।

আমরা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছি, চীন জাপান আর আমেরিকার কথা ভেবেছি, কিন্তু থাকার জায়গা কোথাও পাবো কিনা সেকথা ভাবিনি। হোটেল আর বোর্ডিংয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, আমাদের কাছে অবশিষ্ট যা টাকাকড়ি আছে তা'তে হাত খরচ বাদ দিয়ে দিন তিনেক চলতে পারে। সুতরাং সে পথ ত্যাগ ক'রে আমরা সোজা পথ ধরলুম। নামবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার সমস্যাটা যেন ঘোরাল হয়ে এলো। আমাদের ভালোমন্দ সুখদুঃখ আহারবিহারের কথা এতকাল বাড়ির লোকেরা ভেবেছে, আজ থেকে আমাদের নিজেদের সে সব ভাবতে হবে। আমরা নিরুদ্দিষ্টভাবে বহুদূর পথ হেঁটে চললুম। জ্যৈষ্ঠের শেষ হলেও কলকাতার মতন গরম এখানে নেই, অনেকটা যেন বসন্তকাল।

রবি সিগারেট খাচ্ছে জীবন সমস্যাটা যে যেন গায়েই মাখতে চাইছে না। একটু বিমর্ষ একটু চিন্তান্বিত। একসময় বললুম, তুই কি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিস?

নার্ভাস!—রবি বললে, মোটেই না...এই ব'লে সে ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলো। অর্থাৎ সে ভাবছে আমি কি প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করি, আর অমনি ভাবছি সে কি ভাবে আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই, আমরা কেউ কারো কাছে হার মানবো না। আমরা জীবন দেখতে বেরিয়েছি!

ষ্টীমার থেকে নামবার সময় জাহাজে ইঞ্জিনিয়র মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে আর রবির দেখা হয় নি; রামধনুর মতন তিনি মিলিয়ে গেছেন। বরং হিতেনবাবুদের কাছে জানতে পারা গিয়েছিল, এখানে কোথায় এক দুর্গা বাড়ি আছে, সেখানে নাকি বাঙালীরা জায়গা পায়। পথে মাদ্রাজী ও দক্ষিণী কুলির সংখ্যা প্রচুর। তাদেরই একজনকে প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সন্তোষজনক জবাব পেলুম না। আশপাশে দু'একটা খাবারের দোকান দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, ক্ষিধেও পেয়েছে—কিন্তু রবির মুখের চেহারা দেখে আহারাদির কথাটা বলতে সাহস নেই। চলেছি তা'র পিছু পিছু আমাকে সে যেন হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশে। ছোট বেলা দুষ্ট বিড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে পথ দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতুম, কতদূরে নিয়ে যাচ্ছি এ প্রশ্ন করবার অধিকার

বিড়ালের ছিল না। আমার গলায় এখন দড়ি নেই বটে, তবে প্রশ্ন করারও অধিকার নেই। যে-লোকটা দুটাকা সম্বল ক'রে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছে, পরের মুখ চাওয়া ছাড়া তা'র গতি কোথায়? সুতরাং আমার অভিভাবকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেজাজ-মর্জি এবং খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে। আমার নিজের কোনও স্বকীয়তা নেই।

রবি সকল পথই আমাকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চিনিয়ে দিল, অর্থাৎ সে যে নিজে পথ হারিয়ে গণ্ডগোল ক'রে আমাকে অনর্থক হায়রাণ করলো, একথা তাকে বলবার যো নেই; তা'র অক্ষমতা অথবা নির্বুদ্ধিতা তাকে ধরিয়ে দিলে তা'র প্রেস্‌টিজের হানি হবে,—আমাকে ধমক খেয়ে মরতে হবে। ঘণ্টা দুই পরে আমরা সেই পুরনো স্পার্ক স্ট্রীটেই আবার কেমন ক'রে যেন ছটকে এসে পড়লুম। রবি বললে, এবার চিনলি ত? দয়া ক'রে বিদেশে যেন পথ হারিয়ো না। আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকো।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সে বললে, একটি কথা তোমার কানে কানে বলি,—ভদ্রলোকদের খিদে যখন তখন পায় না! তোমাকে নিয়ে আর পারি নে,—এসো।

চায়ের দোকান খুঁজতে গিয়ে আমরা পথের ওপরেই দুর্গা বাড়ির মন্দিরটি পেয়ে গেলাম। অনেককালের কথা হোলো, পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে না থাকা এখন আর অপরাধ নয়। তবে মনে আছে, মন্দিরটি নতুন নয়। ভিতরে একটি প্রতিমা রয়েছে, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত; মূল মন্দিরের সামনের ভাগটায় নাটমন্দির। আমরা একপাশে আমাদের পুরনো দু জোড়া জুতো রেখে নাটমন্দিরে উঠে এলাম। রবি বললে, আমি লোকের কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করতে পারব না, তুমি বলো। ওই যে লোকটা—

একটি খর্বকায় কৃশ শক্ককেশ বৃদ্ধকে পাওয়া গেল। তিনিই মন্দিরের সেবাইত। লোকটির বয়স পঞ্চান্ন থেকে পঁচাশির মধ্যে কিছু একটা হবে। মন্দিরের সংলগ্ন ছোট একটি ঘরে তাঁর বাস, সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন গামছা প'রে।

আমি সামনে এসে দাঁড়িয়ে নত দেহে একটি সাষ্টাঙ্গ নমস্কার জ্ঞাপন ক'রে হাসি-হাসি মুখে তাঁর দিকে তাকালুম। আমার নমস্কারের ভঙ্গীতে কোনও বিদ্রূপ অথবা কৃত্রিমতা মেশানো ছিল কিনা আমার এখন মনে নেই, তবে লোকটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বিড় বিড় ক'রে বললে। তবে কি লোকটা বাঙালী

নয়? আমি সাহস ক'রে বললুম, যদি এবেলাকার মতন একটু থাকার জায়গা পাই—হেঁ হেঁ······আমরা নতুন এসেছি কিনা—

লোকটি অতি দ্রুত ভাষায় কি যেন বললে। সেটা তিরস্কার, কি গালমন্দ, কি হিতোপদেশ, কিম্বা ভালোবাসার কথা,—কিছুই বুঝতে পারা গেল না। আমরা চ'লে যাবো, কিম্বা দাঁড়াবো, কিম্বা লোকটির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করবো,—এসব কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দুর্গাঠাকরুণটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি কোন দেশী তবে? কী ভাষা ওর? আমরা তখন বরং গ্রীক অথবা হিব্রুও বুঝতে পারি,—কিন্তু ও লোকটি একেবারেই দুর্বোধ্য।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে লোকটির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আমি প্রতিমার দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে একটা নমস্কার করলুম। কিন্তু তা'র এমন ফল যে ফলবে তা আগে জানি নি। লোকটা হাসলো। পৃথিবীর যে কোনও ভাষাই দুর্বোধ্য হ'তে পারে, কিন্তু হাসির একটি নিজস্ব ভাষা আছে,—যে হাসে তাকে একটি মুহূর্তেই পরিচিত ক'রে তোলে। লোকটি হাসলো,—কী কালো আর শ্যাওলাপড়া পুরণো দাঁতের পাটি, চোখ দুটো খানিকটা ট্যারা, মুখে আমাদের দুজনের মতনই বসন্তের খানা খোন্দল,—চোখে-চিবুকে-চোয়ালে কেমন একটা চাতুরীর ভাব। লোকটা হাসতেই আমরা যেন কতকটা আস্কারা পেয়ে গেলুম।

এমন সময় জনৈক দক্ষিণী উড়িয়া এসে আমাদের বাঁচালো। সে জানালো, আমরা এবেলাকার মতন জায়গা পেয়েছি, তবে আবার বোকার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন? কিন্তু কবিরাজ মশাই যখনই যেতে বলবেন, তখনই চ'লে যেতে হবে।

প্রশ্ন করলুম, কবিরাজ মহাশয় কোন্ জাতি?

সে বললে, বাঙালী!—

বাঙালী! রবির পেটের ভিতর থেকে হাসি ফেনায়িত হয়ে উঠলো। আমি কঠিন চক্ষে ইঙ্গিতে তা'কে সতর্ক ক'রে দিলুম।

উড়িয়া বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালী! ওঁর বাড়ি চাটুর্গাঁ।

মন্দিরের আবর্জনা সন্ধান ক'রে একখানা ছেঁড়া তালপাতার চাটাই পাওয়া গেল। সেইটি এনে একপাশে পেতে আমরা আমাদের সংসার রচনা করলুম। ব্যাগ খোলা হোলো, পুঁটলি এলানো হোলো। আমরা ইচ্ছাপূর্বক এমন পোষাকপরিচ্ছদ এনেছিলুম যে, সবগুলো চুরি গেলেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করতুম না—একটু অসুবিধা হোতো

এই মাত্র। কিন্তু সর্বাগ্রে আমাদের দরকার সাবান আর স্নান। রাস্তার কল আছে সামনে, সাবান আছে দোকানে, খাবার আছে হোটেলে। রবি কেমন ক'রে রাস্তার কলের তলায় ব'সে স্নান করবে, কেমন করে জামাকাপড়ে সাবান দেবে, কোথায় একটা ঘটি সংগ্রহ করা হবে, তা'র জুতোটা ঝেড়ে মুছে রং ক'রে দেবে কে, কাপড় শুকোতে দেওয়া হবে কোথায়, কোথায় আমরা একটু গড়িয়ে নেবো,—ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায় আন্দোলিত হয়ে এক সময় রবি ব'লে উঠলো, ন্যাস্‌টি! এরকম জানলে তোর সঙ্গে আমি কিছুছেই আসতুম না। দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি জাপান যাবার চেষ্টা করো।

বললুম, স্নানাহার ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে ভাবা যাবে।

রবি বললে, এতলোকের মাঝখানে স্নানাহার! আমি কখনো লোকের সামনে গা খুলি নি, তা জানিস? সকলে আমাদের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে!

তা থাকুক, সাবান কিনে কাপড় জামা কেচে স্নান ক'রে আমি যখন সুস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালুম এবং একখণ্ড ভাঙা চিরুণী আর টিনের আয়না দেখে যখন মাথা আঁচড়ে নব্য বাবু সাজলুম রবি তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঈর্ষান্বিত ভাবে বললে তাহলে তুই বলছিস আমাকেও মান খোয়াতে হবে? কিন্তু আমার কালচার?

বললুম স্নান না করলে যদি কাল্‌চার বাঁচে ত বাঁচুক।

সোয়াইন!—ব'লে রবি উঠে দাঁড়ালো গা ঝাড়া দিয়ে। বললে, দয়া ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো।

মনে আছে, ঘণ্টাখানেক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। রবি এর মধ্যে নিজের জুতো পরিষ্কার করেছে, জামাকাপড় থেকে বমি আর তরকারির দাগ তুলেছে সাবান দিয়ে, স্নান করেছে রাস্তার কলে, দাঁত মেজেছে পথের ধুলো দিয়ে, দুজনের কাপড়জামা মেলে দিয়েছে নাটমন্দিরের বারান্দার রেলিংয়ে,—তারপর আমাকে হাসিমুখে ডাকছে, গেট্ রেডি!

চেয়ে দেখি, মাথাটি আঁচড়েছে সে দিব্য! বললে, ক্ষিধেটি নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই, চলো বেরিয়ে পড়ি। পেটের মধ্যে আগুনের ডেলা পাকাচ্ছে! কিন্তু যাবার আগে বলি—সাবধান, রাক্ষসের মতন গিলো না। মনে রেখো তোমার এক টাকা পৌনে দশ আনার আর কিছু নেই!

চাটাইখানা পাতা রইলো, কাপড়-জামাগুলো সেখানে শুকোতে লাগলো—আমরা কেবল ব্যাগটা কোনও প্রকারে কবিরাজ মশাইয়ের ঘরে জিম্মা রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

রেঙ্গুনে আমাদের জীবনযাত্রা শুরু।—

হাইকোর্ট সামনেই। ত'ার তিনটি চূড়া—আর কিছু মনে নেই। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু খুঁজে বার করে দেখার জন্য একটা জ্ঞান-প্রবণতার দরকার—আমাদের সে-বয়স নয়। আমরা তখন দেখতে শিখেছি জনতা, হাটের পথ, ডাকঘর, হোটেল—এই সব। প্রথম চোখে পড়ে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা,—এটা কলকাতায় তখনও চোখে পড়ে না। গৃহস্থ মেয়েরা একা পথ হাঁটে, দোকান বাজার করে, জিনিস বিক্রি করে, পুরুষদের সঙ্গে সমানে দাঁড়িয়ে কথা কয়, হাসে, বিবাদ বিতর্ক করে—এটা আমাদের চোখে নতুন। অভিজাত পল্লী আমরা দেখি নি,—নদীর ধারে সান্ধ্য ভ্রমণ, আমোদপ্রমোদ, উদ্যান কিম্বা বাগান ভ্রমণ, রঙ্গজগৎ, বর্মী সমাজের জীবনযাত্রা,—এ সব কিছুই আমরা দেখি নি। আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি জনতার ভীড়ে, ট্রাম রাস্তায়, কাঠগোলা আর কারখানার আশেপাশে, কুলী কামিনের বস্তির আনাচে কানাচে। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়িয়েছি ৩০ নং আর ৪০ নং রাস্তায়, স্ট্রাণ্ড রোডে, ক্রকিং স্ট্রীটে, ইরাবতীর তীরে। পথে পথে খেয়েছি রুটি-মালাই, মাংস, ফল, চা—কোনও কোনও দিন ভাত অথবা 'নাপ্পি'! নাপ্পির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি,—কেউ বলে, আরসোলা, পচা ইঁদুর, পচা ব্যাঙ—এ সব ছাড়া নাপ্পি হয় না! আমরা যা খেলুন,—তা'তে এ সব পাই নি। সুখাদ্য খাবার পরে জেনেছি সেটা নাপ্পি। বমি আসে নি, বিকার দেখা দেয় নি—দিব্যি সুস্থ ছিলাম। চীনারা দুই হাতে দুটো কাঠি ধ'রে ভাত লুফে খায়—এই দৃশ্যটি আমরা হোটেলে ব'সে দেখতুম। হোটেলে কোনও জাতি বিচার নেই। চীনা, জাপানী, বর্মি, দক্ষিণী ইত্যাদিতে রেঙ্গুন ঠাসা। এদের পরেই মুসলমানের সংখ্যা বেশী ব'লে মনে হয়েছিল। হিন্দু বাঙালী ছিল ফোড়নের মতো—খুঁজে বার করতে হয়।

প্রথম দুদিন আমরা পরিশ্রান্ত পশুর মত ক্লান্ত হয়ে এসে, নাটমন্দিরের চাটাইয়ের উপর রাত কাটালুম। বালিশ বিছানা কিছু নেই, ধুলো বালি ঝাড়া নেই—আমরা মাথার তলায় হাত রেখে নিদ্রা দিলুম। তৃতীয় দিন বৃষ্টি এলো সন্ধ্যায়, ভিজতে ভিজতে আমরা ফিরলুম। এখানে আর থাকার হুকুম নেই, কবিরাজ মশাই আগেই নোটিশ দিয়েছেন,—সুতরাং সন্ধ্যার পর আমরা সামনের রাস্তায় পায়চারি ক'রে

চোরের মতন নাটমন্দিরে এসে ঢুকি, আর চাটাইখানার ওপর মড়ার মতন পড়ে থাকি। আজ সমস্ত রাত বৃষ্টি হচ্ছে, ভিজা বাতাসে খোলা নাটমন্দিরে শীত ধরছে, পিঠের তলায় চাটাই ঠাণ্ডা, সেদিন আহারাদিরও তেমন সুবিধা হয় নি। আকাশ যেন আজ ভেঙে পড়েছে আমাদেরই জন্যে।

আগে আমরা জানতুম না, বৃষ্টির সময় নাটমন্দিরের ছাদ চুঁইয়ে হু হু ক'রে জল পড়ে, অথবা তার দেয়ালে আছে ফাটল। এদিকে বৃষ্টির ছাট্ আসছে আমাদের গায়ে, আর মেঝের উপর দিয়ে জলধারা ছুটছে। জলের সঙ্গে আমার চিরদিনের আড়ি,—সুতরাং এক সময়ে সন্দেহবশে উঠে দেশলাই জ্বেলে দেখি, হা হতোস্মি! আমরা চাটাই পেতেছি নর্দমার দিকটায় এবং ছাদ ও ফাটল চোঁয়ানো জল সমস্তটাই আমাদের তালপাতার চাটাইয়ের তলা দিয়ে নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে!

আমি বললুম, উপায়?—এই, ওঠ,—

রবি ঘুমের ঘোরে বিরক্ত হয়ে বললে, পিঠের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে শক্ত করে রাখ, তা হ'লে আর ঠাণ্ডা লাগবে না।

আমি জেগে ব'সে রইলুম,—কতক্ষণে রাত পোয়াবে। কিন্তু দিদিমা বলতেন, দুঃখের রাত পোয়াতে চায় না! ভেবে দেখলুম, তখন রাত বারোটাও বাজে নি। এখনো অনেক দেরি। দেখতে দেখতে এক সময় রবি উঠে বসলো। বিমূঢ়ের মতন খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে বললে, ন্যাস্‌টি!—ন্যাস্‌টি শব্দটা সে কোথায় যেন শিখে এসেছে।

বললুম, শোবো কোথায়?

রবি মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। বললে, উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো, আর এক পা রাখারও জায়গা নেই!

বললুম, যদি নিমোনিয়া হয় কে দেখবে?

রবি বললে, ভালোই হয়। তোমার পায়ে দড়ি বেঁধে ইরাবতীতে ভাসিয়ে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো।—এঃ আমার এক পাটি জুতো যে গেল জলে ডুবে?—ইস, কাপড়খানা সপসপ করছে!

আমরা উঠে বারান্দার পাড়ের উপর সে-রাত্রির মতন বসে রইলুম। রবি এক সময় বললে, রাত জেগে বসে থাকলে ক্ষিধে পায়—গত বুধবারে এমন সময় শুয়ে আছি খাটের গদিতে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, সবুজ আলোটা জলছে···

নিজের বাড়ির কথা সে যখন বললে, তখন আমার নিজের বাড়ির ছবিটিও আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। নতি সেনের গলিতে তেলের আলোটা জ্বলছে টিপটিপ করে, পাড়ার কুকুরটা একটু আগে ডেকে গেছে, পাহারাওয়ালা তখনও দূরে হেঁকে চলেছে,—আমার ঘরটি বোধ করি শূন্য! পূবদিকে সাহাদের বাগানের আস্তাবলে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ হচ্ছে, ওদিকের নারকেল গাছে চিলের ডানার শব্দ, বাড়ির আনাচে বিড়ালের ডাক,—আর মা এতক্ষণ বোধ করি জেগে। খড়্গপুরে ফুটবল ম্যাচ খেলার নাম করে ছয়দিন আগে বেরিয়ে পড়েছি,—সুতরাং দুটো জাগ্রত চোখ সংশয় আর উৎকণ্ঠায় ভরে রয়েছে। একটি একটি ভারাক্রান্ত দিন তাঁর চলেছে, কিন্তু তাঁর সন্তান ফিরে এলো না। তাঁর আর সব ছেলেমেয়ে সংসারী, সকলে গৃহধর্মাশ্রয়ী,—কেবল সর্বশেষ সন্তান ঘর ছাড়া, পলাতক, উচ্ছৃঙ্খল, গৃহবিরাগী। ছেলেটি চলেছে অন্ধের মতো নিয়তির দুশ্ছেদ্য আকর্ষণে, আর মা ছুটেছে তার পিছু পিছু অন্ধকারে, দুর্গমে, অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রে।

বৃষ্টির ছম্‌ছমে অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে এক সময় আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে রবির আরো কাছে সরে এসে বসলুম। আর যাই হোক, এবার আমি নাগালের বাইরে।

এমন সময় আকাশ ডেকে উঠলো গুরু গুরু বজ্রগর্জনে, বিদ্যুতের তরবারিখানা ঝলক দিয়ে উঠলো জাহাজ ঘাটার ওদিকে। রবি বললে, ওদিকে কি দেখছিস রে?

কি যেন উত্তর দিলুম মৃদুস্বরে।

কুলীগিরি করতে রবি কিছুতেই রাজী হোলো না। মিউনিসিপ্যালিটি আফিসে গেলে কুলীদের ঠিকাদার হয়ত হতে পারতুম,—সুবিধাও পাওয়া গেল, কিন্তু রবি বেঁকে বসলো। ট্রাম কোম্পানীর আপিসে দিন দুই যাতায়াত করলুম, কিন্তু কণ্ডাকটরের একটি কাজও খালি নেই। গেলুম কাঠের গোলায় আর ধানের কলে—যদি কিছু একটা জোটে। তারপর বড় পোষ্ট আফিসে,—শুনেছিলুম সেখানে বাঙালীর কর্তৃত্ব,—কিন্তু সেখানে কাজ পেতে গেলে বহুদিন তদ্বির-তদারক আর বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। অথচ আমাদের দরকার অবিলম্বে কিছু নগদ টাকা। আমরা বর্মা রেলওয়ে আপিসে আনাগোনা আরম্ভ করে দিলুম। একই দিনে আমরা আট-দশ জায়গায় দরখাস্ত নিয়ে নিজেরাই দেখাশুনা করি—করতে করতে বেলা পাঁচটা বেজে যায়; আফিসের ছুটির সময় সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকি, বড়বাবুরা বেরিয়ে এলে

নমস্কার ক'রে তাঁদের নজরে পড়তে চাই। শেষ অবধি সবাই চলে গেলে আমরা নিরুপায়ের মতন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি এবং ঝাড়ুদাররা আমাদের শূন্যপুরী থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়।

আমাদের কচি কচি দাড়ি-গোঁফ উঠেছে। রবি আবদার ধরলো সে কামাবে কিন্তু আমিই কোন্ কম? সিগারেট খেতে শিখেছি, এখন শুধু জুলপিটা না কামিয়ে দাড়ি-গোঁফে ক্ষুর বুলোবার অধিকার নিশ্চয়ই হয়েছে। সুতরাং মাঝে মাঝে দুজনের দু-আনা খরচ হয়। চাকরি পেতে দেরী হচ্ছে, জাপান যেতে আরো দেরী হচ্ছে. সুতরাং আমরা একবেলা আহার ধরলুম। মোট অবশিষ্ট টাকার পরিমাণটা পাছে জানতে পারি, পাছে জেনে ভয় পাই, এজন্য সহসা দুজনে আর হিসাব নিকাশ করিনে। ধূমপানের খরচ আমাদের দৈনিক চার পয়সায় নেমে এসেছে। এখনও অন্ধকার দেখছিনে, কারণ এখনও আশা ছাড়িনি।

একদিন আমরা রেঙ্গুনের বড় প্যাগোডা দেখতে গেলাম। নাম 'ফয়া'—'বড় ফয়া'। এক ত্রিকোণ পথের ধারে এই বিশাল বৌদ্ধমন্দির,—এরই স্বর্ণচূড়া দেখা যায় জাহাজ থেকে। বাইরে মন্দিরের চারিদিকে প্রকাণ্ড বাজার আর দোকানপত্র। শহরের এইটি মস্ত কেন্দ্র। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম, যেন রাজবাড়িতে এলুম। ভিতরটা একটু আবছায়া অন্ধকার,—প্রায় সমস্তটাই কাঠের কাজ। বড় বড় কাঠের থাম, বিচিত্র ছবি, বিচিত্রতর কারুকার্য। বড় বড় ঘৃত-দীপ জ্বলছে ধূপের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছে। কত বারান্দা, কত অলিন্দ, কত পথ কতদিকে! ভিতরটি শান্ত, অতি পবিত্র পরিবেশ। আমরা বিশাল বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম। সিঁড়ি যে কত, কত যে উঁচু, কত যে দীর্ঘ—অথচ কি পরিচ্ছন্ন সুন্দর। সিঁড়ির দুইধারে ফুলের সভা। ফুলওয়ালীরা বসেছে ফুলের ডালা সাজিয়ে। ফুল না নেওয়া অসভ্যতা, ফুল ছাড়া ভগবান বুদ্ধদেবকে আর কিছু দেবার নেই,—কিন্তু কোন্ ফুলওয়ালীর কাছে ফুল কিনবো? সবাই যে সুশ্রী, সকলের মুখেই যে মধুর হাসির ছবি! কা'র ফুলের বেশী সুগন্ধ।

দূরের থেকেই আমি মনে মনে একটিকে বেছে নিয়েছি, ওর কাছেই আমার ফুল কিনতে হবে। কিন্তু কাছাকাছি এসে জানলুম, রবির পক্ষপাতিত্ব আমরটিরই ওপর। মেয়েটি হাসছে, বুঝতে পেরেছে আমাদের দ্বন্দ্ব, আমাদের পক্ষপাতিত্ব। আমি স'রে দাঁড়ালুম। রবি প্রশ্ন করলো, কোন্ ফুল ভালো?

মেয়েটি কি যেন বর্মিভাষায় বললে, তার ভাষা বুঝলুম না। শুধু হাসি, কুলকুলে হাসি। আমরা নবাগত, ভিন্‌দেশী—আমাদের রং ফর্সা নয়, আমরা তার ভাষা বুঝিনে আমরা ফুলের সভায় দাঁড়িয়ে নির্বোধের মতো ফুলের ভালো-মন্দ বিচার করি,—মেয়েটি হেসেই অস্থির। মায়ের কাছে শিখেছি, মেয়েছেলের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে নেই, কারণ মেয়েরা নাকি অপমান বোধ করে। দিদিমা বলেন, মেয়েদের যেখানে অপমান, লক্ষ্মী সেখানে চঞ্চলা। সুতরাং হাস্যমুখীর দিক থেকে যথাসম্ভব মুখ ফিরিয়ে আমি তার ফুলের ডালার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমাদের এই অনাবশ্যক সময়টুকু থম্‌কে দাঁড়ানো দেখে অন্য লোকরা কি ভাববে মনে ক'রে ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। খাঁদু, পুঁটু, মিণ্টু—আমার ছোটবেলাকার খেলুনি অনেককে মনে পড়ে, এমন কি মহাকালী পাঠশালার কোনো কোনো মেয়ে আমার বোনেদের সঙ্গে খেলা করতে আসতো—তাদেরও মনে পড়ে। কিন্তু হাসিমুখে বাঁকা চোখে কোনো তরুণী মধুরভঙ্গীতে তাকিয়ে দুটো কথা বলেছে,—এ একেবারে নতুন। মনে হলো, এই পরদেশিনী আমার মনের কোথায় কি যেন একটা ছুঁইয়ে দিল,—সমস্তক্ষণ রি রি করতে লাগলো।

রবি বললে, তোর আর কিছু কিনতে হবে না, আমার থেকেই নিস।—এই ব'লে সে ফুলের গোছা হাতে নিয়ে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে মেয়েটির হাতে দিল।

দাম হয়েছিল দু'আনা, সুতরাং মেয়েটি সিকি রেখে বাকি দু'আনা তুলে রবির হাতে দিতে চাইল। রবি একবার আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে হাত সরিয়ে নিল, তারপর বললে, নেই নেই, ও দু-আনা তুম লে লেও।—এই বলে রবি চলে যাবার চেষ্টা করলো।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো এবং তখনই দু-আনা পয়সা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল রবির পথের ওপরে। দৃশ্যটা অপমানজনক মনে করে আমি হন হন করে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু রবি সে-মেয়েটির মুখের কাঠিন্য লক্ষ্য করে পয়সা দু-আনা তুলে নিয়ে আমার পিছু পিছু চললো। সমস্ত ব্যাপারটা অতিশয় লজ্জার সঙ্গে হজম করতে হোলো।

দেব-দর্শনের পর ফিরবার পথে আর মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার সাহস করিনি, কিন্তু মেয়েটি যে রবির দিকে তাকিয়ে তার পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে হাসাহাসি

করছিল, এটি উপলব্ধি করেছিলুম। সে-হাসি যেন পিছন থেকে ছুরির ফলার মতে গায়ে বিঁধছে।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, পথে এসেও সহজ হতে পারিনি। খানিকটা ক্ষোভ জমেছিল রবির প্রতি, কিন্তু পাছে সেটা প্রকাশ পায়, এজন্য চুপ করে রইলুম পুরুষের আচরণে মেয়েরা কোথাও অসম্মান বোধ করে এও যেমন আমি সহ্য করতে পারতুম না, তেমনি মেয়েরা কোথাও মাথা তুলে আত্মস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে—এইটি কোথাও দেখলেই আমি যেন খুসী হতুম। রাণী লক্ষ্মীবাইকে কি যে ভালো-বাসতুম ছোটবেলা! কেন যে কাঁদতুম প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্যে, কেন যে উৎসাহিত আর উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারী করতুম দ্রৌপদীর এলোচুলের দিকে তাকিয়ে আর কেনই বা সীতার পদে পদে আত্মসমর্পণ আর সহিষ্ণুতা দেখে নিষ্ফল ক্ষোভে কাঁদতুম আড়ালে আড়ালে। রবির প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলুম।

সে-রাত্রে রবি আমাকে বলছিল, তুই কেন তখন বারণ করলি নে?

বললুম, তুই দান করবি দু-আনা তোর নিজের পয়সা। আমি বারণ করবো—আমার ঘাড়ে কটা মাথা?

রবি কিছুক্ষণ সিগারেট টানলো। তাপর বললে, কাল দয়া ক'রে একটি কাজ করো, আমার হয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো।

পলকের জন্য আমার প্রাণের মধ্যে উৎসাহ জলে উঠেছিল রবির প্রস্তাবে, কিন্তু তখনই বললুম, না, আমি পারবো না।

কেন পারবিনে শুনি? ও আমার dream-girl, তা জানিস?

জানলুম।

কিছুক্ষণ অবধি রবি চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো। তারপর সিগারেটের শেষাংশটা ফেলে দিয়ে এপাশ ফিরে আমার গলা জড়িয়ে বললে, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস; ইচ্ছে হচ্ছে ওর দু'পা জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে আসি।

বললুম, অপরাধের চেয়ে প্রায়শ্চিত্তটা ঘোরালো মনে হচ্ছে।

রবি হেসে উঠলো। বললে, আমি রেঙ্গুন ছেড়ে এখন কোথাও যাবো না···বর্মি-ভাষা শিখবো।

দিন দুই পরে আমাদের বেকারবৃত্তির এক ফাঁকে আবার আমরা বড়-ফয়া দেখতে গেলুম। উদ্দেশ্য দেবদর্শন মোটেই নয়। আজ বাইরে থেকেই ফুল কিনেছি। রবি

চলেছে আমার পিছু পিছু। আমরা কোনোদিকেই মুখ ফেরাচ্ছিনে, তবে অপাঙ্গ লক্ষ্যটা আছে সেই মেয়েটির উদ্দেশে। কিন্তু সেদিন সে-মেয়েটিকে আর দেখতে পেলুম না। দেখতে পেলে কি করতুম, আবার ফুল কিনতুম কি না—তা আমরা জানিনে। তবে গত দুই দিন থেকে মেয়েটার সেই মুখ-চোখ, হাসি আর ভাবভঙ্গী আমাদের যেন পেয়ে বসেছিল। শুধু একবার তাকে দেখলেই আমরা তৃপ্তি পেতুম। দেখতে না পেয়ে নিরাশ হলুম বটে, কিন্তু স্বস্তিও পেলুম। আমাদের নেশা কেটে গেল। আমরা বেরিয়ে এলুম পথে। বহুকাল অবধি মেয়েটাকে ভুলতে পারিনি।

পৃথিবীর চেহারা দেখতে পাচ্ছি নিষ্ঠুর। শুনতে পাওয়া যেতো, রেঙ্গুনে এলেই একটা যা হোক্ কাজ জুটেই যায়, এখানে চাকরিই নাকি মানুষকে খোঁজে। আমরা এই প্রকার বিশ্বাসের ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যপন্থা স্থির করেছিলুম। কিন্তু সেদিন আর নেই, বছর পনেরো আগে অবধি নাকি রেঙ্গুনে এলে ভাগ্য ফিরানো যেতো। অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীর খোঁজ পেলুম, তাঁদের অনেকেই নাকি পালিয়ে এসে এককালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমরাও পালিয়ে এসেছি, কিন্তু সে-যুগ এখন আর নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ এই কয় দিনেই সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

কোথায় চাকরি ?

হাইকোর্টের অলিগলিতে, মোটরের কারখানায়, কাস্টম হাউসে, জাহাজের আপিসে বড় বড় হোটেলে,—আমরা ধর্ণা দিলুম। জঙ্গলের আপিসে হাঁটাহাঁটি করলুম। এখানে এই রেঙ্গুনে ব'সে আমরা উন্নতি করতে চাইনে, আমরা কেবলমাত্র এখানে আহার ও আশ্রয় পাবার একটু সুবিধা পেলেই কতকটা স্থির হ'য়ে ভাবতে পারি, আমরা অতঃপর কী করবো। একমুঠো অন্ন, আনা চারেক হাতখরচ, কোনো বাড়ির সিঁড়ির তলা—অথবা আনাচ-কানাচ—এই হলেই যথেষ্ট। আমরা কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছি চাকরি পাবার জন্য নয়, চাকুরি-প্রাণ সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি আমাদের নয়, অনন্তকাল ধ'রে কেরানীগিরি করার ধৈর্য আমাদের নেই, দাসত্ব আমাদের কাছে ঘৃণ্য, বড়বাবুদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে থাকা আরো ঘৃণ্য,—তবু বর্তমান অবস্থায় বাঁচতে হ'লে, বেঁচে উঠে এখান থেকে পাড়ি দিতে গেলে চাকরি আমাদের অবশ্যই চাই। আমাদের আহারাদির উপর টান পড়েছে। আগে রাস্তায় চলতুম মন্থরগতিতে, এখন হন্ হন্ ক'রে চ'লে যাই—কারণ, একই যাত্রায় আমাদের বহু জায়গায় যেতে হবে।

ইতিমধ্যে জনৈক পুলিসের গোয়েন্দা আমাদের খোঁজ করছিল। দিনে বা'র দুই সেই লোকটি আমাদের জন্য দুর্গাবাড়িতে আসে, কবিরাজের কাছে সন্ধান নেয়—আবার চ'লে যায়। আমরা লোকটিকে এক পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি। লোকটি বাঙালী ভদ্রলোক, বয়সে প্রবীণ। ভালো গোয়েন্দা প্রায়ই বাঙালী হয়,—কারণ, বাঙালী নাকি চতুর, মস্তিষ্কজীবী। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বড় বড় গোয়েন্দারা বাঙালী। অপরাধীদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আর গতিবিধি বাঙালী মস্তিষ্কই নাকি বেশি বোঝে। এটি বাঙালীদের পক্ষে কলঙ্ক অথবা গৌরব তা বুঝবার বয়স তখনও আমাদের হয়নি। যাই হোক, গোয়েন্দার আনাগোনায় ভীত হয়ে কবিরাজ মশাই ব'লে দিয়েছেন, নাটমন্দিরে আর আমাদের থাকা হবে না। আমাদের অন্য কোথাও আশ্রয় দেখে নিতে হবে।

কিন্তু আশ্রয় কোথায় ?

অনেক কষ্টে আমরা একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান খুঁজে বা'র করলুম। সেটি একটি গান-বাজনা আর মেলামেশার কেন্দ্র। নাম—'আর্য সঙ্গীতালয়'। সেখানে কনসার্ট বাজে, জলসা হয়, নাটকের মহলা দেয়। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথম দৃষ্টিতেই দু'চারজন ভদ্রলোক আমাদের চিনে নিলেন, আমরা পলাতক। বললেন, খোঁজখবর আগে থেকে না নিয়ে এমনভাবে চ'লে আসা আমাদের পক্ষে ভালো হয়নি। এখানে আজকাল চাকুরি পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সুবিধে কিছু হবে কিনা বলা কঠিন।

আমাদের উদ্দীপনা এক ফুঁয়ে নিবে গেল। আমরা সম্পূর্ণ ভিতরে ঢুকে আসরের মাঝখানে বসতে সাহস করলুম না,—আমাদের কাপড়চোপড় এবং চেহারার বর্তমান অবস্থা তার উপযোগীও নয়,—আমরা ঠাঁই নিলুম দরজার কাছে, যেখানে সবাই জুতো ছেড়ে ভিতরে যায়। মিঃ দাস নামক এক ভদ্রলোককেই শুধু দেখলুম, তিনি আমাদের প্রতি কিছু প্রসন্ন এবং দরদী। ভিতরে আলাপ চলছে কোন বর্মীনারীর দুর্নীতির কাহিনী এবং কোন্ সম্ভ্রান্ত বাঙালী যুবকের মদ্যপানের ইতিবৃত্ত। আমরা আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলুম। ওপাশে ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশীর সঙ্গে তবলা চলছে। তবলা চললে রবি তাল না দিয়ে থাকতে পারে না। এখানকার এই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ব'সেও সে তাল দিতে লাগলো। তাকে প্রায়ই দেখেছি বইয়ের মলাট বাজিয়ে, কিংবা পার্শ্ববর্তী

বন্ধুর পিঠ থাবড়ে, কিংবা মেঝের উপর টোক্কা মেরে তবলার তাল দিতে। তাদের কলুটোলার বাড়িতে নাকি চিরদিন বড় বড় ওস্তাদ এসে কালোয়াতি গান গাইতো। কা'কে কালোয়াতি বলে আমি জানিনে, তবে কালোয়াতি শব্দটা রবির কাছেই আমি প্রথম শিখি। তা'র সঙ্গে এক আধবার কোনো কোনো গানের আসরে গেছি,—সেখানে কত্তলু খাঁ আর তিনকড়ি চম্পটির উচ্চ চীৎকার আর কর্ণপটহ-বিদারক তবলার বাদ্য শুনে যতবার বিমর্ষভাবে থেকেছি, রবি ততবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নেচে নেচে বলেছে; বাহবা, বাহবা কি বোল্, বাহবা কি বোল্!—বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে ব্যঙ্গ করেছে, কিছু বুঝিস্‌নে তুই,—এরই নাম কালোয়াতি! একবার সে আমাকে জেরে ক'রে সেতার বাজানো শেখায়, তারের মেজরাফ্ আমার আঙুলে পরিয়ে সেতারের তারের ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে টুং টাং করায়, আর নিজের মুখে সুর এনে বলে, "যাও, যাও, ফিরে যাও, মন বাঁধা যেখানে! যাও, যাও—"

আর সঙ্গীতালয়ে ব'সে আমাদের ঘোরালো জীবন সমস্যার বিভীষিকা যখন উপলব্ধি করছিলুম, রবি তখন তাল দিয়ে কানে কানে বললে, বাঁশী কেমন শুনচিস? দয়া ক'রে ভীমপলশ্রী গৎটা শিখে রাখো।

মিঃ দাস আমাদের হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সেদিনটা সেই ভাবেই গেল। আমরা সেদিন শিখে এলুম কোনো কোনো ভদ্রবেশী বাঙালীর মুখে অশ্লীল ভাষা।

প্রবল বর্ষা নেমেছে আকাশ ফেটে। নাটমন্দির ছাড়া আর আমাদের কোথাও আশ্রয় নেই। সুতরাং কবিরাজকে লুকিয়ে আমরা নাটমন্দিরেই এসে আশ্রয় নিলুম। সে দুর্যোগে যে গোয়েন্দা মশাই আসবে না, এ আমরা জানতুম। ভিতরে এসে দেখি, আমাদের চাটাইখানা জলে ভাসছে। জিনিসপত্রগুলো আজো কবিরাজ মশাইয়ের কাছে জিম্মা আছে, গোয়েন্দা সেগুলো পরীক্ষাও ক'রে গেছে। কথা আছে, আমরা আমাদের ব্যাগ আর পুঁটুলি কোন সময়ে এসে নিয়ে যাবো। তবে নাটমন্দিরে অবশ্য আর থাকবো না।

ওপাশে একখানা ছোট তক্তা ছিল, সেটি কবিরাজের আসন। আমরা চুপি চুপি সেই তক্তাখানার উপর আশ্রয় নিলুম। কবিরাজ তখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। প্রতিমার ঘরে তালাবন্ধ।

ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলছে। এক ভারতীয়ের দোকানে আমরা কিছু তেলে-ভাজা খাবার খেয়ে এসেছি, তার সঙ্গে এক ঘটি জল। সেগুলো পেটের মধ্যে

ঘুলোচ্ছে। কিন্তু আমরা তখন নেতিয়ে পড়ছি, আর জেগে থাকার সাধ্য ছিল না। তক্তাখানার একটা পায়া ভাঙা। একদিকটা উইপোকার গর্ত। কিন্তু লম্বা চওড়ায় সেখানা আন্দাজ তিন ফুট মাত্র। অর্থাৎ কোনোদিকে শুয়েই পা ছড়াবার উপায় নেই। হাঁটু গুটিয়ে পা দুখানা ঘুমের ঘোরে দাঁড় করিয়ে রাখতেই হবে। কথা রইলো, সকলে ওঠবার আগে আমরা চৌকি ছেড়ে দিয়ে সরে পড়বো। কবিরাজের লাঞ্ছনা আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না।

এর পরেও আমরা দিন দুই আর্য সঙ্গীতালয়ে গেলুম। এতদিন পরে এবার একটু আশান্বিত হয়েছি। জনৈক মিঃ চৌধুরীর শ্বশুর মহাশয় রেল কোম্পানীর আপিসের কোন্ বিভাগের বড়বাবু,—তাঁকে ধরে পড়লে কিছু একটা সুবিধে হতে পারে। চৌধুরী বললেন, তিনি একটু বলেও দিতে পারেন। তাঁর এই অনুগ্রহে আমরা উৎফুল্ল হলুম। ফিরে এসে আমরা খাবারের পয়সা থেকে সাবান কিনলুম, দাড়িগোঁফ কামালুম। আমাদের দুর্যোগের আকাশে ঈষৎ রৌপ্য-রেখা দেখতে পেয়েছি। চাকরি হওয়ামাত্র মাকে জানাবো, দিদিমাকে কাশীতে প্রণামী পাঠাবো। চাকরি হওয়ামাত্র একখানা ধুতি আর একটি জামা কিন্‌বো—জুতো কিনবো পরের মাসে। একবেলা খাবো, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবো। মাস তিনেক পরে মায়ের নামে অন্তত পঁচিশ টাকা পাঠাবো। বছর খানেক অন্তত চাকরি করে কোট প্যাণ্ট কিনবো, একজোড়া মোজা, একটা ফাউণ্টেন, আর বর্মিদের মতন একখানা সিল্কের লুঙ্গি। ভেবে দেখলুম, জীবনের গোড়ায় দুঃখ আর দুর্যোগের ভিত শক্ত না হ'লে ভাগ্যের প্রাসাদ দাঁড়ায় না। আমাদের সমস্যার এতদিনে সমাধান হোলো; অবশ্য এর জন্য বেশ কিছু মূল্য দিতে হোলো বৈকি।—তারপর?—তারপর আবার জাপানের পথে সমুদ্রে সমুদ্রে। সেখান থেকে আমেরিকা তরঙ্গে তরঙ্গে! আঁধার রাত্রি ঘনিয়ে আসবে সাগরদিগন্তে, আবার দেখা দেবে রাঙা প্রভাত! ধ্রুবতারা প্রতিবিম্বিত হবে অকূল কালো জলে,—আমরা চিনে নেবো তাকে অন্ধকার সমুদ্রের বিভীষিকার মধ্যে। আমরা চলেছি দিগ্বিজয়ে, চলেছি জীবন-জোড়া দুর্গম অভিযানে……আমাদের ঘর নেই, বন্ধন নেই, মোহপাশ নেই, আমাদের পথের সীমা নেই। আমরা বার বার বন্দর খুঁজে নেবো, বার বার আমাদের দড়াদড়ি খুলে অকূলের টানে আমাদের জীবনতরী ভাসিয়ে দেবো।

ইতিমধ্যে আমরা একটি বর্মি ছোকরার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। ছেলেটি রোগা, ভালো মানুষ, নিরীহ প্রকৃতির। সে গৃহস্থর ছেলে। ম্যাট্রিক পাস ক'রে সে আমদেরই

মতন একটি চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার ইচ্ছে ছোট বোনকে সে পড়াবে। ছেলেটির নাম মং লা মং। আমি তার সঙ্গে ইয়েস, নো, ভেরিগুড—ইত্যাদি বলি, কিন্তু রবি তার ইংরেজি ভাষাটা ওই ছেলেটার ওপর দিয়ে শানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ছেলেটা থতিয়ে ইংরেজি বলে। যাই হোক, লা মংকে আমরা জানিয়ে রেখেছি, আমরা চাকরি পেলে তাকেও ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করবো। রবি এও ব'লে রেখেছে, আমেরিকা যাবার সময় সে লা মংকে নিজের চাকরিটা দিয়ে যাবে। **After all,** সে চাকরির পরোয়া করে না। মং লা মং আমাদের পাল্লায় পড়ে তার অদূরবর্তী সৌভাগ্যের স্বপ্ন বুনে চলেছে।

কবিরাজ আমাদের দেখলে এবার নিশ্চয় ক্ষেপে উঠবে, সুতরাং আমরা স্নান করা আর কাপড় ছাড়া বাদ দিয়ে এ' কদিন রাস্তায় রাস্তায় খেয়ে বেড়িয়ে এখানে ওখানে পথের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। রেঙ্গুনের রাস্তার কলের জলে কেমন একটা মিঠে স্বাদ, আমাদের অনভ্যস্ত জিহ্বা সেটা অবশ্য এতদিনে মেনে নিয়েছিল। আজ আমরা পথে একপেট জল খেয়ে বীরের গর্বে কবিরাজের নাটমন্দিরে গিয়ে উঠলুম। কবিরাজকে শান্ত করার জন্য উড়িয়াকে ডেকে আমাদের চাকরি পাবার স্থিরতাটা জানিয়ে দিলুম। এও জানিয়ে দিলুম এটা দুর্গাবাড়ি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান—এখানে থাকার অধিকার কিছু আছে আমাদের। তবে যদি তিনি নিতান্তই নারাজ হন আমরা পরোয়াও করি নে। দরকার হলে আমরা স্যার মাং-থি-বা-র বাড়িতে গেস্ট হয়ে থাকবো। স্যার মাং-থি-বা রবির বাবার বন্ধু; রবিরা হলো জগৎপ্রসিদ্ধ কলুটোলার সরকার। রাজপুত্র বনে গিয়ে কাঠুরিয়ার ফুটো চালার নীচে ওঠে বটে, কাঠুরিয়ার অবহেলাও কিছু সহ্য করে। তবে কাঠুরিয়া আর রাজকুমার এক পর্যায়ভুক্ত নয়—এবং রাজপুত্রের আবার সুদিন আসবে, আসতে বাধ্য। তখন যদি মন খুশী থাকে, তবে কাঠুরিয়া কিছু বকশিসও পেয়ে যেতে পারে।

কবিরাজের মুখের ওপর এ সব শুনিয়ে দিয়ে বললুম, দিন ব্যাগটা বার করে দিন।

রবির অনর্গল মিছে কথা আর বাঁকা কথা শুনে কবিরাজ একটু থতিয়ে গিয়েছিল, এবার তার নির্দেশে উড়িয়া লোকটি আমাদের ব্যাগটা বার করে আনলো। আমরা যে সাধারণ রাস্তার লোক নই, একথা লোকটা বুঝতে পেরে অনেকটা হাল ছেড়ে দিল। আমরা বেশ একটু আত্মাভিমানের সঙ্গেই ব্যাগ খুলে আমাদের কাপড়-জামা বার করলুম। রবি ইচ্ছে করে তার 'বায়নকুলারটি' বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার

গুছিয়ে রেখে দিল। আমি আমার কলবিগড়ানো হাতঘড়িটাও বার করে দেখিয়ে আবার রেখে দিলুম। কবিবাজের মুখের ওপর ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করলুম, আমরা ছদ্মবেশী ক্রোড়পতির সন্তান, পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাদের ভয় করে, আমাদের নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে দুর্গাবাড়ির এই সেবাইতের পদটি লোপ পেতে পারে। সুতরাং সাবধান।

মামা বলতেন, পাঞ্জাবী পরে চাকরি করতে গেলে সাহেবরা বিরক্ত হয়, শার্টের ওপর কোর্ট চড়িয়ে গেলে তাদের সুনজর পড়ে। আমার সাবান কাচা মোটা জিনের কোট তখনও ভিজা—কিন্তু ভিজা কোট পরেই আমাকে বেরুতে হোলো। দিদিমা বলতেন দুর্গানাম ক'রে বেরোলে সকল বিঘ্ন কেটে যায়। কিন্তু সোণার দুর্গা আমাদের সব ঘটনারই সাক্ষী, তিনি আমাদের সব কিছুই সকৌতুকে লক্ষ্য করেছেন, ঘটা করে আর তাঁর নাম না নিলেও চলবে।

মাথাটি আঁচড়েছি বেশ চকচকে ক'রে। জামাকাপড় যথাসম্ভব ফিটফাট। ভিজা জুতো জোড়ায় একপ্রকার মেটে-মেটে চাকচিক্য। আমরা যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে বেরোলুম। রবি সম্প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের সেই সরু গলিটার কোন্ বাড়িতে যেন কার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে আনাগোনা করে,—একবার কোথায় যেন বালক বালিকা উৎসবে যোগদান করেছিল,—তার মুখে বোলপুর আর মাঘোৎসবের কথা শুনেছি—সুতরাং নাটমন্দির থেকে বেরোবার সময় দুর্গা প্রতিমাকে সে নমস্কার করে গেল না। আমি বামুনের ছেলে, পূজা-অর্চনা, গঙ্গাস্নান, পাল-পার্বণ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে মানুষ,—এগুলো আমাকে ভূতের মতন পেয়ে থাকে, সুতরাং চট করে সংস্কারমুক্ত হতে বাধে। অথচ রবির কাছে হার মানতেও আমি রাজি নই এবং তোড়জোড় করে প্রতিমা প্রণামেও আমার অশেষ লজ্জা। যারা কালীঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি দেয়, কিংবা ট্রামে চড়ে যাবার সময় ঠনঠনে কালীতলার কাছে এসে চোখ বুজে কাণ মলে হাত জোড় করে, কিম্বা মন্দির দেখলেই সকলের মাঝখানে চোখ বুজে বিড় বিড় করতে থাকে—তাদের দিকে তাকালে আমার হাসি ফেনিয়ে ওঠে। মারোয়াড়ীরা মাছমাংস খায় না, কিন্তু মোহনবাগানকে জেতাবার জন্য কালীঘাটে তারা জোড়া পাঁঠাবলি মানৎ করে, জুয়াড়ীরা ঘোড়দৌড়ের মাঠে টাকা জিতে মদ খায় অথচ জেতবার আগে ভয়ে ভয়ে বৌবাজারের ফিরিঙ্গী কালীর দরজায় মাথা ঠোকে, উকীলরা মিথ্যা সাক্ষ্যকে হাকিমের

দরবারে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে অথচ ট্রামে চড়ে যাবার সময় কালীতলার কাছে ভক্তি ভরে চোখ বোজে—মুখে পান, হাতে ব্রীফ এবং জ্বলন্ত সিগারেট। পোদ্দারের দোকানের মাথায় বসানো থাকে সিঁদুর মাখানো গণেশ ঠাকুর, ভেজাল ঘিওয়ালার জাবদা খাতায় লেখা থাকে—'শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ প্রাসাদাৎ এই কারবার করিতেছি।'

সুতরাং রবিকে লুকিয়ে নিজেকে লুকিয়ে প্রতিমার দিকে কটাক্ষে একবার তাকিয়ে অমনি কি একটা কাজ পলকের মধ্যে সেরে হন হন করে বেরিয়ে পড়লুম। মনে জানি কি একটা যেন সংস্কারের ঋণ শোধ করছি, কিন্তু একেবারে তাচ্ছিল্য করে চলে যেতেও বাধে। এরই নাম ভূত।

আজ বর্ষার পরে সুন্দর রৌদ্রে বেলাটা ভরে আছে। আমাদের প্রাণে অসীম সাহস। জানতে পেরেছি মিঃ চৌধুরী তাঁর শ্বশুর মশাইকে বলে রেখেছেন। আমরা ভবযুক্ত হয়ে রেল কোম্পানীর আপিস বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলুম। বড়বাবু মিঃ চ্যাটার্জির ঘর খুঁজে বার করলুম।

চাপরাশি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। বহুলোক ভিতরে কাজ করছে, সবাই মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকালো। বড়বাবু বসে রয়েছেন ইস্কুলের মাষ্টারের মতন। তাঁর রং কালো, মুখে এক জোড়া মস্ত গোঁফ, চশমার ভিতর দিয়ে দেখছি দুটো ধারালো ছোট ছোট চোখ—তাঁকে দেখে সাহস কমে যায়। আমরা কাছে গিয়ে সবিনয় নমস্কার করে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো তুলে বললেন, কি চাই?

রবি বললে, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি···

পালিয়ে!—বেশ ত, কি চাই।

আমি বললুম যদি আমাদের একটু কাজকর্ম জোটে—!

বড়বাবু মোটা গলায় বললেন, চাকরি?

রবি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

পালিয়ে এলেই চাকরি হয়? চাকরি গাছে ফলে? বড়বাবু হেঁকে উঠলেন।

আমি বললুম, যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে—

অনুগ্রহ!—বড়বাবু কর্কশ কণ্ঠে বললেন, মা-বাপকে দুঃখ দিয়ে যারা পালিয়ে আসে তাদের ওপর অনুগ্রহ? তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি তা জানো?

ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলুম। আমরা নির্বাক, নতমুখ।

বড়বাবু পুনরায় বললেন, চাকরি এখানে খালি নেই,—যাও, বেরোও।

আমরা এক পাও নড়ছিনে। মুখ তুলে বললুম, আজ্ঞে—

কাজের সময় এখন বিরক্ত করো না বলছি! চলে যাও—

বললুম, মিঃ চৌধুরী—মানে, আপনার জামাই আমাদের বলে দিয়েছেন কিনা—

তিনি উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, তবে মিস্টার চৌধুরীর কাছেই যাওনা কেন?

রবি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতেই পারছে না। তোষামোদ, প্রার্থনা, মিনতি, আবেদন—এ সব কাজে সে আমাকেই আগে ঠেলে দেয়। সুতরাং আমিই বললুম, আপনার দয়া না পেলে আমাদের আর কোনো উপায় নেই, স্যার।

বটে!—চাটুয্যে বললেন, জাহাজ-পালিয়ে বদমায়েসি করতে এসেছ দুজনে বিদেশে কেমন? চালাকি পেয়েছ? মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো······পাজি, রাস্কেল এখানে দাঁড়িয়ে আমার কাজ পণ্ড করতে চাও? বেরোও এখান থেকে—

এক ঘর লোক আমাদের অপমান আর লাঞ্ছনা দেখছে। রবি এক এক পা পিছোতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু আমার পা যেন আর উঠছে না। জীবনে আমার এই প্রথম বড়বাবু নামক পদার্থের অভিজ্ঞতা। রেঙ্গুনে যে উদার প্রকৃতি ও স্নেহশীল ভদ্র বাঙালী ছিল না তা নয়—কিন্তু তাঁরা আমাদের চোখে পড়েন নি—আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ভদ্রসমাজের নীচের তলাটাই দেখে এসেছি। অতঃপর প্রবাসী বাঙালী শুনলেই আমার যেন আতঙ্ক দেখা দিত।

চাটুয্যে আমাদের কোনো প্রার্থনা ও আবেদন শুনতে চাইলেন না এবং আমাদের নতমুখের উপর তিনি যথেচ্ছ কটূক্তি ও তিরস্কার বর্ষণ করতে লাগলেন। সম্ভবত তাঁর চাকরি দেবার ক্ষমতা থাকলে তিনি আর একটু সংযত ভাষা বলতেন, কিন্তু হয়ত তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ—কটূক্তির আড়ালে সেটি তিনি গোপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে নিরাশ হলে আর আমাদের কোনো উপায় নেই—নিরাশ্রয় হয়ে অনাহারে আমাদের পথে পথে ঘুরতে হবে। এখানে আমাদের কোনো আত্মীয় কোনো বন্ধু, পরিচিত—কেউ কোথাও নেই। এখান থেকে চিঠি যায় পাঁচ দিনে, মনিঅর্ডার আসে আট দিনে। তাছাড়া দেশে আমাদের মুখ দেখাবার উপায় নেই, আমরা আমাদের কীর্তি প্রকাশ করতে পারবো না কারো কাছে। দয়া, মায়া, স্নেহ—কোথাও কিছু অবশিষ্ট রেখে আসিনি। আমরা সবাইকে প্রতারিত ক'রে এসেছি, সকলের বুকে ছুরি বসিয়ে গা ঢাকা দিয়েছি। আত্মহত্যা

ছাড়া আর আমাদের পথ নেই। সামনে মরুভূমি, নিষ্ঠুর সংসার, দয়াহীন মানুষের সমাজ, কষ্টদায়ক জীবনযাত্রা,—বড়বাবুর চেহারার ভিতর দিয়ে সবগুলো যেন এক সঙ্গে আমাদের গ্রাস করতে এলো। আমরা অন্ধকার দেখলুম।

বড়বাবু সহসা ঘণ্টা বাজিয়ে চীৎকার করলেন, চাপরাশি—!

চাপরাশি ছুটে আসছে, একটি পলকমাত্র, আমাদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল, আমাদের বিপন্ন জীবনের চরম গ্লানি,—আমি সহসা নতজানু হয়ে ব'সে বড়বাবুর একখানা পা দু'হাতে ধরলুম—। কান্নায় ভরা আর্তকণ্ঠে বললুম, আমাদের এমন ক'রে তাড়িয়ে দেবেন না, স্যার্—আমরা অনেক আশা ক'রে আপনার পায়ের কাছে এসেছি—

চাটুজ্যে প্রচণ্ড বিরক্তি আর তিক্ত ভাষার সঙ্গে কর্কশভাবে তাঁর পাখানা সরিয়ে নিলেন। ঠিক বুঝতে পারলুম না, তাঁর পাখানা আমার হাত দুখানাকে অপমান করলো কি না। তবে এই কথাটা সেই মুহূর্তেই মনে হলো, কাকুতিমিনতির আর কোনো দাম নেই!

অপমানিত বিবর্ণ মুখে প্রায় পঞ্চাশটি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে নিজের মৃতদেহখানা টানতে টানতে হল্‌ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। এরকম ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়, তাই সংসার এখনও সহনীয়।

পথে বেরিয়ে গলার ভিতর থেকে বার বার কি যেন একটা ঠেলে উঠছিল, আমি বারবার ঢোক গিলছিলুম। অনেকক্ষণ এলোমেলো পথ হাঁটবার পর রবি ধীরে ধীরে বললে, চাক্‌রি না হয় নাই হবে,—তুই ওর পায়ে হাত দিতে গেলি কেন?

আমি তখন কতকটা সহজ হয়েছি। একটু হেসে বললুম, মনে করেছিলুম, দুজনে ওর দুখানা পা ধ'রে ঝুলে পড়বো!

রবি বললে, আমি! আমি সে বান্দাই নই!—নে, এই কল্‌টা টেপ্‌, একটু জল খেয়ে নিই।

তার জল খাওয়া হ'লে আমি বললুম, দাঁড়া, আমিও একটু খাই। টেপ্‌ কল্‌টা—

রবি যাদের ভেতো বাঙালী বলে ব্যঙ্গ করেছিল এবং ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় ধাপ্পা দিয়ে যাদের অভিভূত করেছিল, সেই হিতেনবাবুদের আজ আমাদের বড় দুর্দিনে মনে পড়লো। তাঁদের ঠিকানা আমি জেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু আজকাল আমাদের আহার ও আশ্রয়ের কোন সংস্থান নেই, এই কথাটা তাঁদের জানতে দিতে

রবি কিছুতেই রাজি নয়। রবি তাঁদের জানিয়ে রেখেছে রেঙ্গুনের ক্রোড়পতি তার বাবার বন্ধু, কলুটোলার সরকারদের হিমালয়সদৃশ আভিজাত্য, সুইস্ গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে আমাদের নেমন্তন্ন, আমাদের জাপান-আমেরিকার পরিকল্পনা—কিন্তু আজ আমরা যে দুটি ভাতের কাঙাল, একটু থাকার জায়গার অভাবে যে পথে পথে ঘুরি, আমরা যে সর্বত্র বিতাড়িত আর লাঞ্ছিত—হিতেনবাবুদের কাছে একথা প্রকাশ করার চেয়ে কলুটোলার সরকারের আফিং খেয়ে মরাও ভালো!

কিন্তু রবি নিজেই স্টেশনে গিয়ে তিন আনায় দুখানা টিকিট কিনে ট্রেনের কামরায় উঠে বসে বললে, আমি কিন্তু কিছু বলতে পারবো না—যদি মাথা হেঁট করতে হয়, তুমি করবে। ওটা তুমি সহজেই পারো।

এই বলে মুখের একটা বিক্ষুব্ধ আওয়াজ করে আমার প্রতি অসীম ঘৃণা নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

আমাদের গন্তব্য স্থানটির নাম থিঙাংইয়াঙ। যেমন শিয়ালদহ থেকে ঘুঘুডাঙ্গা কিংবা বেলঘরে—এই এতটা। রেঙ্গুন শহর কলকাতার চেয়ে অনেক ছোট এবং শহরটি ছাড়ালে একেবারেই সেকেলে পল্লীগ্রাম। রেঙ্গুন বন্দরই হলো রেঙ্গুনের সর্বপ্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র, নদীপথে আসে মালপত্র—সুতরাং রেলগাড়ি কেবল অনেকটা যাত্রী আনাগোনা আর আদান-প্রদানের বাহন মাত্র। গাড়িগুলি ছোট ছোট—সাজসজ্জা কম। আশপাশে প্রান্তর অনেকটা বনময় জলা, দূরে দেখা যায় রেঙ্গুন ব্রীজ—অনেকটা লছমনঝোলার পুলের মতন। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়ি এসে পৌছলো থিঙাংইয়াঙ স্টেশনে। পথঘাট আমরা কিছুই জানিনে। সামনেই গ্রামের পথ, ও-পাশে ছোট্ট একটি খাবার-দোকান, এদিক দিয়ে চলেছে একটা গরুরগাড়ি বোঝাই বাঁশ, কয়েকজন গ্রাম্য বর্মী স্ত্রী-পুরুষ বোধ হয় হাট থেকে ফিরছে। অর্থাৎ মন্থর নিঃশব্দ গ্রাম। এ যেন ঠিক বাঙলা দেশ, কোথাও তারতম্য নেই, কোথাও বৈচিত্র্য নেই। সেই কাদা আর জঙ্গল, সেই মাছি আর মাকড়সা, সেই মশা আর ডোবা। ওরই মধ্যে একটু শুকনো পথ ধরে আমরা অগ্রসর হলুম। আমরা শেষ চেষ্টা করতে এসেছি।

বনময় চারিদিক—নিঃঝুম। ঝিঁঝির ডাক শুনছি,—তার সঙ্গে কোন্ গাছের ডালে ডাহুক। আশপাশে ঘন জঙ্গল; দিনের বেলাতেও অন্ধকার। রোদ আছে সেই স্টেশনের দিকে, এদিকটা ঠাণ্ডা, আর কেমন যেন গা-ছমছমে ছায়ান্ধকার। আমরা

ঠিক-ঠিকানাটির গোলমালে প্রায় ঘণ্টাখানেক গ্রাম্য জঙ্গলের গোলকধাঁধায় ঘুরে এক সময় এক বাংলোর বাগানের ধারে এসে দাঁড়ালুম। প্রথমটা বিশ্বাস করা যায় না যে, এ অঞ্চলে কোথাও জন-বসতি থাকতে পারে! বড় বড় ডাকাত যদি কোন গভীর বনের ঝুপসিতে বাসা নিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকতে চায়, তবে এইটিই তার উপযুক্ত জায়গা। ভাগ্য অন্বেষণের কী বিড়ম্বনা আমাদের!

বাংলোর ধারে দাঁড়িয়ে আমরা গলা ছেড়ে হিতেনবাবুকে ডাকলুম—পরমুহূর্তে একটা মস্ত কালো লোমবহুল কুকুর তীরবেগে আমাদের দিকে দৌড়ে এল। কুকুর দেখলেই চিরদিন আমার তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলির কথা মনে পড়ে, কুকুর আমার কাছে বিভীষিকা।—তার ওপর এই জানোয়ারটার গায়ে এত বেশী ঘন কালো লোম যে, ওটার চোখ দুটোও ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওর দ্রুত-পদক্ষেপের তালে তালে প্রায় আমি জড়িতস্বরে দুর্গানাম জপ করে ফেলেছিলুম আর কি। যাদের বাড়ি বড় বড় কুকুর পোষা আছে, আমি কোন কালেই তাদের বাড়ি যাইনে। আমার গোঁদলপাড়ার ইতিহাস রবিও জানে। কুকুরের বিষ ঝাড়াতে গিয়ে দিদিমার আট টাকা খরচ হয়েছিল। মানকুণ্ডু দিয়ে ফেরবার সময় পথের ধারে দেখেছিলুম মস্ত কেউটে সাপ। দিদিমা দুর্গানাম জপ করেছিলেন।

কুকুর ছুটে আসতেই রবি মুখের একটা শব্দ করে তাকে এবং আমাকে একসঙ্গে শান্ত করল। বললে, ভয় কি, কুকুর কত কেথফুল জানিস? আমাদের কলুটোলার বাড়িতে মস্ত একটা ফক্সটেরিয়ার ছিল,—ব্যাটা মুখ তুলে তাকালে বাঘেও ভয় পেতো। চোখ দুটো কী কালো! হাঁ করে নিঃশ্বাস নিত, পাগুলো থাবা থাবা···

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা যে চোর নই, এটা ওর কাছে প্রমাণ করার জন্য আমি ভয়ে-ভয়ে হাসিখুশী মুখে কথা কয়ে উঠলুম। বললুম, তুই যে বলিস, কলুটোলার বাড়ি তোর মনে নেই? তবে কুকুর দেখলি কোথায়?

রবি বললে, আরে ওই হোলো। আমি দেখিনি, দাদামশায়ের কাছে শুনেছি।

এমন সময় হিতেনবাবু বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্নে—কি যেন নামটা। হাসিমুখে কুশল প্রশ্নাদির পর কুকুরটাকে সামলে তিনি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন! আমি বললুম, আপনাদের ভুলতে পারিনি···কী চমৎকার লোক আপনারা—

রবি কটাক্ষে আমার দিকে তাকালো, অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমি চাটুবাক্য আরম্ভ করে দিয়েছি,—যদি কোন সুবিধা হয়! হিতেনবাবু বললেন, না না সে কি কথা, আপনাদের কাছে আমরা কিছুই নয়। কত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে আপনারা—ইত্যাদি।

রবি তৎক্ষণাৎ খুশী হয়ে সিগারেট ধরালো এবং সাহেবি কায়দায় সিগারেটটা নিল ঠোঁটের কোণে। আমাদের গল্পগুজব আরম্ভ হলো। রেঙ্গুন কেমন লাগছে, বড়ফয়া দেখলুম কি না, কোথায় আছি—বাঙালীদের সঙ্গে কী প্রকার ঘনিষ্ঠতা হোলো, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাদুড়ীর কথা—অর্থাৎ রবিকে প্রশ্ন করে তাঁরা গলগল করে মিছে কথা শুনলেন। আমাদের কাছে তখন প্রশ্ন করার অর্থই হলো মিছে কথা শোঁনা।

এমন সময় এক ভদ্রলোক বর্মি-পোষাকে এবং তাঁর চেহারাটাও অবিকল বর্মী—গম্ভীরভাবে বেরিয়ে এলেন। নাকের ডগা মোটা, কিন্তু থাঁদা, চোখ দুটো রাঙা, ছোট ছোট—দেখলে দুর্ভাবনা জাগে। তিনি হাসলেন না। কেবল ঘাড় নেড়ে নমস্কার নিলেন। হিতেনবাবু বললেন, উনিই আমার কাকা, এখানকার ডাক্তার। —উনি বাঙলা জানেন না।

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। আমাদের মুখের চেহারা লক্ষ্য করে হিতেনবাবু—যতদূর আমার মনে পড়ে এতকাল পরে—বললেন, তাঁর ঠাকুরদাদার ভাই এসেছিলেন বর্মায় অল্পবয়সে। তিনি বিবাহ করেন এক বর্মী নারীকে, কাকা তাঁরই গর্ভের সন্তান। এঁর স্ত্রীও বর্মী,—এ-বাড়িতে বাঙলা ভাষার চর্চা নেই।

আমি সবিনয়ে মিষ্টকণ্ঠে বললুম, কাজকর্মের সুবিধে কেমন হলো আপনাদের?

হিতেনবাবু নতমুখে বললেন, আপনাদের কাছে বলতে লজ্জা পাই। আমরা এসে হয়ত ভুল করেছি, কাজের কোন সুবিধে এখন হবে না। তাছাড়া 'বার্মা ফর বার্মিজ' আন্দোলন চলছে। কাকা বলছেন, মাস ছয়েক এখানে থেকে যদি চেষ্টা-চরিত্র করা যায়—কিন্তু বিশেষ কোন আশা নেই!

রবি চুপ করে রইলো, দুশ্চিন্তায় সিগারেট টানতে সে ভুলে গেল। আমি কিয়ৎক্ষণ পরে বললুম, ফেরবার গাড়ি পাবো ত?

হিতেনবাবু বললেন, আধ ঘণ্টা পরে একটা গাড়ি আছে—

বললুম, কিছু যদি না মনে করেন···এক গ্লাস খাবার জল···

একটি ছোকরা জল এনে দিল। জলের গ্লাসের ভিতরে মুখ দিয়ে ওই জলের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত দেখলুম ধূ ধূ করছে মরুভূমি। ছায়া নেই মায়া নেই, কোথাও

আলো নেই, কোথাও সুদিনের সুদূরতম সঙ্কেতও নেই। জল খেয়ে গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ালুম, আমাদের যেতে হবে। এই নৈরাশ্য-নিঃশ্বাসের মধ্যে আর একদণ্ডও নয়।

আশ্চর্য, বাড়িটার ভিতরটাও কেমন যেন ছম্‌ছমে নির্জন। চারিদিকে পুরনো কাঠের অপরিচিত গন্ধ,—মোটা ঠাণ্ডা কঠিন কালো-কালো কাঠ···অন্ধকারে কার চাপা চাপা পায়ের গুরু গুরু শব্দ কাঠের আনাগোনার পথে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ করেছে, কিংবা জঙ্গলের ভিতরে আলো আসতে পারছে না, কিংবা বাংলোটা আঁধারে আবৃত—কিংবা সমস্তটাই আমাদের নিরুৎসাহ বিষণ্ন প্রাণের মলিন প্রতিচ্ছায়া—আজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ে আমাদের সেদিনকার বর্তমান জীবনের ভয়াল বিপদ ঠিক যেন বিভীষিকার মতন মুখ ব্যাদান করে রয়েছে।

হিতেনবাবুর সঙ্গে আলাপ সেরে রুদ্ধকণ্ঠে আমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলুম।

স্টেশনে এসে পয়সা বাঁচাবার জন্য বিনা টিকিটে গোপনে আমরা রেঙ্গুনের গাড়িতে উঠে বসলুম। ফিরতে মিনিট পনেরো লাগে, কিন্তু সেই পনেরো মিনিটের কী উদ্বেগ! রবি বে-পরোয়া, মরিয়া। যদি ধরা পড়ি, তবে হাজতে গিয়ে আহার ও আশ্রয় পাব—এই তার অভিমত। আমরা সেই সময় মনেও করেছিলুম যে, আমরা বিপ্লবী দলের ছেলে, এই বলে পুলিশের কাছে ধর্ণা দিয়ে যদি আহার ও আশ্রয় পাই। মনে করেছিলুম, কিছু একটা চুরি করতে গিয়ে না হয় ইচ্ছে করে ধরা পড়ি। আমরা চেষ্টা করলুম, সিঙ্গাপুরের জাহাজে কোনপ্রকারে গা-ঢাকা দিয়ে উঠে জায়গা করে নিই। কিন্তু জাহাজ ঘাটায়, কুলী-এসেন্সিতে, চীনা দপ্তরে এবং জেঠিতে এত কড়াকড়ি যে, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

রেঙ্গুন স্টেশনে এসে নামলুম। রবি আমাকে সঙ্গে নিয়ে টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। সহসা টিকিট ঘরের ফোকরের কাছে একটি বর্মী ভদ্রলোককে ইংরেজিতে বললে, আপনি যদি থিঙ্গাংইয়ার্ডের টিকিট চান আমি দিতে পারি স্যর—

লোকটি আমাদের দিকে তাকালো। রবি বললে, আমাদের সেখানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু যাবো না কোনো কারণে।

লোকটি বললে, আমার দু'খানা টিকিট চাই···স্ত্রী আছে সঙ্গে···

হৃদয়, অত অধীর হেয়ো না, শান্ত হও! কিন্তু আমার পা দুখানা কাঁপছে। রবি বললে, হ্যাঁ, দুখানাই আছে,—অবিশ্যি দুআনা পেলেই আমরা খুশী হবো।

লোকটি দেখলো, তাকে আর ভীড় ঠেলে টিকিট করতে হয় না। সুতরাং হাত

পেতে টিকিট দুখানা নিয়ে তিন আনা পয়সা বা'র করে দিল। তারপর বললে, তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের ঠকাবো কেন ?

বেশ অনুভব করলুম, তিন আনা পয়সা রবির হাতের তেলোর মধ্যে রি রি ক'রে যেন জলছে। লজ্জাও যতখানি, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যও তত বড়।

ভ্রমণটা সম্পূর্ণ হোলো বিনামূল্যে,—কিন্তু ওই তিন আনাই আমাদের সেদিনকার নৈশ-ভোজনের প্রধান সম্বল। আমার জীবনে প্রথম বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ ব'লেই ঘটনাটা মনে আছে !

চট্টগ্রামবাসী আর একটি সুদর্শন ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন ক'রে জানি না ওখানে আলাপ হয়েছিল। তাঁর নাম স্ফটিকবাবু। তাঁর কাছে প্রায়ই চাকরির চেষ্টায় যেতুম। সেদিন সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরা স্ফটিকবাবুর কাছে গিয়ে আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা জানালুম। তিনি বললেন, এত বড় শহরে যে আপনাদের দুটো কাজ জুটবে না, এ আমি বিশ্বাস করিনে। তবে কি জানেন, সুযোগ সুবিধের দরকার। দু' তিনমাস থাকলে একটা না একটা জুটেই যাবে, এই আমার মনে হয়। অবিশ্যি সমস্তটাই অনিশ্চিত।

আমরা জানতুম, আর সাতটি দিনও আমাদের চলবে না।

স্ফটিকবাবু বললেন, আপনারা এসেছেন শিয়রে সংক্রান্তি নিয়ে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি কাজ হয় ভাই ?

প্রথম বন্ধুত্বের সস্নেহ স্পর্শ। রবি তৎক্ষণাৎ বললে, দেখুন, আমাদের থাকার জায়গাও নেই !

স্ফটিকবাবু আমাদের আপাদমস্তক একবার তাকালেন। পরে বললেন, ও, তাই নাকি ? তা বেশ, আপনারা আমার মেসে উঠুন, থাকুন কিছুদিন। আজ ব্যস্ত আছি কালরাত্রে আপনারা জিনিষপত্র নিয়ে আসবেন। কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা, চাকরি আপনাদের হবেই, এমন কথা কিন্তু দিতে পারবো না ভাই।—এ যাত্রা হয়ত আপনাদের দেশেই ফিরে যেতে হবে।

আমরা বাধিত ও কৃতার্থ হয়ে চলে এলুম।—

আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমেছে। রেঙ্গুন শহর নিরিবিলি; পথের দোকানপাট অনেকটা বন্ধ। কোনো কোনো পানের দোকান শুধু খোলা। আমরা খুঁজে খুঁজে একটি ছোট সস্তা হোটেল বা'র করলুম। আমার শরীর ভালো ছিল না, জামা-

কাপড় সব ভিজে জাব,—যাহোক একটু গলাধঃকরণ করে পয়সা চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

দুর্গাবাড়ির নাটমন্দির ঘন অন্ধকার। আমাদের জামা, জুতো, কাপড় সব জলে সপ্‌সপ্‌ করছে। ওরই মধ্যে ভিজা কাপড়ে পা আর মাথা মুছে সেই ভাঙা তিনফুট লম্বা চওড়া চৌকির উপর সন্তর্পণে বসলুম। রবি সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো—আস্তে ঘষ্‌লো পাছে শব্দ হয়।

দাঁতের উপর দাঁত চেপে রবি বললে, তোর জন্যই আমার এই শাস্তি!

বললুম, কেন?

চুপ্‌—সোয়াইন! মুখ নাড়িস নে। যখন ধমক দেবো, মাথা হেঁট ক'রে থাকবি। তোর জন্যেই আমার এই শাস্তি?

মাথা হেঁট করে রইলুম।

রবি বললে, তুই আমার কানে মন্তর দিয়ে দেশছাড়া করলি, নৈলে আমার কী দরকার ছিল চাকরি খোঁজার? আমি বাবার টাকায় যেতে পারতুম না জাপানে আর আমেরিকায়? **After all,** আমি তোর মতন ভ্যাগাবণ্ড নই!

মুখ তুলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম, রবি দাঁত কিটিয়ে বললে, ফের মাথা তোলে! চুপ—চুপ একেবারে! এখনি কবিরাজকে ডাকবো,—দুজনে তোমার দু'কান ধ'রে বৃষ্টিতে বা'র ক'রে দিয়ে আসবো।—ধরো, মাথা হেঁট ক'রে থাও।—এই ব'লে যথারীতি জলন্ত সিগারেটের এক-তৃতীয়াংশ সে আমার হাতে দিল। পুনরায় বললে, দয়া ক'রে কাপড়জামা আগ্‌লে বসে থাকো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। সাবধান, চুরি ক'রে যেন সিগারেট বা'র ক'রে খেয়ো না।

বললুম, তুই ঘুমোবি, আমার ঘুম পায় না?

চুপ্‌,—রবি তড়াং ক'রে সোজা হয়ে বসলো। বললে, দয়া ক'রে একটি কথা ভেবে দেখবে কি? কাল রাত্তিরে তোমার ডরিয়ে ওঠার জন্যে আমার ভালো ঘুম হয়নি। তাছাড়া, তোমার জালায় আজ আমি বেশী খেয়ে ফেলেছি, একটু না গড়ালেই আমার চল্‌বে না!—এই ব'লে সে পা গুটিয়ে আড় হয়ে পড়্‌লো।

বললুম, তবে কি আমাদের ফিরে যেতে হবে?

তৎক্ষণাৎ দাঁত খিঁচিয়ে রবি আবার উঠে বসলো। বললে, এঃ ফিরে যাবে! নাকে কান্না! তখন মনে ছিল না? ফিরে যাবার নাম করলে জিব্‌ টেনে বা'র

করবো!—নিশ্চয় লুকিয়ে তুই পকেটে টাকা এনেছিস, নৈলে এত তেল কেন? কই, বা'র কর্, কোথায় টাকা রেখেছিস্? ফিরে যাবার গাড়িভাড়া কে দেবে?

বললুম, তুই কি ভাবছিস্ শুনি?

আমি ভাবছি তোমার মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়্বো কবে! তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না! এইখানে থাকবে, লেংটি পরবে, ভিক্ষে করবে, সন্নিসি হয়ে ঘুরবে—কেঁদে কেঁদে বেড়াবে খঞ্জনি বাজিয়ে—

বললুম, আর তুই?

রবি বললে, আমি? আমি কলুটোলার সরকার! একখানা চিঁঠি পাঠাবো আমার দিল্লীর বন্ধু জাগ্‌মোহনকে—হু হু ক'রে টাকা আসবে! After all, তোমার আশীর্বাদে ভদ্রসমাজে আমার টু-পাইস্ প্রেস্টিজ হ্যাজ!

আমার শোচনীয় পরিণাম কল্পনা ক'রে আমি যেন আঁৎকে উঠলুম। কিন্তু একটা রক্তাক্ত শিকার পথের ওপর প'ড়ে ওলোটপালট খেলে শিকারী যেমন ক্রূর উল্লাসে সেটাকে লক্ষ্য করে, রবি তেমনি অন্ধকারে ব'সে আমার নিরুপায় মুখখানার দিকে ক্ষণে ক্ষণে কটাক্ষ করতে লাগলো।

নিঃসাড় নাটমন্দির—অন্ধকারে নিঃঝুম, যেন প্রেতপুরী। বাইরে ঝম্‌ঝম্ ক'রে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। তালাবন্ধ প্রতিমার মুখখানা কল্পনায় দেখতে লাগলুম। ওটা কি এখনও প্রসন্ন? অন্ধকারে এখনও কি সেই সোনার মুখ জ্বল্‌ছে? রেল আপিসের বড়বাবু মিঃ চাটার্জির মুখখানার কথা ভাবলুম। সে মুখ কি তেমনি বীভৎস? তেমনি বিকৃত? ভাবতে লাগলুম, ঝড়ে লণ্ডভণ্ড সাগরতরঙ্গের চেহারা—তার সীমা সেই, আদি নেই, অন্ত নেই!

তবে কি ফিরে যেতে হবে!

তবে কি বুঝতে হবে যারা মাথা উঁচু করতে চায়, তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, তারা ভাসে সমুদ্রে,:তারাই দোলা খায় উৎপীড়নে আর লাঞ্ছনায়?

কিন্তু ফিরে যাবো কেমন ক'রে? আমরা সর্বস্বান্ত, রিক্ত,—আগামীকাল আমাদের উপবাস ছাড়া গতি নেই। আমরা নির্বুদ্ধিতার চোরাবালির ওপর প্রাসাদ তুল্‌ছিলুম,—সেটি রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে ভূমিসাৎ হয়ে গেল! কিন্তু ফিরবো কেমন ক'রে?

তিনফুট লম্বা-চওড়া তক্তা, দুজনের আঁটে না। দু'জনে শুয়েছি গায়ে গায়ে এবং চারখানা পা উঁচু ক'রে রেখেছি। ঘুমের মধ্যেও সজাগ আছি, কারণ ভোরে উঠেই পালাবো। তন্দ্রায় সহসা একখানা পা খ'সে তক্তার বাইরে পড়ে যায়—আমরা আঁৎকে উঠি। পা ঝুলিয়ে শোয়া যায় না, কোমর টনটন্ করে। দুজনে দুজনের হাঁটুতে ঠেকো দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন আছি—ফস্ ক'রে বাইরের দিকে পা দুখানা পিছলে যায়। অমনি আমরা আঁৎকে উঠি। মাঝে মাঝে ছোট তক্তাখানার ভাঙা পায়াটা মড়মড় ক'রে ওঠে, অমনি আমরা চম্‌কে উঠে এদিক-ওদিক তাকাই। কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নেই। হু হু গোঁ গোঁ ক'রে ঝড়ের বাতাস চলছে বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়ে। মাথাটা ভার, চোখ দুটো জ্বলছে, মাঝে মাঝে কাশছি খুকখুক্ ক'রে। কিন্তু ওই তিন ফুট তক্তা ছাড়া আর আমাদের কোথাও ঠাঁই নেই,—নাটমন্দির জলে ভাসছে। শীত করছে, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে,—ভিজে জামাকাপড় স্যাঁতস্যাঁত করছে সর্বাঙ্গে,—গায়ে ঢাকা দেবার কোথাও কিছু নেই। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরবার উপায় নেই, জায়গার অভাব,—সুতরাং চিৎ হয়ে পা উঁচু ক'রে থাকতেই হবে। যাদের মৃত্যু ঘটেছে, তারাও শ্মশানে যাবার সময় চৌদ্দপোয়া খাটিয়া পায়,—আমরা জীবিত ব্যক্তি, আমাদের সে সৌভাগ্যও নেই। রবি নিজের বুকের উপর দুইহাত রেখে চোখ বুঁজে আছে,—হাত দুখানা ছাড়বার মতন জায়গা নেই। তাছাড়া তা'র টাকায় আমার এই দেশভ্রমণ, তার পয়সায় খাই,—সুতরাং তিন ফুটের দু'ফুট একা তাকেই ছেড়ে দিয়েছি। ভোর হ'লে বাঁচি,—এর চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে পথে পথে বেড়ানো ভালো,—কারণ সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচবো ; কিন্তু এ বন্ধনদশা অসহ্য। ঠিক কিভাবে পড়ে আছি বলা কঠিন। চিৎ নয়, কাৎ নয়, উপুড় নয়—শোওয়া-বসা কোনোটাই নয়,—অমনি একরকম আছি। খানিকটা ঝুলছি শূন্যে, খানিকটা তক্তায় ; অর্থাৎ একাংশ জলে, অপরাংশ ডাঙায়। জানিনে আর কতক্ষণ এইভাবে কাটাতে পারবো ! ভিতরে জল, বাইরে জলপ্লাবন, আকাশে বন্যা, ইরাবতীতে প্রবল জলস্রোত সাগরে অকূল কালো জল আকুলি-বিকুলি—আমরা দুটি নাবালক ভাসছি সকলের মাঝখানে একটি তিন ফুট লম্বা-চওড়া ভেলায় চ'ড়ে—তার একটি পায়া আবার ভাঙা ! কেমন যেন বিকার-প্রলাপের হাসি আমার মুখে ফেনিয়ে ওঠে। নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থা দেখে হাসতে থাকি।

তিন-ফুট বাই তিন-ফুট; যেদিকেই মাপি—তিন ফুট। টলস্টয়ের একটা গল্পে আছে, মানুষ জায়গা দখলের জন্য সমস্ত জীবন ধ'রে যতই ছুটোছুটি করুক, আসলে তার দরকার সাড়ে তিন হাত জমি। আমরা বাঙলা থেকে এসেছি বর্মায়, আমরা জয় করতে বেরিয়েছি চীন জাপান আমেরিকা আর ইউরোপ,—কিন্তু তিন ফুটের চেয়ে বেশি জায়গা আমরা পাচ্ছি নে। আর আমরা চাইনে ওই ইউরোপ আর আমেরিকা, চীন আর জাপান,—আজ রাত্রের সকলের বড় সংগ্রাম হোলো তিন ফুটের বিরুদ্ধে; কারণ, আমরা চাই সাড়ে তিন হাত!

তবে কি সাড়ে তিন হাত জমি বর্মায় আমাদের জন্য নেই? তবে কি নিরন্ন নিরাশ্রয় আমরা এই তিন-ফুট বাই তিন-ফুটের সঙ্কীর্ণ জীবনের মধ্যে ব'সে আত্মগ্লানি আর অনুশোচনা নিয়ে অন্ধ নিগূঢ় নিয়তির ঋণশোধ ক'রে চলবো? তবে কি আমাদের সমস্ত চিত্তক্ষোভ, ব্যর্থতা, হতাশা, অভিশাপ, বেদনা,—আমাদের সমগ্র কষ্টক্লিষ্ট ইতিহাসটা লেখা থাকবে এই পায়াভাঙা উইপোকা-খাওয়া তিন-ফুট বাই তিন-ফুটে? তবে কি আমাদের চীন-জাপান আর ইউরোপ-আমেরিকা কণ্ঠরোধ হয়ে ম'রে প'ড়ে থাকবে এই সঙ্কীর্ণ তিন-ফুট বাই তিন-ফুটে?

বোধ হয় আমিই একটু নড়ে থাকবো, কিম্বা রবি ঘুমের ঘোরে একবার পাশ বদ্‌লাবার চেষ্টা ক'রে থাকবে—সহসা তক্তার তলার দিকে মড়-মড়-মড়াৎ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকের তক্তার অংশ মুখ থুব্‌ড়ে ভেঙে পড়্‌লো জলে-ভাসা মেঝের উপর। ভেলা ডুবলো সমুদ্রে। আমি ছট্‌কে পড়লুম রবি ছট্‌কে পড়লো ঘুমের ঘোরে আমার ঘাড়ের উপর পলকের মধ্যে দুজনে যেন দুজনের হাতে-পায়ের মধ্যে জড়িয়ে হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে গেলুন।

ঘুমের ঘোরে দৈবদুর্বিপাক। আমি হাঁপাচ্ছি, রবি ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কিন্তু তক্তার মড়মড় শব্দে কেউ জাগলো কি না, সেজন্য আমরা কান পেতে রইলুম কিয়ৎ-ক্ষণ। না, কেউ জাগেনি। আর্য সঙ্গীতালয় থেকে রবি একটা অশ্লীল গালাগাল শিখেছিল, সেটি প্রয়োগ করলো তক্তাখানার উপর, কবিরাজের উপর এবং সোনার দুর্গাপ্রতিমার উদ্দেশে। তারপর আমার কাছে স'রে এসে বললে, হ্যাঁরে?

বললুম, কি?

রবি বললে, খুব লেগেছে তোর, না?—আচ্ছা, ঘুমের ঘোরে তুই অমন কাৎরাচ্ছিলি কেন বল্ ত? কি হয়েছে তোর?

চুপ করে রইলুম।

অন্ধকারেই রবি এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললে, আমার ওপর রাগ করেছিস, কেমন? একি, এত গরম! তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে! কখন্ থেকে জর হোলো!

বললুম, ঠিক মনে পড়ছে না!

রবি বললে, নিমোনিয়ায় তোর ভয়,—এ কিন্তু নিশ্চয় নিমোনিয়া!—সর্বনাশ করলি? এখন উপায়? কেমন ক'রে ফির্‌বি? একটি টাকাও নেই যে? ডাক্তার দেখাবো কেথ্থেকে?

কিয়ৎক্ষণ সে চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, আমার কথা ভাবিসনে। তোকে ছেড়ে দিয়ে জানিনে আমার কেমন ক'রে চলবে! হয়ত চলবে, হয়ত চলবে না,—কিন্তু তোকে ফিরে যেতেই হবে ভাই, অমত করিসনে। নৈলে তোর মায়ের কাছে আমি কোনো দিন মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।—তবে যাবার সময় ব'লে যাস, আমার ওপর তোর কোনো রাগ নেই!

বললুম, একলা আমি ফিরে যাবো না।

রবি বললে, খবরদার, তোকে যেতেই হবে!—চোখ রাঙালো সে।

রবি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, যদি না যাস্ তবে তোকে না খাইয়ে রোগে ভুগিয়ে মেরে ফেলবো।

বললুম, সেও ভালো, তোর কাছে মরবো!

তোকে লাথি মেরে খুন করবো!—রবি চেঁচাতে না পেরে দাঁতে দাঁতে ঘষলো।

শান্তকণ্ঠে বললুম, বেশ ত, তোর হাতেই মৃত্যু হবে!—

রবি বললে, কাল শনিবার, কাল যদি তোকে জাহাজে তুলতে না পারি, তবে আমি আমার নাম বদ্‌লে ফেল্‌বো!

আমি রুগ্ন হাতে তাকে ধরতে গেলুম। সে স'রে গিয়ে বললে, খবরদার, সোয়াইন্—কাল যদি না যাও তবে রবিবার সকাল থেকে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

বললুম, আমি গেলে তোর চল্‌বে?

রবি বললে, তুই না গেলে আমার আরো অচল হবে!

কিন্তু টাকা?

টাকা! মাটি ফুঁড়ে আমি টাকা তুলবো,—আমি কলুটোলার সরকার!—এই ব'লে সে কাছে এসে আমার হাত ধ'রে আবার বললে, আমাকে শুধু গাল দিতেই দেখেছিস, আমাকে কোনোদিন দেখলিনে!

আমি তার হাতের মধ্যে চুপ ক'রে রইলুম। আমরা আবাল্য বন্ধু!

আমাকে জোর ক'রে তাড়াবার উদ্দেশ্য রবির কিছু ছিল বৈকি! সে নিজেও ফিরে যেতে চায়, অথচ তার যাবার মুখ নেই। বাপের প্রতি তার অতিশয় শ্রদ্ধা, অথচ তাঁকে সে প্রতারিত ক'রে পালিয়ে এসেছে। ইউরোপ আমেরিকার নেশা তা'র কেটে গেছে, এখন ঘরের জন্য তার মন কাঁদছে। বর্মায় আর তার ভালো লাগছে না, এখান থেকে পালাতে পারলে সে বাঁচে। তার ইচ্ছে আমি কলকাতায় ফিরে তার দুর্দশার কথা বলি তার মা-বাবার কাছে, খুব বাড়িয়ে ফেনিয়ে করুণভাবে যেন বলি—যদি তাঁদের মন গলে। আর যদি তাঁরা কাতর না হয়ে ক্রুদ্ধ হন্, তবে আমি যেন যেমন ক'রেই হোক্ কিছু টাকা টেলিগ্রাম করে পাঠাই। সাত দিনের মধ্যে টাকা না এলে সুইসাইড করবে। ফটিকবাবুর ঠিকানাটা আমি রেখে দিলুম।

চায়ের দোকানে ব'সে রবি বললে, একখানা চিঠি বাবাকে লিখে তোর হাতে দিই, কি বলিস্?

ধমক খাবার ভয়ে আমি চুপ করে রইলুম। রবি বললে, তুই ত' বাঙলা লিখিস, কায়দা ক'রে লিখে দে'না একখানা চিঠি! দেখিস্ বাবার চিঠি···ভুল বাংলা লিখিস নে। বললুম তুই নিজে লেখ না?

চোখ পাকিয়ে রবি বললে, আমি জীবনে কখনো বাঙলা লিখিনি, তা জানিস? I hate your language.

হোটেলে ব'সেই বাঙলায় একখানা চিঠি লিখে তার হাতে দিলুম। সে নিবিষ্টমনে পড়ে চিঠিখানা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল। বললে, এই জন্যেই তুই সেবার বাঙলা কম্পোজিশনে ফেল করেছিলি! Rather, ভুল ইংরেজি লিখবি, কিন্তু বাংলা লিখবিনে। দয়া করে আমার এই উপদেশটি চিরকাল মনে রেখো। এই ব'লে সে 'মাইডিয়ার ড্যাডি—' সম্ভাষণ ক'রে বাপের কাছে একখানা চিঠি লিখতে ব'সে গেল।

চিঠি শেষ হ'লে রবি বললে, এই চিঠি প'ড়ে সবাই কাঁদবে, দেখিস। এই দ্যাখ Contemplation শব্দটা এতদিন পরে ঢুকিয়ে দিতে পারলুম। কি রে, তোর কি জ্বর বাড়লো!

বললুম, কালকের চেয়ে একটু বেড়েছে বোধ হয়।

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সকাল তখন সাতটা বাজে। আমরা ভাবলুম, ফটিকবাবুর কাছে কেঁদে পড়ি, যদি গোটা পঁচিশেক টাকা তিনি দেন। কিন্তু লোকটি মিষ্ট প্রকৃতির ব'লেই হয়ত আমাদের লজ্জা হোলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জাহাজ ছাড়বে সাড়ে দশটায়। সুতরাং সময় আমাদের মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। বলতে গেলে দুদিন আমাদের যা'তা খেয়ে কাটছে—কিন্তু পুঁজির চেহারা দেখে আহার করতে আর সাহস নেই। আমার বেশ জ্বর, গায়ে-পিঠে ব্যথা, বুকে সর্দিকাসি—ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারেই নেই, রুচি ম'রে গেছে। রবি মাঝে মাঝে, অর্থাৎ দিনে পাঁচ সাতবার চা পেলেই খুশী। ওর মধ্যে দুধের আর চিনির ভাগ আছে!

আর্য সঙ্গীতালয়ে আর যাবো না, তা ছাড়া টাকা ধার দেবার মতনও ওখানে কেউ নেই। আর, আমাদের লোকে টাকা দেবেই বা কেন? আমরা জুতো জামা কাপড়ের দিকে তাকালুম। রবি বললে, জামা কাপড় বিক্রীর চেয়ে আত্মহত্যা ভালো! অর্থাৎ মুস্কিল হয়েছে এই, আমার সর্বপ্রকার পরিকল্পনাই রবির আভিজাত্যে আঘাত করছে। রেঙ্গুনে বাসকালে সে অন্ততপক্ষে হাজার খানেক বার আমার কাছে আত্মহত্যার ভয় দেখালো। যারা বার বার শুধু ভয় দেখায়, তারা যে আত্মহত্যা করে না—এ বুঝতে পারতুম। কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ক'রে ফেললে আমি দাঁড়াবো কোন্ চুলোয়? সুতরাং চুপ ক'রে তা'র নির্দেশ মানতুম। পরবর্তীকালে রবি সুইসাইডের ভয় দেখিয়ে তা'র মায়ের কাছে অনেক টাকা আদায় করেছিল। আমি সুইসাইডের ভয় দেখাবার মানুষ খুঁজে পেতুম না। মা রাগ ক'রে নিজেই বলতেন, তুই নিপাত যা, গলায় দড়ি দিয়ে ডুবে মর্—

আমি কলা দেখিয়ে পালিয়ে যেতুম,—একবারও মরিনি!

সময় আমাদের আসন্ন, দেখতে দেখতে বেলা বাড়ছে। রেঙ্গুন শহরের প্রান্তে এসে এক বস্তির পাড়ায় ঢুকে এক পানের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলুম, কাছাকাছি এক 'পন-শপ্' অর্থাৎ বন্ধকী দোকান আছে। আমাদের দুজনের দুটো হাতঘড়ি,

আর বায়নকুলারটির ওপর রবি বাজি ধ'রে বসেছিল। আমার কল্‌বিগড়ানো রেডিয়ম ঘড়িটার নতুন দাম ছিল নাকি সাত টাকা। রবির ঘড়ির দাম পচাত্তর আর বায়নকুলারটির ইংরেজি দাম হোলো, উনিশ পাউণ্ড। তখন পাউণ্ডের দাম পনেরো টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে নতুন দাম সাড়ে তিন শো টাকার ওপর। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, আমাদের কাছে এগুলি দেখলে প্রথমতঃ চোরাই মাল ব'লে সন্দেহ করবে কিনা। আমি বললুম, ধরা পড়লে ভালোই, হাজতে গিয়ে থাকা-খাওয়া পাবো!

রবি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, চুরির দায়ে ধরা পড়বো? বাবার মাথা হেঁট হওয়ার আগে আত্মহত্যা করবো, তা জানিস?

আমরা পানওলার কাছে আমাদের দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করলুম। পানওলা একটি লোক সঙ্গে দিয়ে আমাদের পাঠালো। আমরা বললুম, এ জিনিসগুলি বাঁধা রেখে যদি অন্তত শ'খানেক টাকা পাই, তবে পাঁচ টাকা আমরা পানওলাকে বকশিস দেবো। লোকটি সোৎসাহে আমাদের নিয়ে গেল একটি করোগেটের চালার নীচে।

অত্যন্ত গরীব লোকেরা সেখানে ভিড় করেছে। গৃহস্থ মেয়ে-পুরুষ দু'চারজনও নানাবিধ বন্ধকী দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সেখানে ঘিরে রয়েছে,—দুজন নিম্নশ্রেণীর মাতাল পাশে দাঁড়িয়ে প্রলাপ বকছে। একটা কাঠের ফোকরের মুখে দাঁড়িয়ে সকলেই হাত পেতে টাকা চাইছে, কিম্বা নিচ্ছে। দিদিমা বলতেন, লজ্জা, মান, ভয়—তিন থাকতে নয়! সুতরাং তিনটি পদার্থ দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের জিনিসগুলি ফোঁকরের কাছে বাড়িয়ে দিলুম! ভিতরে একটি লোকের শুধু মুণ্ডুটা দেখতে পাচ্ছি। লোকটা বর্মী, কি চীনা, কি মুসলমান—কি কোন্ জাত বুঝতে পারলুম না। আমাদের তিনটী জিনিস নাড়াচাড়া ক'রে বললে, পাঁচ টাকা আর দশ টাকা!—এই ব'লে আমার কল্‌-বিগড়ানো ঘড়িটি ছুড়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। এটির দাম কিছু নেই।

মাত্র পনেরো টাকায় অত দামের দুটো জিনিস?—অসম্ভব! আমি ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। রবি শুনেই একটা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করলো বন্ধকী দোকানটার উদ্দেশে। বরং না খেয়ে রোগে ভুগে মরবো,—কিন্তু সাড়ে তিন শো টাকার মাল পনেরো টাকায় বাঁধা রাখবো না। আমরা চ'লে গেলুম একদিকের পথ ধ'রে। আমরা চীন জাপানের পথে বেরিয়েছি দুঃসাহসিক অভিযানে, আমরা ধরাকে

সরা জ্ঞান ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি—তাই সেদিন পথের মাঝখানে অতি কষ্টে কান্না চেপে রইলুম। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছলুম জলাশয়ের ধারে এক বাগানে। একখানা বেঞ্চে বসে আমি হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রইলুম। মাথার যন্ত্রণায় ও প্রবল জ্বরে আর একটুও হাঁটতে পারছিনে। রবি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বা'র ক'রে সিগারেট ধরাতে গেল, কিন্তু বুড়ো আঙুল দিয়ে তলার দিকে টিপে মোড়কটি তুলে সে পরীক্ষা ক'রে দেখলো, আর একটি সিগারেটও নেই। আমাকে গোপন ক'রে সে আস্তে প্যাকেটটা ওদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। কী বিরক্তি, কী হতাশা তার মুখে!

দূরে কোথায় ঘণ্টা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজলো।

আস্তে আস্তে রবি পকেট থেকে বা'র করলো দু'টাকা আর তিন পয়সা। আমি তখন জ্বরে ধুঁকছি, বেঞ্চে শুয়ে পড়ার চেষ্টায় আছি। রবি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, এই নে, তুই ডাক্তার দেখা, ওষুধ খা—যেমন ক'রে পারিস ভালো হয়ে ওঠ—এই আমাদের শেষ সম্বল! তা হোক—তুই সেরে ওঠ্—

বললুম তারপর?

তারপর—ফটিকবাবু!

দুটাকা তিন পয়সা তার পকেটে জোর ক'রে রেখে দিয়ে বললুম, চল্; এগুলো নিয়ে ফটিকবাবুর কাছে, কিম্বা আর্য সঙ্গীতালয়ে রেখে কিছু টাকার চেষ্টা করি। আমরা চোরও নই, এগুলোর দামও কম নয়!

রবি অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো। বললে এবার তুই আমাকে চালা, আমি আর তোকে চালাবো না।—দাঁড়া, রিক্স ডাকি।—এই এই রিক্স···না, তোকে আর কিছুতেই হাঁটাবোনা—

রিক্স ডেকে রবি আমাকে হাত ধরে তুলে বসালো, নিজে উঠে বসলো পাশে।

রিক্স চলেছে ঠুং ঠুং করে। আমি চোখ বুজে কাত হয়ে পড়েছি। অনেকদূর পথ। রবি পাথর হয়ে গেছে আমার অবস্থা লক্ষ্য ক'রে। তা'র আত্মাভিমান মিলিয়ে গেছে! তার ঘন ঘন ইংরেজি বুলি, তা'র লাখোলাখো টাকার গল্প, আমার প্রতি তার শাসন, তার 'উচ্ছে ভেজে পটল ব'লে চালানো' তা'র কাল্চার আর 'আফ্টার-অল্'—কোথায় তলিয়ে গেছে। তা'র মুখ শুকনো, সে গম্ভীর, তার চেহারাটা ভেতো বাঙালী!

কিন্তু বড়রাস্তায় প'ড়ে ফটিকবাবুর মেসের কাছাকাছি এসেই রবি বেঁকে বসলো। বললে, না, এখানকার বাঙালী ভদ্রলোকদের কাছে আমি কিছুতেই আর মাথা হেঁট করতে পারবো না, তোকেও করতে দেব না। এদের খুব চিনেছি।—এই রিক্স···

রিক্স থমকে দাঁড়ালো। আমার আর বাক্‌বিতণ্ডার সাধ্য নেই। বললুম, তাহলে কি করা যায় ?

চল্‌ ফিরে 'পন্‌-শপে,'—পনেরো টাকাই সই। তোর জাহাজ ভাড়াটা হ'লেই চলবে।—এই রিক্স উধার চালাও···

রিক্স আবার মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চললো। আমি স্তম্ভিত, হতবাক্‌।—কিয়ৎক্ষণ পরে এখানে রবির একা দিন যাপনের কথাটা মনে ক'রে বললুম, তোর চলবে কি করে ?

সে আমি চালিয়ে নেব। তোর ভাববার দরকার নেই।

বললুম, এই রিক্সর ভাড়াই বা দেব কোত্থেকে ?

রিক্সর ভাড়া রবির মনে ছিল না, চুপ করে রইল। কিন্তু গাড়ি চলতে লাগল সেই পন-শপের দিকে। রবি কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভেবে বললে, এতদিন তোর সামনে না হয় কুলিগিরি করতে পারিনি—আড়ালেও কি পারব না ?

বললুম, কিন্তু তোর যে অত কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নেই রে।

রবি আমার দিকে পলকের জন্য তাকাল, আমার কাছে মিষ্ট কথা শোনারও অভ্যাস নেই তার। সম্ভবত তার নাকের কোঁড়াটা জ্বালা করে চোখ দুটো একটু ঝাপসা হয়ে এল। তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে ভাঙা আওয়াজে বললে, সোয়াইন, সেন্টিমেণ্টাল ফুল।—এই ব'লে হঠাৎ সে হেসে উঠল। ভাব গোপন করল।

'পন-শপে' এসে পৌছলুম প্রায় বেলা দশটা। লোকের ভিড় তখন কিছু কম। আমার কল-বিগড়ানো হাত-ঘড়িটা এবারেও ফেরৎ দিয়ে বললে, ও-দুটো পনেরো টাকা।

রবি এবার তার আভিজাত্যের খোলস খুলে আমাকে সরিয়ে ফোঁকরের মধ্যে মরিয়ার মতো মুখ দিয়ে বললে, বাবুজি, আপনার মেহেরবাণী, দয়া করে আর কুছু টাকা আমাদের দিজিয়ে। বহুৎ—বহুৎ দরকার—

লোকটা কিছুতেই দিতে চায় না। অবশেষে রবির পীড়াপীড়ি আর একান্ত কাকুতি-মিনতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আর একটি টাকা মাত্র বেশী দিল।

সাড়ে তিনশো টাকার জিনিস বাঁধা রেখে মাত্র ষোলটি টাকা। তখনও ছোট ছোট এক টাকার নোট চলতি রয়েছে, সেই ষোলখানা ময়লা ঘৃণ্য অপমানজনক নোট হাতে নিয়ে রবি প্রথমে বললে, কিসের লজ্জা, চুরি ত' করিনি! Rather আমাদের ঠকিয়ে কম টাকা দিল! তা দিক্ after all, লোকটা বাঁচালো!—নে—

এই বলে রবি আমার জিনের কোটের ভেতর পকেটে ষোলখানা নোটই সযত্নে রেখে দিল। বললুম, আমার ভাড়া লাগবে পনেরো টাকা—একটা টাকা তুই অন্তত রেখে দে—

চুপ,—রবি এবার যেন উৎসাহিতভাবে আমাকে ধমক দিল। বললে, আমার ব্যবস্থা মাথা হেঁট করে শুনবে, প্রতিবাদ করবে না। আটশো-নশো মাইল সমুদ্রে যাবি—চারদিন জাহাজে—একটা টাকা হাতে না থাকলে তোর চলবে কেমন করে? সোয়াইন্—

একটু থেকে পুনরায় বললে, দয়া করে এইটি দেখো যে জাহাজে মরে থেকো না… যে অসুখ তোমার! কলকাতায় নেমেই চিঠিখানা বাবাকে দিবি—

রিক্স আমাদের নিয়ে জাহাজঘাটার দিকে ছুটতে লাগল। এখান থেকে প্রায় দু' মাইল পথ, কাপড়ের পুঁটলি সঙ্গেই আছে, দুর্গাবাড়িতে আর প্রয়োজন নেই—রবি ছুটিয়ে দিল রিক্সকে বকশিস্ কবুল করে। ছুট—ছুট—ছুট…

জাহাজঘাটায় যখন এসে পৌঁছলাম, দেখি জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন দশটা পঁয়ত্রিশ। জাহাজ জেঠি ছেড়ে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে নদীর মাঝখানে যাচ্ছে! কিন্তু টিকিট? টিকিট যে করা হয়নি! কোথায় টিকিট পাওয়া যায়? ওদিকে জাহাজ যাচ্ছে নাগালের বাইরে! ছুটোছুটি করতে লাগলুম—টিকিট-ঘর পাচ্ছিনে খুঁজে। আর সময় নেই, ছুটছে রবি, ছুটছি আমি—আর টিকিট করা সম্ভব নয়, জাহাজ চলেছে …কেমন করে ধরি…তবে কি যাওয়া হবে না? আবার চারদিন অপেক্ষা করব?.

ছুটতে ছুটতে নেমে এলাম। সামনের ঘাটে একখানা শাম্পান্—চাঁদের মতো নৌকা। কত নিবি শাম্পান্? জাহাজ ধরিয়ে দিতে হবে কিন্তু…

শাম্পানের মাঝি বললে, না পারব না জাহাজ ধরাতে—

চীৎকার করলুম, রবি…এই রবি—ওখানে কী কচ্ছিস? শীগিগির আয়—

রবি ছুটতে ছুটতে এল। বললে, এই নে—পাউরুটিখানা পকেটে রাখ্—তোকে আর কিছু খাওয়াতে পারলুম না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম পলকের জন্য! হৃদয় আর মানবতার একি খেলা নদীর কূলে! এ-বন্ধুর ঋণ শুধবো কেমন করে? এ সব দিল। নিল না কিছু—এর ভার কেমন করে বইবো? কিন্তু আর সময় নেই, পাঁউরুটিখানা পকেটে পুরে সেই অনিচ্ছুক শাম্পানেই উঠে বললুম, চেষ্টা কর, যদি ধরাতে পারিস, বকশিস্ দেব!

রিক্স ভাড়া গেছে বার আনা, পাঁউরুটি এক আনা, এক আনা সিগারেট, তার ওপর শাম্পানের ভাড়া আর বকশিস্। আমি জানি রবি আজ নিঃস্ব হল!

শাম্পান ছোটে নেচে নেচে, ভয়ে ত্রস্ত। আগে শাম্পান্ চড়িনি; এখন দেখছি, এর মধ্যে বসে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। কেবলই টলে পড়ছি, কেবলই কাৎ হয়ে যাচ্ছি! শাম্পান্ তার ল্যাজ তুলে একবার দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার ডুবে যায়। কিন্তু জাহাজ ভেসে যায়, শাম্পান্ ছোটে তার পিছু পিছু। নদীতে ঢেউ আছে, তবে জাহাজের গতিবেগ কম, শাম্পান্ এল প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজের কাছাকাছি। অনেক উঁচু থেকে জাহাজের গা বেয়ে দড়ি-বাঁধা কাঠের সিঁড়ি নেমে এসেছে জলের কাছাকাছি। ছোট্ রে শাম্পান্—ছুঁতে হবে ওই দড়িটাকে। আর একটু···আর একটু···আর একটু ছোট্···আর একটু নাগালের মধ্যে আয়—ছোট্ রে শাম্পান্—

আমরা চীৎকার করছি। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ছুটন্ত ঘোড়াকে উৎসাহিত করার জন্য যেমন উন্মাদের মতো অশ্বভক্তরা চেঁচায়—তেমনি আমরা। এমন সময় দেখি, সেই উপর থেকে খালাসীরা দড়িতে টান দিয়ে সিঁড়িটা তুলে নিচ্ছে।

রবি আমার নাম ধরে চীৎকার করে বললে, পারবিনে?

ভুলে গেলুম আমার জ্বর, আমার দুর্বলতা আর অক্ষমতা, ভুলে গেলুম পুঁটলি আর পাঁউরুটি—পলকের মধ্যে শাম্পানের ওপর টলতে টলতে দাঁড়িয়ে চলন্ত জাহাজের গায়ে-লাগানো দড়ির সিঁড়িটার ওপর লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে ধরে ফেললুম। ভারসাম্য আর দূরত্বের মাত্রা-বোধ একচুল এদিক-ওদিক হলে সেদিন আমার নিশ্চিত সলিল সমাধি!

দড়ির সিঁড়ির সঙ্গে জড়িয়ে কপিকলের সাহায্যে—যেমন কুয়োর ভিতর থেকে বালতি ওঠে—তেমনিভাবে ঘর্ঘর শব্দে ভিতর দিয়ে উঠে গেলুম জাহাজের আপার ডেক-এ। জাহাজ তখন চলছে, খালাসীরা আমাকে দেখে হতবাক। ছিপ তুলতে গিয়ে যেন কৈ-মাছ কাণকোয় বেধে উঠে এসেছে। তারা আমাকে এসে ঘিরল।

তা ঘিরুক, ততক্ষণ অনেক ওপর থেকে নীচের নদীতে চেয়ে দেখছি, দূরে রবির ছোট শাম্পানটি ধীরে ধীরে ফিরে চলেছে রেঙ্গুনের ঘাটের দিকে। আমি ভাবাবেগ

সামলাতে না পেরে একটু যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু তারপর সেদিন যে-আমার সবচেয়ে প্রিয় আর সর্বাপেক্ষা আপন—তার সেই ছোট শাম্পানটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে জড়িত-কম্পিত স্বরে বললুম, কলুটোলার সরকার এ-জীবনের প্রথম নমস্কার তোমাকেই জানালুম।

* * * *

ওইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপাচ্ছিলুম, দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। খালাসীরা আমাকে হিড়--হিড় করে টেনে নিয়ে গেল এক সাহেবের কাছে, তিনি ক্যাপ্টেন। আমার অসুখ, টিকিট করার সময় পাইনি, জাহাজ ভাড়া আমার সঙ্গেই আছে, এসেছিলুম চাকরি খুঁজতে, আমি বাঙালী, বাড়ি আমার কলকাতায়—বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিষ্কৃতি পেলুম। কথা রইল, জাহাজ ভাড়া চাইলেই আমি দিয়ে দেব।

ইরাবতী নদীর মোহনার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। জাহাজ চলেছে শান্ত, অথচ আগেকার অপেক্ষা দ্রুতগতিতে। আবার অনেকদিন পরে নদীর খোলা বাতাস গায়ে লাগল। এ জাহাজখানা আগেকার চেয়ে বোধ হয় একটু বড়ই হবে। নাম—'এস এস এডাভানা'। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলুম, ডেক-এর ওপর বাঙালী যাত্রী চোখে পড়ল না, যাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম। এখন বর্ষাকাল।

আমার রাঙা চোখ বুজে আসছে মাথার যন্ত্রণায়, পা দুখানার ওপর শরীরের ভার আর সইছে না। একবার অতিকষ্টে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে একটি বেশ নির্জন জায়গা দখল করে বসে পড়লাম। এ-জায়গাটা চিমনীর ঠিক নীচে এবং নিয়মিত বাষ্প ওঠে বলে কাঠের মেঝেটা একটু গরম। বাতাসের প্রবলতায় ইতিমধ্যেই আমার শীত ধরেছিল, এবার একটু গরম পেয়ে অনেকটা যেন আরাম পেলুম।

চোখ চেয়ে থাকার সাধ্য আর আমার ছিল না, বসে থাকার শক্তি তার চেয়েও কম। সুতরাং নদীর দুই পারে প্রাকৃতিক শোভা-দর্শন আপাতত স্থগিত রেখে পুঁটলি আর পাঁউরুটিখানা সামলে আমি শুয়ে পড়লুম—ধুলো বালি, অপরিচ্ছন্নতা, অভব্যতা, কৌলীন্য আর ব্রাহ্মণত্ব—এগুলোর কথাও পরে ভাবা যাবে। বর্ষাকাল হলেও আজ আকাশ পরিচ্ছন্ন, বাইরে বেশ রোদ রয়েছে। বাতাস বড় মধুর, শরীরের সমস্ত গ্লানি যেন মুছে নেয়। চোখ বন্ধ করে আমি পড়ে রইলুম। জাহাজ চলল হু হু করে।

রেঙ্গুনের ঘাটে রবি নামল এতক্ষণে।

সে টের পায়নি, চলেছে উদাসীন হয়ে—আমি তার পিছু পিছু। শাম্পান আর রিক্স-র ভাড়া চুকিয়ে দেবার পর তার আর কোন সংস্থান নেই, এবার তার উপবাস। দুর্গাবাড়ি থেকে সে বেরিয়ে চলল, আমি চললুম তার পিছু পিছু। 'বড়ুয়া'তে সে গেল, যদি সেই ফুলওয়ালী তরুণীটিকে একবার দেখতে পায়—কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রবি সেই জলাশয়-ঘেরা বাগানে এসে বসল। তার কোন কাজ নেই, তার দিন কাটছে না। সে সর্বস্বান্ত। সে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে ধূলি-ধূসর পথে-পথে।

এর পর আর কোন ছবি আমি আঁকতে পারলুম না আমার ক্লান্ত কল্পনায়, তাই তাকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে আমি যেন একটা ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ নিদ্রার আবিলতার অতলতলে তলিয়ে গেলুম। হয়ত এই সময়টায় আমাকে ডাক্তার দেখবার দরকার ছিল। যাই হোক, আর কোনদিন আমি উঠে দাঁড়াতে পারব, একথা ভেবে আমি শুইনি।

দিন দুই পেটে বিশেষ কিছু পড়েনি, সুতরাং পাঁউরুটিখানা এই জাহাজপথে আমার সর্বপ্রধান সম্বল। একটি টাকা আমার কাছে বেশী আছে বটে, কিন্তু এই চারদিনের কোন সময়ে সেটি উঠে গিয়ে ভাঙাতে হবে, কিংবা কিছু কিনতে হবে—এ পরিশ্রম আমার সইবে না। আমি অনড় হয়ে পড়ে রইলুম। একথা ভেবে নিলুম, চার পয়সার পাঁউরুটির এক-চতুর্থাংশ এক-এক দিনে খাব—এতটুকু কমবেশী যেন না হয়। নিজেকে আমি সতর্ক করে রাখলুম—খবরদার, লোভীর মতন যেন বেশী কামড় দিও না! অতএব ঘুমোবার আগে আমি পাঁউরুটির একাংশ শুকনো মুখে চিবিয়ে নিলুম। গিলতে গিয়ে গলায় সে-রুটি বেধে গিয়েছিল।

ঘোলাটে ঘুমের ঘন আবিলতায় যেন ডুব দিয়েছি। কী দেখছি তার মধ্যে? বোবা, নীরন্ধ্র, নিবিড় তমিস্রলোক। তার সেই অনড়, অকম্প আবিলতা—যেন পাষাণ ভার চাপিয়েছে আমার বুকের উপর। তলিয়ে যাচ্ছি আরও নীচে—অচেতন অসূর্যম্পশ্য-লোকে। সেখানে আশা নেই, আলো নেই, চৈতন্য নেই—শুধু সর্বগ্রাসী আঁধার। ক্ষীণ নিবিড় অস্পষ্ট কল্লোলের মধ্যে শুনছি চাপা চাপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—অভিমানী আশাহতরা যেমন সর্বহারা হয়ে আড়ালে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে; যেন কার মনোবিকারের অসংলগ্ন প্রলাপ বিজ বিজ করছে সেই তলাকার ঘন কল্লোলে! কে যেন কার টুঁটি টিপে জলে ডুবিয়ে মেরেছে, তার শেষ আর্তস্বর এখনও বুগ বুগ

করছে জলের তলায়। সে মরে গেল রুদ্ধশ্বাসে, রুদ্ধকণ্ঠে···চোখ দিয়ে তার রক্ত গড়ালো,—

ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ কাঁপছে—নিমীলিত রাঙাজবা! প্রলয়কালের আসন্ন রূপ দেখে দেবাদিদেব কেমন করে তাকিয়েছিলেন? সে-চক্ষু কি ছিল জরে জরোজরো জরাময়? আমি কোথায়? কী দেখছি কে আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে? নিয়তি? মৃত্যুর ভেলায়?

নিজেকে কোথা থেকে যেন প্রবল টানে ছিঁড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে তাকালুম। অপরাহ্ন ছায়ামলিন হয়ে এসেছে। নদীর মোহনায় এসে পড়েছি তরঙ্গের দোলা লাগছে জাহাজে। পিছনের নদী অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা এখন সমুদ্রে। খালাসীরা তৎপর হয়ে রয়েছে। এখন বর্ষাকাল। সবাই সতর্ক।

ভয়ানক উত্তাপ পিঠের তলায়, বয়লারের তাপ লাগছে। এত তাপ যে সইতে পারা যায় না। আমি উঠে কয়েক হাত হামাগুড়ি দিয়ে স'রে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু একি, আমার সর্বাঙ্গ কালো, ঘন মোলায়েম কালোয় আমি যে ঢাকা! কয়েক ঘণ্টা ধ'রে আমার সর্বাঙ্গে চিমনির ভুসো অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে। আমার মাথা মুখ জামা কাপড় হাত পা—কয়লা-খনির মজুরের চেয়েও কালো! নিজের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারলুম না—কেবল দূরে স'রে গিয়ে কোঁচার পাট খুলে আমার পরম প্রিয় পাঁউরুটির গা থেকে ভুসোকালি মুছে দিতে লাগলুম। তারপর এক সময় সেই পাঁউরুটিখানিকে একবার একটুখানি কামড় দিয়ে সেটি কোলের মধ্যে নিয়ে আবার মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়লুম। জর বেড়েই চলেছে। এদিকে জাহাজটি দুলছে, যতদূর সম্ভব মাটি আঁচড়ে পড়ে রইলুম চোখ বুজে।

সহসা নিজের কানে কানে বললুম—কেন, কেন তোর বাঁচার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা? এ ভীরুতা, এ রুগ্নের দুর্বলতা—এর নাম মরণোন্মুখতা—এর মোহজাল কাটিয়ে উঠে দাঁড়া। বেঁচে থেকে বার বার মৃত্যু ভালো নয়, একবার মৃত্যু হোক তোর সাগর-তরঙ্গচূড়ার আঘাতে। নে, উঠে দাঁড়া, পতাকা তুলে ধর। জলের নিগূঢ় কল্লোল কান পেতে শোন, ওর থেকে জীবনের দীক্ষামন্ত্র তুলে নে। যারা মৃত্যুভয়ভীরু, ভাগ্যের দ্বারে লাঞ্ছিত, অপমানে নতশির, মনুষ্যত্বে খর্ব—তাদের ধ্বজা বয়ে চল্। তাদের আহ্বান করে বল, মাভৈঃ। তুই না বাল্যকালে দুঃসাহসের

ধ্যান করেছিলি, দুর্গমের স্বপ্ন দেখেছিলি? তুই না ভেবেছিলি দেশ থেকে তাড়াবি ভীরুতার অপবাদ, কাপুরুষতার অপযশ? তুই না সেই?

দোলা দিল সাগরে, সেই দোলায় বৃহৎ জাহাজ চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি থরথর করে কাঁপছিলুম। সমুদ্রের ঢেউ লেহন করে নিয়েছে আকাশের সবটুকু আলো,—এমনকি, বিবর্ণ বিমর্ষ আভাটুকুও আর কোথাও নেই। কেন কাঁপন লাগে আমার প্রাণে? কেন ওই মথিত বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস বারংবার আমার তটে ভাঙন ধরায়? তবে কি বহুসংখ্যক জীবনের অশ্রান্ত স্পন্দন আমার সত্তার মধ্যে ধ্বনিত হয়? তবে কি আমার মধ্যে অগণ্য প্রাণ স্ফুরিত হয় অজস্র ধারায়, আর আমি কেবল কি সেই সংহত সম্মিলিত শক্তির আধার-যন্ত্র? বহুকে কেন এমন উপলব্ধি করি সকল দেহে মনে, বহু জীবনের কাহিনী কেন জলবিম্বের মতো ফুটে ওঠে আমার প্রাণ-প্রবাহের ভিতর থেকে? কেন বুকের মধ্যে বার বার কোটি কোটি নক্ষত্রদল ফুটে ওঠে?

থাক্ দার্শনিকতা। এবার বল ত, এ-যাত্রায় কী দেখে এলে? মানুষকে কি কোথাও দেখলে বড়? কিম্বা তা'রা কোথাও বড় হ'য়ে উঠতে চাইছে,—তোমার মনের মতন? উত্তর দিলুম, বড় কা'কে বলে? কে তোমার বিরাট চরিত্র? কেমন মানুষ দেখলে তুমি খুশি হ'তে?

দেখে এলুম ক্ষুধার অন্ন খুঁটে খাবার জন্য সেই জীবন-মরণ সংগ্রাম। সেই পদদলিত মনুষ্যত্বের কান্না, সেই বলবান আর অক্ষমের দলাদলি, সেই দেবতা ও অসুর। ভূগোলে পড়েছি, সমুদ্রের ভিতর থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় বিশাল জলস্তম্ভ, সে ছুটে যায় বায়ুবেগে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে—ধ্বংস করে সামনে যা কিছু পায়; তারপর এক সময়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। জলস্তম্ভের বদলে ওই অন্ধকার সমুদ্রের পাঁজরের ভিতর থেকে এক মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ায় না কেন—যার মতো বিশাল চেহারা পৃথিবীতে নেই? বিরাট পুরুষ তুমি,—বিরাট চরিত্র তুমি, তোমার হাতে আর একবার সৃষ্টি হোক্ এই বিশ্বপৃথিবী, মানুষের এই দুঃসহ দ্বন্দ্বের তুমি প্রতিকার করো, তুমি নূতন হাতে ধারণ করো এই বিশ্বজীবনের কল্যাণ-দায়িত্ব!

ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে একখানা পুরনো উইধরা বই প্রায়ই চোখে পড়তো। সেখানা থাকতো মাঝের ঘরের পূবদিককার কুলুঙ্গিতে। বইখানার নাম—"The Nihilist." বাইরের ইংরেজি বই পড়তেও তখন যেমন শিখিনি, Nihilist শব্দটার মানেও তেমনি জানতুম না। অনেক কাল পরে অভিধান খুঁজে

ওই শব্দটার অর্থ বার করলুম। আমাকে পেয়ে বসেছিল নিহিলিজম্। ওই শব্দটা কেমন যেন মাধুর্য ছড়িয়ে দিত আমার মনেপ্রাণে। কোথাও মানুষের অপমান, কোথাও পদদলন, কোথাও অনাচার, কোথাও শৃঙ্খলা আর ব্যবস্থার অজুহাতে অক্ষমের উপরে জুলুম কোথাও সমাজনীতির নামে কন্যাদায়গ্রস্তকে উৎপীড়ন, কোথাও স্ত্রীলোকের কপালে কলঙ্ক এঁকে দিয়ে তার প্রতি অমানুষিকতা,—অমনি আমার মনে প'ড়ে যেতো ওই নিহিলিজম্ শব্দটা। ওটাকে আমি হেদোর জলে ভাসিয়ে ওর খেলা দেখতুম, ওটাকে ছেড়ে দিতুম—ও যেখানে খুশি যাক। আমি নির্জনে বসে ভাবতুম, সকল প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা এনে দেবো, প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিরুদ্ধে দেশজোড়া সংশয় এনে দেবো, মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্ম আর অভ্যস্ত চিন্তাধারা নষ্ট ক'রে দেবো। আমি নিহিলিস্ট্, আমার দ্বিতীয় কেউ নেই, আমার পথে কেউ চলে না, আমার মতন ক'রে কেউ ভাবে না, আমার আদর্শ কেউ স্পর্শ করে না, চিন্তার রাজ্যে আমার চেয়ে দুঃসাহসের পরিচয় কেউ দেয় না! আমি নীতি-দুর্নীতি মানিনে, অভ্যাস আর ঐতিহ্যকে স্বীকার করিনে, চরিত্রবত্তার চলিত আদর্শকে বিশ্বাস করিনে, সমাজভব্যতাকে মেনে চলিনে,—আমি নিহিলিস্ট্। আমার দল নেই, দলাদলি নেই, অনুস্মৃতি নেই, আন্দোলন নেই,—আমি শুধু বিশ্বাস করিনে, স্বীকার করিনে। আমি নিহিলিস্ট্।

আমি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে থাকতুম বহু শতাব্দীর অনাচার আমার মধ্যে পুঞ্জিত, যুগে যুগে ইতিহাস তা'র রক্তাক্ত পদচিহ্ন আমার ভিতরে চিহ্নিত ক'রে গেছে, দিল্লী-পানিপথ-পলাশী আমার ভিতরে ব'সে আলো নিবিয়ে কাঁদে,—লক্ষ্মীবাঈয়ের এলোচুল লালে-লাল হ'য়ে ওঠে। কত সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছে আমার মধ্যে, কত জাতির কত কঙ্কালকে, আমি অনুভব করি আমার হৃদয়ের বিশাল রণক্ষেত্রে! কত যন্ত্রণায় কালো-হওয়া কত মুখ, ক্ষুধায় বিশীর্ণ প্রাণের কত দগ্ধীভূত মরণ, কত দলিত-মথিত জীবনের শেষ অবশেষ! কেন মনে হয় আমার প্রাণের ক্ষেত্রটাই কুরুক্ষেত্র,—সেখানে কত ভাবনা ও বাসনার পরস্পর-বিরোধী দল, কত আদর্শ ও নীতির অক্লান্ত সংগ্রাম, কত বঞ্চিতের ক্ষুধিতের নিত্য বিক্ষোভ? শক্তি ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ, বর্বর বিনাশের জন্য যুদ্ধ, দুষ্কৃতের অন্যায় ধ্বংস ক'রে কল্যাণবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ! সেই সব ভগ্ন ব্যথাতুরের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে ওঠে আমার মাটির নীচের থেকে,—তাদের অপ্রকাশিত বাণী অঙ্কুরিত স্ফুরিত

হয়ে ওঠে,—তাদের জীবন-পরিকল্পনা আজ আশ্রয় চাইছে একজন নিহিলিস্টের মধ্যে! সেই নিহিলিস্ট্ উঠে আসুক ওই অন্ধকার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের ভিতর থেকে জল-স্তম্ভের মতো, বর্বর বিরাট মহাপুরুষের মতো।

সেই রাত আমার কাটলো জ্বরের প্রলাপের ঘোরে।

আজ সকালটা থম্থমে। বাতাস কিছু ঠাণ্ডা, কিছু প্রবল। সামনে চেয়ে দেখছি আবার সেই অন্তহীন আশাহীন সমুদ্র। আমার অবসন্ন চোখে পাণ্ডুর দৃষ্টি। আকাশ মেঘমলিন। ডেকের উপরে লোকজন কম। খালাসীরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে যাচ্ছে। জাহাজে সিগ্নাল দেওয়া আছে।

কখন বমি করেছি, কতবার বমি হয়েছে মনে পড়ে না। আমি কেবল অকর্মণ্যভাবে সেদিকে একবার তাকালুম। জ্বর রয়েছে বেশ, তার চেয়ে বেশি অবসাদ আর ক্লান্তি। এখনও অনেক জল, এখনও অগাধ জল দেশে ফিরে গিয়ে কেমন ক'রে দাঁড়াবো কেমন ক'রে মুখ দেখাবো—সে-চিন্তা এখন মনে নেই। সমুদ্রের বর্ণ এখন ঘন নীল নয় একপ্রকার মেটে সবুজ,—যেন ভ্রূকুটিকরাল ওর তলার দিকটায় অস্বস্তি, কিম্বা ওপর দিকটায় অশান্তি, ঠিক বুঝা কঠিন। কিন্তু অবিরাম দুরন্তপনায় সমুদ্র থৈ-থৈ-করে, মেঘের সঙ্কেত পেলে সমুদ্রের সর্বাঙ্গে চেহারা যায় বদলে—যেন দস্যুর সহযোগিতা সংবাদ এসে পৌঁছয় দানবের দরবারে,—তাঁরপর দুই মিলিত শক্তির উচ্ছৃঙ্খল বর্বরতায় স্বর্গের দেবতারা অবধি করযোগে দণ্ডায়মান; সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়।

একজন খালাসী আমাকে জানিয়ে গেল আমি যেন 'হোল্ডের' মধ্যে নেমে যাই ডেক-এর উপরে কোনো যাত্রীর পক্ষে থাকা চলবে না। প্রশ্ন করবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে লোকটার দাঁড়াবার সময় নেই আমার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো তখন মানে পরিশ্রম, আর একজনের সাহায্য পেলে ভালো হতো। কিন্তু সাহায্য করবে কে? আজ রবি নেই, আমি একা।

কানাকানিতে জানতে পারলুম, আজ ভোর থেকে জাহাজের ডগায় ঘন ঘন বিপদসূচক সঙ্কেত করা হচ্ছে। আভাস পাওয়া আতঙ্কের। কি হয় কি হয়!

বিপদের সূচনায় সিগ্নাল দেওয়া হচ্ছে জাহাজে। ফ্লাগ নামছে আর উঠছে। ইঞ্জিন ঘরের আলো বার বার চোখ টিপছে। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠছে। এই হোলো নিশানা। শুনে এসেছি বঙ্গসাগর বিশ্বাসঘাতক, হঠাৎ সে ভ্রূকুটি করে প্রলয়ের, হঠাৎ কোথা থেকে ঝড় এসে নাকি দিগ্দিগন্তকে আক্রমণ করে।

জলে কল্লোলে

অপরাহ্ণ এসে পৌঁছেছে প্রায় সন্ধ্যায়। আপার ডেক-এ আলো জ্বলছে। খালাসীরা এখানে ওখানে দ্রুত উদ্বিগ্ন আনাগোনা করে চলেছে। দড়াদড়ি সামলাচ্ছে, লোহার শিকল টানছে, তেরপল টানাটানি করছে। আমাকে ওরা বার দুই নীচে নেমে যেতে বলেছে, কিন্তু আমি একটুও নড়িনি। আমার জ্বর, আমার বমি, আমার অবসাদ। কেউ হাত ধরে তুললেও উঠতে পারবো কি না জানিনে, তার চেয়েও অনির্দিষ্ট আমার দেশে পৌঁছবার আশা। ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গ-সঙ্কুল ঐ সমুদ্রের মতো ছায়াচ্ছন্ন অন্ধ অস্পষ্ট দিগন্তের মতো। মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করেছি দূর সমুদ্রে বিপদের নিশানার দিকে, মাথাটা আপনি নুয়ে পড়েছে জ্বরের দুর্বলতায়। বুঝতে পারছি স্বাধীন সত্তা আমার কিছু নেই, জলে ভেসে চলেছি জলেরই ইচ্ছা অনিচ্ছায়, জলের কাছে আত্মসমর্পণ করে হাল ছেড়ে পড়ে আছি। আমি রোগী আমার হাসপাতালে থাকার দরকার ছিল।

খালাসীরা সহসা একবার কলরব করে উঠলো। শুনতে পেলুম, সাগরের কোন্ প্রান্তে নাকি পশুরাজের মুণ্ড উঠেছে উঁচু হয়ে কেশররাগে। এসেছে নাকি আষাঢ়, এসেছে নববর্ষার মেঘদূত। ঘন কালো একটা ভ্রূকুটি, যেন মহিষাসুর। ওরই ভিতরে রয়েছে বিদ্যুদ্দাম,—দশপ্রহরণ-ধারিণীর তরবারি যেন ঝলক দিচ্ছে দূরে। আমার জন্ম আষাঢ়ের শেষ দিকে—অমানিশার ঘনবর্ষায়। চারিদিকে থৈ থৈ জল, বাদলের ঝঞ্ঝা ঘর-দোর কাঁপিয়ে চলেছে, আলো নিবে গেছে, দুরন্ত বাতাস আহত ব্যাঘ্রের মতো বাইরে দাপাদাপি করছে। দিদিমা গলা বাড়িয়ে মাকে ডেকে বললে, এ ছেলে তোমার ভাল হবে না। কোথা থেকে সর্বনেশে এলো! আজ সেই জন্মের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি এই জাহাজে। দেখতে পাচ্ছি নিজেকে। দুটো মরা বিবর্ণ চোখ, চেহারাটা কৃশ পাণ্ডুর সর্বাঙ্গ ভুসোকালিতে কালো,—শরীরের নানা অংশ রোগে অনড়। আমি যেন একটা নিরর্থক সৃষ্টির টুকরো,—ছিটকে এসে পড়েছি মহাশূন্যলোক থেকে অকূল সমুদ্রে।

সেই কালো মেঘ আকাশের মাঝখানে ছুটে এলো রণদামামা বাজিয়ে, আকাশ থেকে আকাশ জানালো তার বিশাল চক্রান্তের ঘোষণা,—আর নীচেকার সমুদ্র তার ক্ষিপ্তোন্মত্ত পাঞ্জা পাঠালো তরঙ্গে তরঙ্গে। আমাদের জাহাজে দোলা লাগলো, আঘাত প্রতিঘাত লাগলো। জাহাজ উঠছে উপর দিকে রণতুরঙ্গের মতো, নামছে নীচের দিকে যেদিকে রসাতল। আবার কোথায় বেজে উঠলো পাগলা ঘণ্টা খালাসীরা

কলরোল তুলে ছুটোছুটি করতে লাগলো, নিশানা দেওয়া হচ্ছে মুহুর্মুহু, আলোটা জ্বলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। জাহাজের রাশ টেনে ঠিক রাখা হচ্ছে। থামালে চলবে না, থামলেই জাহাজ বানচাল। আঁকা বাঁকা ছোটালে চলবে না,—আহত প্রতিহত হয়ে বিপর্যয় ঘটতে পারে। আত্মসমর্পণ করলে চলবে না, দেশালায়ের বাক্সের মতো সেটা জলের খেয়ালে নেচে বেড়াবে। জাহাজকে ধরে রাখতে হবে কঠিন হাতে, আপন স্বকীয়তায়, নির্ভুল পরিচালনায়। ঝড়, বজ্র, তরঙ্গ, জলোচ্ছ্বাস—জাহাজকে এদের সম্মুখীন হয়ে থাকতে হবে। পালাবার পথ নেই,—চতুর্দিকের অকূল পাথারের একই চেহারা। এড়াবার উপায় নেই,—দশ দিক থেকে বন্য হিংস্র শ্বাপদের মতো তরঙ্গের দল অবিরাম আক্রমণ করে চলেছে। পরিচালনা ও প্রতিরোধ—এই হোলো জাহাজের প্রাণের মন্ত্র।

দেখতে দেখতে ঝড় উঠলো সমুদ্রে, কালো মেঘে সমুদ্র অন্ধকার হয়ে গেল, বৃষ্টির সাপট নেমে এলো দিক্‌দিগন্তে। জাহাজখানা দিশাহারা হয়ে গেল। বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের অন্ধকার ছেড়ে চোখ দুটো সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো ডেক-এর ওপরে, নিজের প্রাণের ভিতরে। ভয় হচ্ছে না, কারণ ভয়ের চেতনা মরে গেছে। সমুদ্রপীড়ায় যন্ত্রণা বোধ করছিনে, কারণ আপন কণ্ঠনালী ছাড়া আর কোথাও জীবনের চিহ্ন উপলব্ধি করতে পাচ্ছিনে। বাঁচবার সম্ভাবনা নেই জানি, কারণ কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত,—কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর এই মাঝামাঝি সময়টাকে উত্তীর্ণ হওয়া কিছু কষ্টকর বৈকি। কোন্ মৃত্যুটা নির্বিঘ্ন, কোন্‌টার কম কষ্ট, কোন্‌টায় যন্ত্রণা নেই, কোন্‌টা হাসিমুখে বরণ করা যায়—ভাবছিলুম। ছোটবেলায় চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলুম, প্রায় এক মিনিটের একটা কঠিন স্মৃতি! নীরেন জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল,—দম আটকে রুদ্ধশ্বাসে ভীষণ যন্ত্রণায়। আমাদের শিবুকাকা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল—তাঁর সবুজ রংয়ের জিভটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, আর নাক আর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত! আফিঙ খেয়ে মরেছিল রতনবাবুদের বড় মেয়ে নীরদা। আমি তাকে দেখিনি, শুনেছি পেটের আর বুকের যন্ত্রণায় মরবার আগে সে বলেছিল, তার মরতে ইচ্ছা ছিল না। আর পুড়ে মরেছিল বাঙলাদেশের প্রথম কুমারী মেয়ে স্নেহলতা,—দরিদ্র পিতাকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে। স্নেহলতাকে নমস্কার, তার মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি,—এদেশের সমাজ সংস্কার সেইদিন থেকে সুরু। আমাদের উপীন মামা মরেছিল মোটরের তলায় পড়ে, কলকাতায় তখন

প্রথম মোটর গাড়ী। বিধবা সুহাসিনী সহোদর ভাইয়ের লাঞ্ছনায় হতমান হয়ে রেল লাইনে গলা পেতে দিয়ে একদিন রাত্রে বেলেঘাটায় না কোথায় যেন ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা করেছিল। নিজে জানবো না, উপলব্ধি করতে পারবো না, এমন কোন্ মৃত্যু? সুখের নিদ্রার মধ্যে যে মৃত্যু আসে নিঃশব্দে চুপি চুপি, যে মৃত্যুর পথ চিনিনে, যাকে অনুসরণ করা যায় না, যে-সুখের নিদ্রা আর কোনদিন ভাঙে না! আসুক সে প্রভঞ্জনের প্রবল তাড়নায়, পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে, দুরন্তের উদ্দামভয়াল রণরঙ্গে। আসুক সে, সে এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাক। এই ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, জর্জর, রুগ্ন, স্থাণু জীবনকে সে তুলে নিয়ে যাক বাইরের ওই অন্ধকার তরঙ্গমথিত সমুদ্রে, ওই বিশাল ভয়ালের পদপ্রান্তে সরল কঠিন হাতে আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিক; আমার শত লক্ষ ভগ্নাংশ, আমার অণুপরমাণু ছড়িয়ে দিক ওই অনন্ত জলরাশির চূড়ায়।

সহসা অন্ধকার সমুদ্র থেকে দুর্দান্ত তাড়নায় একটা জলোচ্ছ্বাস লাফিয়ে উঠে এলো ডেকের উপর—পলকের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিল! পাটাতনের একটা খুঁটি আঁকড়ে ধরে তখনই আত্মরক্ষা করলুম বটে, কিন্তু আমার একমাত্র আহার্য তিন-চতুর্থাংশ পাঁউরুটিখানা ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ওটা ছাড়া খাদ্য সম্বল আর আমার কিছু ছিল না। মনে করেছিলুম চার পয়সা দামের পাঁউরুটি চার দিনে ভাগ করে খাবো, পাছে কোনোবারে বেশি খেয়ে ফেলি এজন্য অনেকবার লোভ সংযত করেছিলুম। এক হাতে পাটাতনের খুঁটি আঁকড়ে অন্য হাতে এবং দুই পায়ের সাহায্যে ভাসমান পাঁউরুটিখানা রক্ষা করবার প্রাণপণে চেষ্টা যে করিনি তা নয়, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে লোনা জলের প্রবাহ ওটাকে পলকের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল! এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করা হোলো, জাহাজের রোলিং আরম্ভ হয়েছে—সাবধান! জাহাজখানা বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার ডান দিকে কাৎ হয়ে প্রায় জলের ওপর যেন শুয়ে পড়ছে। প্রত্যেক দফায় জলোচ্ছ্বাস উঠে পড়ছে ডেক-এর ওপর, আর আমি প্রতিরোধশক্তিহীন হয়ে জামা-কাপড়শুদ্ধ অবগাহন স্নান করছি। পাঁউরুটিখানা গেল, আমার প্রাণটা গেল ওর সঙ্গে, আমার চারদিনব্যাপী জীবন-যন্ত্রণার একমাত্র সম্বল গেল, একমাত্র বন্ধুকে হারালুম। আত্মহত্যার উপায় কল্পনা করছিলুম,—সেটা রুগ্ন মনের বিকৃত চিন্তা-বিলাস ছাড়া কি আর কিছু? পাঁউরুটিখানা ছিল প্রধান আশ্রয়, ওখানাকে উপলক্ষ

করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি, পাঁউরুটির ভেলায় ভেসেছি অকূলে। আমার পাঁউরুটি, কলুটোলার সরকারের দেওয়া মধুর পাঁউরুটি, লোনারসে ওখানা ছিল দীক্ষিত, আমি ছিলাম ওরই আশ্রিত, ওরই সুস্বাদের ভাবে বিভোর। পাঁউরুটিখানা যাওয়া মানে আমার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া,—কারণ আমি আমায় মোহজাল বুনে রেখেছি ওর তিন-চতুর্থ ভগ্নাংশের স্তরে স্তরে। সমুদ্রের একটি জলোচ্ছ্বাস সেদিন আমাকে সর্বস্বান্ত করে চলে গেল। এতকাল পরেও স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমার রুগ্ন চক্ষের লোনা জল সমুদ্রের লোনায় সে রাত্রে মিশে গিয়েছিল!

জলোচ্ছ্বাস বার বার উঠে এসে আঘাত করছে আমাকে, যাবার সময় টানছে প্রবল টানে। আঁকড়ে ধরে রাখতে পাচ্ছিনে খুঁটিটা, রোগা শরীরে শক্তি জোগাচ্ছে না। জাহাজ এ পাশে কাং হবার সময় খুঁটি ধরে ঝুলছি, ও-পাশে কাং হবার সময় খুঁটিতে মাথা ঠুকে মুখ গুঁজড়ে যাচ্ছে। নাকে মুখে, কানে লোনা জল ঢুকছে। একবার সে আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, আরএকবার পুঁতে ফেলতে চেষ্টা করে। ওপরের ডেক-এ কেউ নেই, জলের উচ্ছ্বাসে কারো থাকারও উপায় নেই, খালাসীরা কোথায় যেন সরে গেছে, আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘণ্টা বাজছে বার বার, সাগর গর্জন চলছে অবিশ্রান্ত, তেরপল ছিঁড়ে পড়ছে ঝড়-বৃষ্টির উন্মাদনায়,—আর তার মাঝখানে নিরুপায় বৃহৎ জাহাজখানা আহত মথিত উৎপীড়িত প্রতিহত হতে লাগলো।

খুঁটি আঁকড়ে ধরে দুই হাত এক সময়ে অবশ হয়ে এলো,—দেহের শক্তি নয়, ইচ্ছার শক্তি এক সময়ে শিথিল হয়ে আসতে লাগলো! ভাবলুম, হাতের শক্ত মুঠো আলগা করে দেওয়া মন্দ কি? আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওই দিকচিহ্নহীন অগাধ সমুদ্রের অনন্তহীন তলে,—কেউ খোঁজ পাবে না, কেউ ফিরেও তাকাবে না,—সেই মৃত্যু ত লোভনীয়। ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্তশয্যায় নারায়ণ,—সৃষ্টিকর্তা, —আর পাদপ্রান্তবাসিনী লক্ষ্মী,—সৃষ্টিরূপিণী! নারায়ণের নাভি থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে রক্তকমল। মন্দ কি! চলে যাবো সাগরের নীচের তলায়,—সেখানে মুক্তোর মণিকোঠা, সেখানে অপার্থিব জীবলোক,—সেখানে পাতালকন্যা আর মৎস্যগন্ধারা —অজস্র জলচর, অনাবিষ্কৃত মহাসভ্যতার সমাধি, সেখানকার তলায় তলায় কতকালের মানুষের অপরিতৃপ্ত স্বপ্নলোক আদিম নিদ্রায় নিঃসাড় হয়ে রয়েছে। আমি সেখানে নামবো পৃথিবীর সংবাদ নিয়ে, পারিজাত-কাননের সুখের বার্তা নিয়ে,—

আমি নিয়ে যাবো পৃথিবীর সুখদুঃখ দৈন্য আনন্দ নিয়ে, অনন্ত আকাশের আশা নিয়ে। আমিও থাকবো তাদের সঙ্গে; তাদের দলেরই দলী, তাদের বলেই বলী—শুধু আমার অপরিসমাপ্ত জীবন কামনা সূর্যলোকের পথ খুঁজবে অগাধ জলের নীচের থেকে উপর তলায়—সেই কামনা জেগে উঠবে রক্তকমলের মতো,—আকাশের দিকে, অসীমের দিকে তার প্রাণক্ষুধার মতো। তরঙ্গে তরঙ্গে টলমল ক'রবে সেই রক্তকমল।

প্রবল ঢেউ এবার ডেকের উপর উঠে আমাকে ধাক্কা দিয়ে হাত দুখানা খুঁটির থেকে ছিঁড়িয়ে নিল। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। আছাড় মারলো আমাকে ডেক-এর রেলিংয়ের ধারে,—আমি সরীসৃপের মতো মাটি আঁচড়ে উপর দিকে ওঠবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু জাহাজখানা রোলিং করে আবার আমার দেহটা গুঁজড়ে দিল ওই রেলিংয়েরই ধারে। জীবনটা কিছুতেই যেতে চায় না, সংগ্রামটা কিছুতেই ফুরোয় না। মুখ দিয়ে কি নির্গত হচ্ছে,—ফেনা?—না আমারই আর্তস্বর? অন্ধকারে চোখ বেয়ে কী গড়ায়,—লোনা জল? না রক্ত? বা'র বা'র হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় রেলিংয়ের দিকে, বার বার সরীসৃপের মতো মুখে থুবড়ে মাটি আঁচড়ে উপর দিকে বুকে হেঁটে আসি।

এমন সময় একজন খালাসী কোথা থেকে যমদূতের মতো এসে হাজির। আমার গলার কাছে কোটের বোতামশুদ্ধ মুঠটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল হোল্ডের সিঁড়ির কাছে—যেন মস্ত রুই মাছের কান্‌কোর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলা, টুঁটি টেনে ধরা। সেজমাসিমা রাগ করে তাঁর পুত্রবধূর উদ্দেশে বলতেন, ওর কলাসিটা টেনে ছিঁড়লে তবে আমার রাগ যায়।

হোল্ডের মুখে নিয়ে গিয়ে খাড়াই সিঁড়ির ধারে রুষ্ট খালাসীটি আমাকে সহসা নীচের দিকে ঠেলে দিল। জাহাজ প্রবল দোলায় দুলছে,—আমি ব্যাধিগ্রস্ত,—ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হোলো না। টাল সামলাতে না পেরে গড়াতে গড়াতে ছিটকে গিয়ে পড়লুম নীচের তলাকার কতকগুলি লোকের ঘাড়ে। আমার ভাগ্যে তখন আরো কিছু বাকি ছিল।

দিদিমা কথায় কথায় নিজের ভাগ্যকে স্মরণ করে বলতেন, ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে, অপরংবা কি ভবিষ্যতি। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও মানুষের একটা ভাগ্য থেকে যায়। কোনো একটি ব্রাহ্মণ গোমতীর তীর

থেকে উক্ত মৃত ভবঘুরের মাথার খুলিটিতেউক্ত ভাগ্যলিপি পাঠ করে পরীক্ষার জন্য ঘরে এনে রেখে দিয়েছিল, ব্রাহ্মণী সেটি দেখে ঘর ঝেঁটিয়ে কোন্ জঞ্জালে ফেলে দিল। জঞ্জালেই তার চরম অবসান। সুতরাং জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের দিব্যচক্ষু লাভ ঘটলো।

আমি যাদের ঘাড়ের ওপর পড়েছিলুম, তাদের একটি হোলো জনৈক উৎকলবাসী, অপর জন হলো কাবুলিয়ালা। উড়িয়াটির উত্থানশক্তি ছিল না, সমুদ্র পীড়ায় সে অনড়। তবে আঘাতের শোধ নিল সে আমার উপর পদাঘাত করে এবং সুমধুর ভাষায় পিতৃমাতৃ উচ্চারণ ক'রে। দ্বিতীয় পদাঘাতের ভয়ে আমি তার পায়ে হাত বুলিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম, লাগেনি ত? কিন্তু এপাশে সেই মুহূর্তে যে আমার উপর একটি বজ্র উঁচিয়ে ছিল, সেটি লক্ষ্য করিনি। সহসা কাবুলিওয়ালার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে আমি দিশাহারা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম! তখনই জ্ঞান হারালুম কিনা, মনে মনে আপন চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করতে লাগলুম! ওরা বোঝেনি, সে যুগটা আমার মৃত্যুসাধনার যুগ; ওরা বোঝেনি—সেদিনকার উৎপীড়িত মানবাত্মার প্রাণের ভাষা শোনার জন্য জলকল্লোলের দিকে আমি কান পেতেছিলুম। ওরা বোঝেনি, আমার শরীরের ওপর আঘাত আমার মনের দরজায় গিয়ে পৌঁছয় না। আমি মার খেয়ে কাঁদিনে, শুধু বর্বরতার অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপটিকে স্পষ্ট চক্ষে দেখে নিতে চাই।

দিদিমার কথা কান পেতে শুনেছি, অপরংবা কি ভবিষ্যতি। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালার যে মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল একথা অল্পক্ষণ পরেই জানলুম। সে আমার মাথা থেকে প্রথমে একমুঠো চুল টেনে ছিঁড়ে নিল। তারপর এত অল্পে খুশী না হয়ে আমার পিঠের উপরকার মাংস কয়েকটা স্থূল আঙুলের সাহায্যে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করলো। চেষ্টা ফলবতী হোল না। সুতরাং সে আমার গলার কাছে একটা চাপড় বসালো। কাবুলিওয়ালার হিংস্রতা প্রকাশ করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়, আমার জন্য তার পায়ের ওপর কিছু আঘাত লেগেছিল একথা আমি ভুলিনি, ভুলবোও না। তারা স্বাধীন জাতি, আঘাতের বদলে আঘাত করতে তা'রা জানে বৈকি। এক সময় মুখ তুলে দেখি, লোকটা ফিক ফিক করে হাসছে, কিন্তু সে-হাসি যে পুনর্বার প্রহারের কলাকৌশল খুঁজছিল, এটি পরমুহূর্তেই জানলুম। সে আমার কানের কাছে জুলপির লোমগুলি ধ'রে টেনে ছিঁড়লো,—পরবর্তী কালে দু'মাস

আমার সে ঘা শুকোয়নি। দেশে ফিরে আবিষ্কার করেছিলুম, আমার মুখে, মাথায় পিঠে, হাতে—বড় বড় কালশিরার সবুজ দাগ। আমি নিরপরাধ অথবা নিরীহ প্রকৃতি—এ বিচার করার দায় সেই কাবুলিওয়ালার ছিল না। কিন্তু প্রহারের বিরুদ্ধে আমি যে প্রতিরোধ করিনে, প্রতিশোধ নিইনে, অভিযোগ জানাইনে, অপমান আর লাঞ্ছনা নিঃশব্দে সহ্য করি মুখ বুজে,—এটি তার পক্ষে কম সুযোগের কথা নয়। আশে পাশে সবাই সমুদ্র-পীড়ায় অনড়, অচেতন; নীচে প্রহরী কেউ নেই, প্রতিবাদ জানাবার লোক নেই,—পার্শ্ববর্ত্তী কারো মৃত্যু ঘটলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না; জাহাজের দোলায় চোখ খুলে তাকালে বমির বেগে কপালের শির ছিঁড়ে পড়ে,—এমন অবস্থায় একজন প্রতিরোধশক্তিহীন ব্যক্তিকে যথেচ্ছ উৎপীড়ন করার সুবিধা এবং স্বাধীনতা কাবুলিওয়ালাটি ত্যাগ করতে পারলো না!

রাত তখন গভীর। হয়ত বারোটা, হয়ত বা দুটো। লোকটার অবিরাম বর্বরতা আর উৎপীড়ন-কৌশল অব্যাহতভাবে চললো সমস্ত রাত ধ'রে। আমার নড়বার অথবা সরে যাবার কোনো জায়গা আশেপাশে ছিল না। কেবল সেই উৎকল-বাসীটি আমার পিঠের উপর তার একখানা পায়ের গোড়ালি রেখে নিজের বমির যন্ত্রণায় আমার পিঠের উপরেই বা'র বা'র পা ঠুকতে লাগলো।

যারা যোগনিদ্রায় বসে তারা কে? কে তারা, যারা দেহের চেতনাকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দেয়? কে তারা, যারা প্রাণমন্দিরে অধিষ্ঠিত থেকে একাগ্র তপস্যায় এক এবং অদ্বিতীয়কে নিরীক্ষণ করে উদ্ভাসিত সমগ্র সত্তায়? দেহচৈতন্য কি তাদের কিছু নেই? কিন্তু আমিও যে সেই আত্মভোলা সন্ন্যাসী। সেদিনকার সেই আঠারো বছরের ভূগোলের ভালো ছাত্র আমি—আমিও অনুভব করেছিলুম আমার হিমাদ্রি জটায় বয়ে যায় সিন্ধু আর ব্রহ্মপুত্র, ললাটে ধারা বয় গঙ্গা-যমুনার, হৃদয় প্লাবিত হয় গোদাবরী আর নর্মদার জলকল্লোলে,—কন্যাকুমারিকা আমারই পদ-প্রান্তে লুটোপুটি করে তার কৃষ্ণা-কবরী এলিয়ে। সরস্বতী আমার জীবনের মূল-মন্ত্র! আর আমার দেহের দুই পারে আনন্দের অশ্রুসাগর। আমি যে গাঙ্গেয়!

মিথ্যে নয়, ছোট থেকে কল্পনা করেছিলুম একটা বড় জীবন। সর্বব্যাপী সমগ্রতায় যেটা পরিপূর্ণ; যে জীবনটা বিরাট। আমি বনস্পতির মতো হবো—শত সহস্র পাখী বাসা বেঁধে থাকবে আমার শাখা প্রশাখায়। হিমালয়ের মতো হবো—যার বিশাল

ব্যাপকতা মানব-কল্পনার অতীত। লোকবসতি গড়ে উঠবে আমার স্তরে স্তরে, আমার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। আমার দেশের সকল নদীতে আমারই প্রাণ-ধারা প্রবাহিত হবে; মাটির তলায় থেকে আমিই মন্ত্র জোগাবো বীজ থেকে অঙ্কুরে, ফুল থেকে ফলে। অগণ্য আর অসংখ্যের ভিতরে ভিতরে আমার অস্তিত্বকেই জাগিয়ে তুলবো, আমার শক্তিই সঞ্চারিত করে দেবো, আমিই জপের আসনে বসে থাকবো জনসাধারণের অন্তরে অন্তরে। আমার অন্তর্লোকে যে বিশাল সমুদ্র, যার প্রতি মুহূর্তের রাশি রাশি চিন্তা ও ভাবনা অবিরাম তরঙ্গদলের মতো নিত্য উচ্ছ্বসিত,—আমি তার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রকে মন্থন করে তুলবো। একটা বিরাট চরিত্র,—অভিব্যক্তির পিপাসায় যেটা জর্জর, মুক্তির ক্ষুধায় যে উন্মাদ, স্বাধীনতার বাসনায় যে চিরচঞ্চল। একটা সর্বনাশা চরিত্র,—ব্যবস্থা আর শৃঙ্খলাকে চূর্ণ করে যে দাঁড়িয়ে ওঠে, নূতন জীবন-আদর্শের যে স্বাদ আনে, প্রচলনের ভিত্তিকে যে কাঁপিয়ে তোলে। একটা মহৎ বিপ্লববাদী,—সমুদ্র মন্থন করে যে তুলবে গরল, বিষপান করবে জনসাধারণের কল্যাণে,—রাজবুদ্ধিকে যে নষ্ট করবে, লোভীকে সংস্কৃত করে তুলবে, সম্পত্তিবাদকে ধ্বংস করবে, নতুন জীবনবেদকে প্রতিষ্ঠিত করবে, দুষ্কৃতির বিনাশের আয়োজন করবে। আমি চেয়েছিলুম সেই মহৎ উদার বর্বরতা, চেয়েছিলুম সেই সর্বনাশা কালাপাহাড়কে—বাইরের সব মন্দির ভেঙে দিয়ে প্রাণমন্দির প্রতিষ্ঠায় যে সাহায্য করবে। ভাবছিলুম, কবে একটা বর্বর জলস্তম্ভ সমুদ্রের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে পুরাতন ইতিহাসকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে? প্রবলের হাতে দুর্বলের উৎপীড়ন কবে শেষ হবে? হাজার হাজার বছরব্যাপী বলবানের ক্ষমতাপ্রিয়তার কবে হবে অবসান? নিরীহ যারা, নির্বোধ যারা, নিরুপায় যারা—তাদের জন্য ন্যায় বিচারের তোরণদ্বার খুলবে কবে? এই যে আমার সর্বাঙ্গে নির্দয় আঘাতের চিহ্ন আঁকা, এ যেন অগণিত যুগ-যুগান্তরের উৎপীড়িত মানবাত্মার ক্ষতচিহ্ন আমি ধারণ করে রয়েছি। আমার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে যেন সকল যুগের ইতিহাস আর সভ্যতার পাতা উলটে গেছে। যারা মার খেয়েছে কালে কালে, যারা মূঢ় নির্বোধ চেতনাশক্তিহীন, যারা অজ্ঞান অন্ধ, অনড়—যারা বঞ্চিত প্রতারিত অবহেলিত, যারা সেবা করেছে অনেক—অপমান ফিরে পেয়েছে তার চেয়েও বেশি,—আজ এই জাহাজের খোলের মধ্যে প্রহার-জর্জরিত হয়ে তাদের কথাই ভাবছি। মাথা উঁচু করতে গিয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যারা নতশির,

তাদের কথাই ভাবছি। তাদের কথা ভাবছি যারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জানে না, লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে পারে না, অন্যায়ের অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিচারের দরবারে যাদের আলো নেই, আশা নেই, ভাষা নেই,—তাদের কথাও মনে পড়ছে। যারা রোগে মুখ থুবড়ে মরে, যারা উপবাসে মরে ভাগ্যের প্রতি দোষ চাপিয়ে, রাষ্ট্রচক্রান্তের প্রবল দোহনে যারা শুকিয়ে রক্তহীন হয়ে মরে, স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির পায়ের তলাকার চাপে যারা বিনা প্রতিবাদে রুদ্ধকণ্ঠে মরে,—তাদের কথাই বার বার ভাবছি।

কিন্তু কাবুলিওয়ালার তাড়না থেকে আমার সহজে নিষ্কৃতি ছিল না। চেষ্টা করেছিলুম হামাগুঁড়ি দিয়ে তার নাগালের বাইরে যেতে। কিন্তু কোথাও সরে যেতে গেলে অন্তত পনেরোটি লোকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যেতে হয়,—এক ইঞ্চি জায়গা কোথাও খালি নেই। উড়িয়ার একখানা পা ছিল আমার পিঠের উপর, কিন্তু আমার ডান পা খানা ছিল বোধকরি তার নাকের ডগায়, এক সময় বমির যন্ত্রণায় সে আমার পায়ের উপরে বন্যজন্তুর মতো সহসা এক কামড় বসালো। আমি যন্ত্রণায় তখনই পা সরিয়ে নিলুম বটে, কিন্তু অপর একটি অচেতন প্রাণীর মাথায় হাঁটুর ঠোকা লাগলো। সুতরাং বহু মানুষের সেই বিগলিত রুগ্ন ক্লিন্ন কতকগুলি দুর্গন্ধ দেহের স্থূল মাংসলতার মধ্যে বন্দী হয়ে আকণ্ঠ ঘৃণায় আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু নড়বার চেষ্টা করতেই কাবুলিওয়ালার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত আমাকে আবার নিরস্ত করে দিল। পরদিন সকালে লক্ষ্য করেছিলুম, আমার নাকের ভিতর থেকে রক্ত গড়িয়ে এসেছিল।

জাহাজের দোলা, জাহাজের এ-কাৎ ও-কাৎ হওয়া—আমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না। শুয়ে শুয়ে একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর হিঁচড়ে উঠে পড়ছে। কেউ নড়ে যাচ্চে, কেউ যাচ্ছে গড়িয়ে, কেউ পিছলে সরে যাচ্ছে। একটা শরীর আর একটা শরীরের ধাক্কায় আহত হচ্ছে। যেমন জন্তুরা যায় খাঁচার মধ্যে, যেমন হাঁস-মুরগীরা যায় বদ্ধ চেঙ্গারিতে,—তেমনি এখানে মানুষ। এরা জীব, জীবন নয়। এরা দেহ, প্রাণ নয়। এরা বস্তু, কোনক্রমে এদের জলে ভাসিয়ে তীরভূমিতে পার করে দেওয়া। এদের মৃত্যু ঘটলে খাতায় এদের সংখ্যা উঠবে, নাম উঠবে না। আমি এদেরই একজন, এদেরই মতন, এদেরই দুঃখ-দৈন্য, যন্ত্রণা আর উৎপীড়নে আমিও ওলোট-পালট খাচ্ছি। আমি এদেরই এক সংখ্যা।

বোধকরি জাহাজের উন্মত্ততায় টাল সামলাতে না পেরে আমার হাতের একটা চোট লেগে থাকবে কাবুলিওয়ালার পিঠে,—চোটটা এমন কিছু নয়,—কিন্তু সে মনে করলো এটি আমার ইচ্ছাকৃত। অমনি এপাশ ফিরে একপ্রকার কুটিল হাসি হেসে সে আমার চুলের মুঠি ধরলো বেশ করে বাগিয়ে। মনে পড়ে গেল মামার উপর রাগ করে দিদিমা বলতেন, বেটার থুঁৎনিটা যদি বালির উপর রগড়ে দিতে পারতুম! দিদিমা পারেননি, কাবুলিওয়ালাটা পারলো অনায়াসে। আমার চুলের মুঠি শক্ত হাতে ধরে লোকটা আমার মুখখানা কাঠের মেঝের ওপর রগড়ে দিতে লাগলো অতি আনন্দে। বাধা দেবার শক্তি আমার ছিল না।

জাহাজের প্রবল দোলা, ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ড মাতামাতি, তরঙ্গের অশ্রান্ত দাপাদাপি, নৈশসাগরের ভীষণতা, বাতাসের বন্য গর্জন,—আর ভিতরে সবাই দুলছে, আছড়াচ্ছে, আর্তনাদ করছে, ওলোট-পালট খাচ্ছে, বমি আর বিষ্ঠায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। এদের মাঝখানে আমি—আমার পিঠের উপর উড়িয়া তার পায়ের গোঁড়ালি ঠুকে চলেছে অক্লান্ত, কাবুলিওয়ালা আমার রগের উপর আঘাত করে চলেছে অবিশ্রান্ত। সহসা মনে পড়ে গেল হিতোপদেশের কথা—'সদা সত্যকথা কহিবে। গুরুজনের নিকট মিথ্যা বলিবে না।' খড়্গপুরে যাবার নাম করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলুম আমেরিকার পথে। মিথ্যাকে গৌরবমণ্ডিত করতে পারিনি, সেইটিই ত সকলের বড় লজ্জা। কিন্তু লজ্জাই কি এর মধ্যে সব? একথা কি বোঝাতে পারবো না যে, জল আমাকে টেনে ছিল প্রচণ্ড টানে? আমি যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল দেখতে বেরিয়েছিলুম, একথা কি মিথ্যে? আমি কি শুধু অবাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, শুধু পালিয়েছি দেশত্যাগ করে, শুধু ভাগ্য অন্বেষণের পথে পা বাড়িয়েছি—এ ছাড়া কি আমার আর কোনো পরিচয় থাকবে না? আমরা দুই বন্ধু মিলে দেখতে বেরিয়েছিলুম জীবনকে, বৃহৎ লোকযাত্রাকে, অগণিত মানবগোষ্ঠিকে—আমাদের ছিল অবারিত মুক্তি আর স্বাধীনতার পিপাসা। ভাগ্য অন্বেষণটা আমাদের কাছে বড় ছিল না, ওটায় আমাদের একমাত্র প্রয়োজন ছিল না,—নিজেকে সম্পদশালী করার, ধনাঢ্য করে তোলার, বিলাস-ব্যসনপ্রিয় করার স্থূল লালসা একটুও ছিল না। স্বপ্ন দেখেছিলুম আমরা দুঃখজয়ী হবো, আমরা দুর্গম ও দুরারোহকে আয়ত্তের মধ্যে আনবো,—আমরা বিরাট হয়ে উঠবো, ক্ষমতাবান হবো। বর্মা, মালয়, শ্যাম, সিঙ্গাপুর—এই সব সামান্যর দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, এদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাবো, এই আমরা জানতুম। আমি

জানতুম অন্য কথা। আমি জানতুম, আমাদের মাণিকতলার খাল গিয়ে মিশেছে গঙ্গায়, বাগবাজার থেকে বেরিয়ে নিমতলার শ্মশানঘাট পেরিয়ে সেই জল চলে গেছে সাগরের দিকে। সেই সাগর ছুঁয়ে রয়েছে চীন থেকে জাপান, সেখান থেকে সান-ফ্রান্সিসকো। আমার বাড়ীর নালায় যে জল, সেই জল নহর বেয়ে গেল কতদূরে, সেখান থেকে নদীতে, নদী গেল সাগরে। আমি ঘরে বসে জাগ্রত চক্ষে দেখতে পেতুম, আমার বাড়ির নালার সঙ্গে যোগ রয়েছে লণ্ডনের সীমাবর্তী টেম্‌স্‌ নদীর, আমি দেখতুম ঠন্‌ঠনের জলের সঙ্গে যোগ দক্ষিণ সমুদ্রকূলের দ্বীপপুঞ্জের, আমি দেখতুম মাণিকতলার খাল আর আলাস্কার প্রান্তের সাগর একাকার। পৃথিবীর কোনো জল স্বাধীন একান্ত নয়। আকাশ পথ বেয়ে যে-জল আসে, যে-জল চলে মাটির তলায় তলায়, যে-জল খাল বিলে নদীতে তড়াগে হ্রদে সাগরে মহাসাগরে—সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। সেই জল আমাকে টেনেছে বার বার,—টেনেছে অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো। জলের নেশা ছেড়ে যত দূরে সরে গেছি, আমার দড়িতে টান পড়েছে, দড়ি ছিঁড়ে আমার প্রাণের নৌকা অকূলের দিকে পাড়ি দিয়েছে বার বার।

তন্দ্রা ঠিক নয়, অচেতন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছি। আমার অপরিসীম ধৈর্য্য লক্ষ্য করে কাবুলিওয়ালাটা শেষবারের মতো আমার পিঠে দু'চারটে কিল্‌ বসিয়ে সম্প্রতি নিরস্ত হয়েছে। সে আছে এক পাশে, উঁচু পাটাতনের ঠিক নীচে। পাটা-তনটার উপরে প্রায় দশ হাত লম্বা-চওড়া একখানা লোহার চাদর ঢাকা—ওগুলোর ওপর কিছু কিছু মালপত্র থাকে। কিন্তু লোহার চাদরখানা কোনোক্রমে সরালেই দেখতে পাওয়া যেতো জাহাজের নীচের তলা, প্রায় পনেরো ফুট গভীর নীচু। লোহার চাদরখানা অনেকটা যেন কৌটার ঢাক্‌নার মতো সাহায্য করছে। আমরা যেখানে আছি তার নীচেও যে আর একটা নীচের তলা রয়েছে, এটা আগে টের পাইনি। সেখানকার অবস্থা আমাদের অপেক্ষাও মন্দ, তারা বাস করছে সমুদ্র সমরেখার নীচে, অর্থাৎ জলের নীচে নিম্নতম খোলে। সেখানে আছে স্ত্রীলোক, শিশু, ভিখারী, মাড়োয়ারী, শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে শত শত মণ মালপত্র। এবারে আর গরু ঘোড়া মহিষ ছাগল ভেড়া ইত্যাদি দেখিনি। তাদের স্থলে আমরাই আছি।

রাত কত জানবার উপায় নেই, ভোর হতে কত বাকি তাও জানিনে। আমি এখানে আসার পর থেকে একটা সম্পূর্ণ দিন চ'লে গেছে কিনা তাও ঠিক নেই।

কতক্ষণ ধরে এখানে ওলটপালট খাচ্ছি, কতকাল ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি, তাই বা কে বলে? দু'ঘণ্টা হতে পারে, ছত্রিশ ঘণ্টা হলেও অবিশ্বাস করবো না। এটা রাত, না দিন; আলো না অন্ধকার; সকাল না সন্ধ্যা—কেউ জানে না। সবাই সামুদ্রিক পীড়ায় অনড়, মুমূর্ষু, হতচেতন। হাত পা কেউ নাড়ে না, পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতার অভাব, মাঝে মাঝে শুধু বমি করে আর্তস্বরে, মৃত্যুযন্ত্রণায়—আবার সেই বমির ওপরেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। চারিদিক চাপা, নিরেট, বায়ুবদ্ধ, কণ্ঠরোধী। ওদিকে চলেছে সমুদ্রের অবারণ রোলিং, তেমনি ঝড় আর বৃষ্টি, তেমনি জাহাজের একাৎ আর ওকাৎ হওয়া। আকাশ যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে বঙ্গসাগরে—বজ্রে, বিদ্যুতে, তরঙ্গে, উচ্ছ্বাসে, বৃষ্টির তাড়নায়—দিকদিগন্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে কেউ কাঁদছে, কেউ পেটের যন্ত্রণায় মাথা ঠুকে চীৎকার করে উঠছে, কেউ নাকখৎ দিয়ে আর একজনের পায়ে জড়িয়ে বলছে, বর্ষাকালে আর সমুদ্রে নামবে না। কিন্তু যার পায়ে ধরে শপথ করা হচ্ছে সেও কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বর্ষার বঙ্গসাগর বড় ভয়ঙ্কর।

দুজন খালাসী কি যেন কাজে নীচের দিকে নেমেছিল। তারা স্বাস্থ্যবান, প্রফুল্ল, স্বচ্ছন্দ,—যেন দেবদূত নেমে এলো উপর থেকে। তাদের কথাবার্তায় বিস্ময়বোধ করে চোখ বুজে রইলুম। শুনলুম আগামী-কাল মঙ্গলবার জাহাজ পৌঁছবে ডায়মণ্ড হারবারে। মনে মনে হিসেব করে দেখলুম, কাল রাত প্রায় দুটোর থেকে এখানে পড়ে আছি। কখন ভোর হয়েছে, কখন গেছে সকাল আর মধ্যাহ্ন আর বিকাল বুঝতে পারিনি,—এখন নাকি গভীর রাত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি দিন আমাদের চেতনা থেকে লোপ পেয়ে গেছে। আমরা সবাই মূঢ়।

সেই রাত্রে কাবুলিওয়ালার ইতিহাসের বৈচিত্র্য আর কিছু পাইনি। তবে মাঝে মাঝে সে তার মাতৃভাষায় গান গেয়ে উঠেছিল এবং আমার আধমরা পিঠখানার উপরে সে তবলার বোল সেধেছিল। সংগীত শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি কতখানি ছিল জানিনে, সুরের সাধনা কবে থেকে সে করে এসেছে তাও আমার অজ্ঞাত, তবে গান গেয়েছিল সে ভালোই—সবাইকে সে জাগিয়ে তাতিয়ে তুলেছিল; আধ-মরাদের ঘা মেরে সে বাঁচিয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। বিস্ময়ের কথা, উড়িয়াটা অবধি উঠে বসেছিল তা'র কণ্ঠস্বরে। অবশেষে এক মাড়োয়ারি কাঁচা ঘি আর বাসি রুটি দান করে কাবুলিওয়ালাকে তখনকার মতো শান্ত করলো। কাবুলিওয়ালা সেই কাঁচা ঘি সহ-

যোগে বাসি রুটি চিবিয়ে এক সময় ভয় দেখালো, যদি তাকে এখনই তামাক দেওয়া না হয় তবে আবার সে প্রাণের আনন্দে গান ধ'রে দেবে। আমার ইচ্ছা হোলো, মাঝ সমুদ্রে এখনই জাহাজ থামিয়ে সাঁতরে কোনো দেশে উঠে গিয়ে তার জন্য তামাক এনে দিই। সে আমাকে যদি আবার উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে তাও সইবে,—কিন্তু তা'র কণ্ঠসংগীত! এবার থেকে ঈশ্বরেও বিশ্বাস করবো যদি তিনি ওর সুবুদ্ধি দেন! কিন্তু হায়, সাঁতার জানিনে, তাই চুপ করে পড়ে রইলুম।

কাবুলীটা খিঁ খিঁ ক'রে হাসতে লাগলো। তার সামনের গোটা দুই দাঁত কে যেন কবে কোন্ কারণে ভেঙ্গে দিয়েছিল। আশ্চর্য, তার বাকি ক'টা দাঁত আজও অক্ষত রয়েছে।

তামাক তাকে কেউ দিল না, সুতরাং পুনরায় সে গান ধ'রে দিল হাসিমুখে। দিদিমা বলতেন, পথে গান পায়, হরিনাম গায়! কাবুলী তার মাতৃভাষায় হরিনাম গান করতে লাগলো কিনা জানিনে, কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে রইলুম, সমে এসে ওর হাতের প্রচণ্ড তেহাইটা আমার দুর্বল পিঠে পড়ে কিনা। কিন্তু পড়লো না, বোধ করি, দয়াল হরি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিলেন।

সমুদ্রের রোলিং থামলো, তখন ভোর হয়ে গেছে। আশ্চর্য, সবাই এবার নড়ে উঠে বসেছে। আমি উঠতে পারছিলুম না,—আমার জ্বর ছিল বেশ। তা ছাড়া প্রহারের ফলে সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। মাথা নাড়তে পারিনে, হাত দুখানা নড়তে চায় না, জুল্‌পির পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে, মাথার এক পাশে ঘা ফুটেছে, পিঠে ব্যথা—এখানে ওখানে কালশিরার ফুলো, মুখের ওপরে কাবুলীর পাঁচ আঙ্গুলের চাপড়ের ফলে এখনও জ্বালা করছে। ভেবেছিলুম, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবো, এই উৎপীড়নের প্রতিকার করবো। কিন্তু পুলিশ! পুলিশের কথা থাক্।

আমরা কোনোদিকে দেখতে পাচ্ছিনে বটে, তবুও সকাল হয়েছে। মেঘমলিন সকাল। রোলিং আর নেই, ঝড় শান্ত, জাহাজ আর কাৎ হয়না কোনদিকে,—দুর্যোগ কেটে গেছে। সকাল হয়েছে বাইরের সমুদ্রে, আকাশে রক্তিম ঘোষণা জেগেছে, সাত ঘোড়ার রথে চড়েছেন সূর্যদেব—কিন্তু এমন সকালকে অভিনন্দন জানাবো কোথা দিয়ে? এই ক্লিষ্টক্লিন্ন অন্ধ গহ্বর থেকে আমার হৃদয় ছুটে গেল নিমতলার সেই গঙ্গাতটে। সেখানে মা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পট্টবস্ত্রে। প্রভাত সূর্যের দিকে চেয়ে বলছেন, "জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং

প্রণোতোঽস্মি দিবাকরং, শ্রীসূর্যায় নমঃ, নারায়ণায় নমস্তুতে।"—মায়ের চোখ দুটো কাঁপছে স্তববন্দনায়; নিরুদ্দেশ সন্তানের কল্যাণ কামনায় অশ্রু-ভারাক্রান্ত তাঁর দুই চোখ। গঙ্গার নির্মল গৈরিক প্রবাহে ভেসে চলেছে তাঁর হৃদয়ের আকুল ভাবনা—সেই অশ্রু-উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদে জাহ্নবীতে লাগলো বেদনার জোয়ার,—তারই কাঁপন এসে লাগলো যেন এই জাহাজে।

এই জাহাজে কেন রেখে যাবো অভিমান? দুর্বলের চিত্তক্ষোভ কেন রেখে যাবো কাবুলির প্রতি? কেন অভিশাপ দিয়ে যাবো উৎকলবাসীকে? আঘাতের কথা, প্রহারের কাহিনী একদিন ভুলে যাবো, অপমান আর লাঞ্ছনার ইতিহাস তলিয়ে যাবে একদিন বিস্মৃতির অন্ধকারে,—এরা শুধু থেকে যাবে আমার কল্পনায়। দয়া, মনুষ্যত্ব, আদর্শ, মহত্ব, আনন্দ, পরার্থপরতা—এরা অবশ্যই আছে সংসারে,—আমি যদি বর্বরতা আর স্বার্থপরতা দেখে থাকি, আমি যদি দেখে থাকি দুঃখবাদ আর বেদনা, আর নৈরাশ্য, যদি শুধু জেনে থাকি মানুষের হীনচিত্তের বিকার, অন্যায়ের রাজবেশ, পাশবের শক্তিমত্তা,—সে আমার নিজেরই দেখার দোষ। এদের কোনোদিন ভুলবো না, তাইতেই ত' এদের মহৎ মূল্য স্বীকার ক'রে গেলুম! এদের অপরাধ ক্ষমা করবো না কোনদিন, একথা জানিয়ে যাবার আগে কেন নিজেকে ছোট ক'রে যাবো? না, সে আমি পারবো না কিছুতেই।

কিন্তু আমি না পারলেও,—যে শক্তি আমাকে অন্ধের মতো অকূলে টেনে এনেছে, সেই শক্তিই ভ্রূকুটি করে দাঁড়ালো কাবুলিওয়ালার প্রতি। আমি তাকে ক্ষমা করবো, কিন্তু আমি কে? আমি কতটুকু? আমার এই অহংকার কেন? রণ-ক্ষেত্রের রথের উপর দাঁড়িয়ে পার্থসারথী বলেছিলেন, ওরে আত্মাভিমানি, তোর শক্তি কতটুকু? তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দয়া, মোহ, কৃপা, বিচারবোধ—তার দাম যে এক কানাকড়িও নয়। তোর ক্ষমা, তোর তিতিক্ষা, তোর ঔদাসীন্য—কিন্তু তুই কতটুকু? ওদিকে যে নিঃশব্দ বেদনায় সন্তান-বিচ্ছেদাতুরা বিধবা জননীর প্রাণের মন্ত্র করুণ বেদনায় নিত্য উচ্চারিত হচ্ছে,—অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যেঽনলে সাগরে···

আর এই দেবভূমি ভারতের আদিম যুগের সেই মহাকালের রথচক্রঘর্ঘরের উপরে দাঁড়িয়ে চিরসারথী ব'লে চলেছেন—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—সম্ভবামি যুগে যুগে!

বিকৃতমস্তিষ্ক কাবুলীওয়ালা পাশের উঁচু পাটাতনের উপর চড়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেছিল। বোধ করি সে একটু দুরন্তপনাই করে থাকবে,—সহসা লোহার সেই চাদর খাপ থেকে পিছলে উল্‌টে গেল। একটি পলক মাত্র, তারপরই কাবুলীওয়ালা সেই গহ্বরের মধ্যে নিরুদ্দেশ। সকলে হাঁ হাঁ হৈ চৈ ক'রে উঠলো। নীচের তলায় মেয়ে-ছেলে, শিশু, বৃদ্ধ, সবাই শুয়ে, পনেরো ফুট উপর থেকে কাবুলী যদি তাদের উপর পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। আমরা সবাই হন্তদন্ত হয়ে উঠলুম। দেখি, সে নীচের তলায় পড়েনি, লোহার চাদরের মোটা পাড় ধ'রে সে মাঝশূন্যে ঝুলছে। কিন্তু তা'র নাগাল পাবার উপায় কারো ছিল না। কাবুলীওয়ালাটা চীৎকার করছে প্রাণভয়ে।

চীৎকার ও কলরোলের খবর পেয়ে জনৈক খালাসী ছুটে এসে ঘটনাস্থলে দাঁড়ালো। সহসা লোকটাকে বাঁচাবার কোনো পন্থা খুঁজে না পেয়ে খালাসী উঠলো পাটাতনের পাড়ে, সেখানকার কার্নিশের বিপদজনক ধার ঘেঁষে গিয়ে সে এক হাতে কাবুলীকে ধরলো,—তারপর কৌশলে তাকে পাড়ের কাছে এনে হিঁচড়ে টানতে লাগলো দুই হাতে। কিন্তু লোহার পাড়ের ধার ছিল ধারালো। উত্তেজনার সময় হিঁচড়ে টানতে গিয়ে কাবুলীটার কাঁধের কাছটা গিয়েছিল বেধে এবং সেই অবস্থায় গায়ের জোরে টেনে তাকে যখন তোলা হোলো, আমরা সবাই ভীত আতঙ্কিত চক্ষে চেয়ে দেখলুম তার পিঠের প্রায় দেড় ফুট চামড়া ছিঁড়ে কুটে কেটে মাংস ঝুলে পড়েছে। তার পিঠের রক্ত ছেঁড়া জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে আমাদের উপরতলা থেকে নীচের তলায় ঝর ঝর ক'রে গড়িয়ে পড়ছে। লোকটা শক্তিমান,—জ্ঞান হারায়নি। কিন্তু তাকে ধরা-ধরি ক'রে শুইয়ে দেওয়া হলো। মেঝের উপর দিয়ে রক্তের ধারা বইছে নালার দিকে। আমার আশ্রয় ছিল তার কাছাকাছি, সুতরাং তার পিঠের গলিত ছিন্নভিন্ন বীভৎস মাংসপিণ্ডের চেহারাটা আমাকেই স্পষ্ট দেখতে হোলো।

আমি? আমি বসে বসে কাঁপছি ঠক্ ঠক করে। ভুলে গেলুম আমার নিজের যন্ত্রণা, আমার ক্ষত, আমার লাঞ্ছনা আর অপমান। ভুলে গেলুম, আমি দেশের কাছাকাছি পৌঁছেছি, আমি প্রিয়জনদের ফিরে পাবো শীঘ্রই। ভুলে গেলুম, সমস্ত দুদিন ধ'রে লোকটা পশুর মতো আমাকে অহেতুক পীড়ন করেছে। এবারে তার নিজের অসহনীয় বীভৎস যন্ত্রণা, তার করুণ কাতরোক্তি, তার প্রলাপজড়িত আর্ত-স্বর—সেদিকে চেয়ে ঝর ঝর করে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। এত বড় অভিশাপ তাকে আমি দিইনি, এতখানি শাস্তি তার আমি কল্পনাও করিনি!

জাহাজ এবার শান্তভাবে ভেসে চলেছে। যাত্রীরা প্রায় সবাই চেতিয়ে উঠেছে, তাদের শরীরের যন্ত্রণা আর নেই। অনেকে জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধি আরম্ভ ক'রেছে। অনেকে টলতে টলতে উঠে সিঁড়ি বেয়ে আপার ডেক-এ উঠে যাচ্ছে। আমি নিজেও উঠে দাঁড়ালুম ধীরে ধীরে। শরীর দুর্বল, জর রয়েছে, বুকে শ্লেষ্মার ব্যথা, সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন। মাথায় রগে ক্ষত—তবু কাঁপতে কাঁপতে দেয়াল ধ'রে ধ'রে আমিও গিয়ে উঠলুম আপার ডেক-এ। আমরা গঙ্গাসাগরের মোহানার ভিতর এসেছি।

তীরভূমির অস্পষ্ট মলিন রেখা যখন দৃষ্টিগোচর হোলো, যাত্রীদের ভিতরে সে কী উত্তেজনা! বাঁচবার আশা কেউ করেনি, জাহাজডুবি সম্পর্কে সবাই নিশ্চিত ছিল, ঝড়ের সমুদ্র যে আবার শান্ত হবে—এ ছিল কল্পনার অতীত। এখন সেই সব মৃত্যু-পথযাত্রীরা গানে গল্পে তামাসায় আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠলো। ঘন সবুজ তীরভূমির রেখা যে কত আপন, কত বড় আত্মীয়—এ যেন দেখে নিলুম। জীবনের আশা আবার জেগে উঠলো।

সবাই তীরভূমির ইসারা খুঁজে পাচ্ছে, কিন্তু আমি কি আর কূল খুঁজে পাবো? আমার কুল হারালো, ঘর হারালো, পথ হারালো। যার লক্ষ্য কিছু নেই, সেই ত' ভেসে বেড়ায় এঘাট থেকে ওঘাটে, একূল থেকে ওকূলে, তারপর অকূলে। জলের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ কি আমাকে স্থির থাকতে দেবে? আমার দেহের শত শত শিরা উপশিরাগুলি যেন অসংখ্য নদীর মতন—তারা নিত্য প্রবাহিত, আমার হৃদয় সমুদ্রে তারা নিত্য আছাড়ি পিছাড়ি খায়,—আমার প্রাণকল্লোলের সঙ্গে জলকল্লোল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমাকে সেই কল্লোল কি স্থির থাকতে দেবে কোনোদিন? নৌকা কি ঘাটে ভিড়ে থাকবে শান্ত হয়ে? মরণের ডাক কি আবার তাকে ডেকে নিয়ে যাবে না?

কালিঝুলিমাখা নোংরা শরীরে এবং তার চেয়েও নোংরা জামাকাপড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে কতকটা যেন নিজেকে আমি বশে আনলুম। আমার পুঁটলিটা খুঁজে পেলুম অনেক পরিশ্রমে। সেটা জলে ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। আমার কোটের ভিতর-পকেটটা এবার অনুভব করলুম; সেখানে ষোলখানা এক টাকার নোটের গোছাটা ভিজে থক্ থক্ করছে। মনে পড়ে গেল আমি বিনা টিকিটে যাচ্ছি। কিন্তু

ওদিকে আর ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই, আমি এসে পড়েছি আবার আমার প্রিয় গঙ্গায়। দুই পারে মাঠ, অরণ্য, গ্রাম, আঁকাবাঁকা পথ—আমার রুগ্ন চক্ষু ওদের উপর দিয়ে যেন প্রিয়জনের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে চলেছে। অপরিচিত জনপদ, অজানা গ্রাম, —তবুও উপলব্ধি করে চলেছি ওরা আমার যেন কল্পকল্পান্তরের আত্মীয়, ওরা আমার শাশ্বতকালের আনন্দের প্রতীক্। এক জায়গায় ক্লান্ত হয়ে বসে নিমীলিত চক্ষে আমি তাদের দিকে তাকিয়ে প্রাণের প্রবাহ বুলিয়ে চলেছি।

দেখতে দেখতে রোদ উঠলো, বেলা উঁচু হোলো, গরম হয়ে উঠলো জাহাজ, যাত্রীরা চঞ্চল হোলো, মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে এলো। আমরা বদরতলা পেরিয়ে শিবপুর আর শালিমার ছাড়িয়ে খিদিরপুরের ডক পাশে রেখে আউটরাম ঘাটের দিকে মন্থরগতিতে এগিয়ে গেলুম। আবার দেখা যাচ্ছে আমাদের কলকাতার সব প্রিয় চিহ্ন, আবার যেন হারানো বন্ধুদের খুঁজে পেলুম। একথা ভুলিনি আমার প্রথম কর্তব্য, রবির বাড়িতে খবর দেওয়া, তার কাছে টেলিগ্রাম করে আজকেই টাকা পাঠানো; তা'র চিঠিখানা পৌঁছে দেওয়া! কিন্তু একথা ভয়ে ভয়ে ভাবছি, ভাবছি। কেমন করে এই মুখ নিয়ে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো।

আউটরাম ঘাটে এসে জাহাজ ধীরে ধীরে ভিড়লো, বেলা তখন দুটো। জাহাজ থেকে যখন জেঠিতে নামলুম, তখন পা ঠিক রাখতে পাচ্ছিনে। আমি তীর খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু আমার পা দু'খানা আর চোখ দুটো যেন এখনো এসে পৌঁছয়নি। মনে হচ্ছে আমার পায়ের মধ্যে জলকল্লোল, চোখে জলোচ্ছ্বাস। আমার পা স্থির থাকছে না, টলছে, কাঁপছে, টাল সামলাচ্ছে। আমি যেন এখনও জাহাজে, এখনও তরঙ্গের চূড়ায়, এখনও সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের অশ্রান্ত দোলায়—আমার সমগ্র জীবনটাই যেন টলমল করছে, অধীর হয়ে উঠেছে জলের নেশায়। আমার ঘর, আমার পথ, আমার জীবন-মরণ, আমার ইহকাল পরকাল সমস্তটাই যেন জলে ভেসে সাত সাগরের পথে তলিয়ে গেছে!

একজন শিখ টিকিট চেকারের হাতে পনেরোখানা ভিজা এক টাকার নোট তুলে দিয়ে পুঁটলিটি খানাতল্লাসীর পর আমি গঙ্গার ঘাট ধরে চলে এলুম বাবুঘাটে। সেখানে পুঁটলিটি সিঁড়ির পাশে রেখে জ্বর ও শ্লেষ্মা সত্ত্বেও আমি মরিয়া হয়ে গঙ্গায় নেমে ডুব দিলুম।—সে যেন আমার আছাড়ি পাছাড়ি ডুব। ইচ্ছে হোলো, জাহ্নবীর এই ধারায় নিজেকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দিই। আমার যা কিছু সব ধুয়ে মুছে

যাক। ব্যাধি, গ্লানি, লাঞ্ছনা, অপমান আর কিছু না থাকে। ওরে ভাগ্যান্বেষী, তোর লোভ, তোর উচ্চাভিলাষ, তোর লাখ টাকার স্বপ্ন, তোর মনুষ্যত্ববর্জিত যত কিছু ইহলৌকিক বাসনা,—এই মধুর গঙ্গার নঃস্রাবিত প্রবাহে সমস্ত ভেসে চলে যাক্। তুই অনেক দেখেছিস, অনেক পেয়েছিস, অনেক জেনেছিস,—এবার আবার নতুন বিশ্বসৃষ্টির মন্ত্র এই জাহ্নবীর জলকল্লোল থেকে তুলে নিয়ে যা।

বাবুঘাটে সেদিন জনৈক উৎকলবাসী আমাকে দু'খানি বাতাসা, একটু আদা, আর কয়েকটি ছোলা খেতে দিয়েছিল। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ছয়দিন উপবাসের পর সেই আমার প্রথম খাদ্য।

*

* *

নদী যখন পাহাড় থেকে প্রথম নামে, তার জল এলোমেলো, নিজের পথ নিজে সে খুঁজে পায় না—পিছনের বেগটাই তাকে পথ খোঁজায়। আমার জলপথটাও ছিল অনির্দিষ্ট। সমুদ্র অভিযানের অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে আতঙ্কের মতো মনে হোতো, সেই কারণে ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি যেতেও যেন আর সাহস হোতো না। বেকার জীবনে সুবিধা পেলেই আমি গঙ্গার এপার ওপারে ঘুরে বেড়াতুম। খিদিরপুর ডক্ কিম্বা শিবপুরের বাগান, দক্ষিণেশ্বর কিম্বা বেলুড়, বারাকপুর কিম্বা শ্রীরামপুর, নৈহাটি কিম্বা চুঁচুড়া, শান্তিপুর কিম্বা নবদ্বীপ, ঘোষপাড়া কিম্বা ত্রিবেণী,—অর্থাৎ আনন্দ ছিল গঙ্গায়, এপার থেকে ওপারে। এপারে দাঁড়িয়ে দেখি, কী রহস্য আছে ওপারে, দূরত্বের অস্পষ্টতায় কী যেন ইন্দ্রজাল বোনা রয়েছে, দেখে দেখে ক্লান্ত চোখের আশা আর ফুরোয় না! আবার ওপারে গিয়ে দেখি, এপার কী যেন অর্থে ভরা। উত্তর-কালেও এই ছেলেমানুষী ছিল। এপারে মহাদেবপুর, ওপারে ভাগলপুর; মোকামা থেকে সামারিয়া, পাটনা থেকে পালেজা ঘাট, কাশী থেকে ব্যাসকাশী কিম্বা রামনগর, হরিদ্বারের ওপারে চণ্ডির পাহাড়। নদীর ধারে এদের বাসা, এরা আমারই মতো গাঙ্গেয়—আমার চোখে এদের বৈচিত্র্য কোনোদিন হারায়নি। আমার আনাগোনা ছিল এঘাট থেকে ওঘাট। কত বর্ষা নেমেছে, কত বৃষ্টি চ'লে গেছে, পথের ভাঙ্গন ধরেছে কোথায় কতবার, কিন্তু নদীর জল ফুরোয়নি—কূল ভাঙতে ভাঙতে চলেছে অকূলে।

মাঝখানে ইচ্ছে হোলো, সাঁতার শিখি। এত জলযাত্রা, এতবার, কিন্তু সাঁতার শেখা হচ্ছে না, এ বড় অন্যায়। এমন দিনে এক সমবয়স্ক বন্ধু জুটে গেল। ছেলেটির

নাম নরেশ। নরেশের মস্ত বদ অভ্যাস ছিল, পরের কাজ করা, পরের সেবা করা। কারো অসুখ হোলো, কারো বাড়ীতে মৃত্যু ঘটলো, কারো আহার জুটছে না,—অমনি নরেশ ছুটলো। আমি তাকে বাঁধতে চাইতুম নিজের গণ্ডীতে, কিন্তু বাঁধন কেটে পালাতো সে বার বার। সে বিড়ি খেতো যখন তখন, সিদ্ধি খেতো তা'র চেয়েও বেশী। তা'র রং ছিল ঘন কালো, তা'র চেয়েও কালো তা'র ঘন চুল।

আমাদের ভাড়াটে বাড়ীর রান্নাঘরের পিছনে পূবদিকে ছিল সাহাদের বড় পুকুর। রান্নাঘরের ছাদে উঠে আমরা গোপনে ছিপ ফেলে সেখান থেকে মাছ ধরতুম! সে-পুকুরে নামবার ঘাট ছিল না আমাদের এপারে! নরেশ বললে, তা হোক, এই পুকুরেই তোমাকে সাঁতার শেখাবো।

ওদের বাড়ীর রোয়াক থেকে পা ঝুলিয়ে সেই পুকুরে নামতে হয়। আমাদের মধ্যাহ্ন স্নান ছিল ওই পুকুরে। নির্জন পুকুর, আশপাশে পল্লীভাব, শালিক ডাকে, মাছরাঙা আসে, নারকেল পাতায় বাতাস সরসর করে, দূরে রেলের বাঁশী শোনা যায়। জল ছলছলে স্থির, ঘন কালো,—নরেশের চোখের মতন। জল দেখে আমার ভয় করতো। আমার ভয় করে ব'লেই জল আমাকে চিরদিন টানে। অচ্ছেদ্য কোনো মোহ আছে ওর নীচে, আছে অন্ধ কোনো বিভীষিকা। জলে কোথাও চাঞ্চল্য নেই, ভিতরে কোনো মুনি যেন মুখ বুজে জপ করছে। বৈশাখের ঝড়ে ওটা ন'ড়ে ওঠে, শ্রাবণে ওটা ভিতরের কান্নায় ফুলে ওঠে, আবার শীতের শেষে ওটা চুপ ক'রে ব'সে থাকে রুগ্না মেয়ের মতো। ওইটিতেই আমার সাঁতার শেখার আয়োজন।

নরেশ আমাকে ধ'রে টানতো জলে। কোমর জল থেকে গলা পর্যন্ত যেতুম সাহস ক'রে—তারপরে আর এগোবার ভরসা পেতুম না। দুখানা পা বাড়িয়ে অনুভব করতুম, একটা ঘনজলের শূন্যলোক, ভাসবার চেষ্টা করতুম উপরের জলে,—পক্ষীশাবক যেমন কচি ডানায় ওড়বার চেষ্টা করে। বিশ্বাস করিনি জলকে কোনোদিন—আমাকে গ্রাস করার জন্য ওর লোভটা যেন উদগ্র হয়ে থাকে। পায়ের তলায় যদি মাটি ছুঁয়ে দাঁড়াতে না পারি, তবে আমার অস্তিত্ব কোথায়? অস্তিত্ব মানেই ত ভূমি স্পর্শ ক'রে থাকা! নরেশ আবার আমাকে টেনে নিয়ে যেতো জলে, কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধ'রে আবার পালিয়ে আসতুম। এমনি ক'রে বহুদিনের চেষ্টায় নরেশ আমাকে কতকটা জলে ভেসে থাকার কৌশল শিখিয়েছিল, তা'র বেশী আর এগোইনি।

গঙ্গায় গিয়ে পরিচিত ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটকে বিশ্বাস করতুম না। নরেশ আমাকে নিয়ে যেতো রাসবাগানের ওদিকে এক জলা জায়গায়—সেইখানে সে আমাকে দেখিয়ে সাঁতার কাটতো। তা'র সঙ্গে যেতুম দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে, তক্তাঘাটে, যেতুম কাঁকুড়গাছি আর বেলগাছিয়ার জলায়। সে আর আমি দুজনে দুপুরের রোদে খুঁজে বেড়াতুম জল—যেতুম ট্যাংরায়, টালিগঞ্জে, মনোহরপুকুরে, রাসমণি বাজারে আর বারুইপুরের ওদিকে। লেক্ আর টালিগঞ্জের শহর তখনও গ'ড়ে ওঠেনি, তখনও গড়িয়াহাট রোড ধ'রে হাঁটতে দিনের বেলায় গা ছমছম করতো, পার্ক সার্কাসের কাছাকাছি তখন এক আধখানা বাড়ী উঠছে,—বাদবাকি সমস্তটাই বস্তিপল্লী,—ওদিকে ট্রাম আর বাস কিছু ছিল না। আমরা বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে এসে মানুষের সমাগম্ দেখতে পেতুম, আর কচি ডাব কিনে খেয়ে বিশ্রাম নিতুম গাছের ছায়ায়। দেখতুম দক্ষিণের যাত্রীরা ছ্যাকড়া গাড়ী ভাড়া ক'রে চলেছে আদি গঙ্গায় স্নান কর্‌তে।

আমি আর নরেশ তখন পাড়ায় পাড়ায় মৃতদেহ খুঁজে বেড়াই। কোথাও মৃত্যু ঘটেছে, ছুটলুম আমরা দুজনে। যে-কোন রোগেই মৃত্যু হোক, আমরা তাদের বাহকদলে ঠিকই আছি। বৈশাখের দুপুরে, শ্রাবণের অমাবস্যায়, পৌষের কনকনে অন্ধকারে—যখনই প্রয়োজন, আমরা তখনই উপস্থিত। লোকে বলতো, আমরা পরোপকারী—আমরা জানতুম ওটা আমাদের উৎসাহ আর উদ্যম ছাড়া আর কিছু নয়। আমার লক্ষ্যটা ওই শ্মশান, ওই গঙ্গা, ওই বট অশ্বত্থের এলোমেলো হাওয়া, আর ওই ক্ষণ কালের বৈরাগ্যের উদাসীন কারুণ্য। শবদাহ শেষ ক'রে গঙ্গায় ডুব দিয়ে যখন ফিরতুম, আমাদের সঙ্গে কলকাতার নিত্য জীবনস্রোতের বাঁধনটা যেন শিথিল হয়ে যেতো, আমরা কেমন একটা যোগ হারাতুম। শ্মশানের ধোঁয়ায়, মরা মানুষের পোড়া চামড়ার গন্ধে, গঙ্গার উদাস বাতাসে, নিমতলার আবহ-সংস্পর্শে—সমস্তটা মিলিয়ে কী যেন আমরা হারিয়ে ফেলতুম। জনসাধারণের মাঝখানে ফিরে এসে যানবাহনের ঘর্‌ঘরানির মধ্যে সেটা খুঁজতে খুঁজতে চ'লে যেতুম। একদিন শীতের গভীর রাত্রে ভাদুড়ী গিন্নির শবদেহ নিয়ে যখন শ্মশানে আমি আর নরেশ চুপ ক'রে ব'সে আছি, সেই সময় একজন মাতাল এসে ঢুকলো শ্মশানে। এক মৃত দেহের পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে সে পান চিবিয়ে গান ধ'রে দিল,

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা,
জনমের শোধ ডাকি মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা।
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা স'য়ে কামনা ভুলেছি।
অনেক কেঁদেছি, আর কাঁদিতে পারি না,—
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।"

নরেশ বিড়ি টানছিল ঘন ঘন, এক সময় সে গ্যাসের আলোটার দিকে মুখ ফেরালো। দেখতে পেলুম, তা'র আয়ত দুই চোখে শ্মশান বৈরাগ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে নেমে এসেছে। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে কাঁদলো।

সেই নরেশ একদিন টাইফয়েড রোগে বোধ হয় এগারো দিনের দিন মারা গেল আবালবৃদ্ধবনিতাকে কাঁদিয়ে। তখন আষাঢ় মাসের বর্ষা নেমেছে চারিদিক জলপ্লাবিত ক'রে। বেশ মনে পড়ে সেই সময়টায় মাত্র কয়েকদিন আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিঙে দেহরক্ষা করেছেন। আমরা শবযাত্রার সঙ্গে গিয়েছিলুম।

সাঁতার শেখা আমার হয়ে ওঠেনি।

*

* *

হুগলী জেলার কোনো এক ডাকঘরে চাকৃরি পেলুম অনেক উমেদারির পর। বেলগাছিয়ার বাসা থেকে রওনা হই সকাল সাড়ে সাতটায়। বাগবাজারের ঘাট থেকে উঠি ষ্টিমারে, গঙ্গা পেরিয়ে গিয়ে নামি বালিতে; বালি খালের পাশ বেয়ে যে-পথটি গেছে বালি স্টেশনে—সেই পথ ধ'রে গিয়ে ট্রেণে উঠি। কয়েক মিনিটের পর নামি শ্রীরামপুর স্টেশনে। নিত্যদিন গঙ্গার এঘাট আর ওঘাট। বুঝতে পারিনে, সেটা চাকরির মোহ, কিম্বা গঙ্গা পারাপারের আকর্ষণ।

সেটা চৈত্রমাসের শেষ।

আমার গঙ্গা অফুরন্ত। শ্রীরামপুর কাছারির সামনের পথটা গিয়ে গঙ্গার ঘাটে মিলেছে, সেইখানে নির্জনে ছিল এক বৃক্ষ—বট অথবা অশ্বত্থ ঠিক মনে পড়ে না,—এখনও সে গাছটি আছে কিনা তাও জানিনে—কিন্তু ওই গাছটির নীচে ছিল আমার

আনমনের আশ্রয়। গঙ্গায় ভেসে বেড়াতো নৌকা নিরিবিলি—ঘাটের ধারে কোথাও কোথাও সেকালের প্রাচীন ঘরবাড়ীর ভগ্নাবশেষ। ওপারে দেখা যায়, বারাকপুরের ঘাট, তার ওদিকে মস্ত একখানা হল্‌দে রংয়ের কুঠিবাড়ী। এপারের তটভূমি যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে দেখি নির্জন। আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকতুম—আর দেখতুম বটের একটা ঝুরি নেমেছে গঙ্গার স্রোতের উপর,—সেটা অস্থিরভাবে কাঁপছে।

এই ঘাটের ধারে বটের মাথায় একদিন নামলো কাল-বৈশাখী,—ঘন কালো মেঘ-লোক থেকে বজ্রের ডাক নেমে এলো। সেই ডাকে ছুটে এলো প্রচণ্ড ঘূর্ণী হাওয়া, আর সেই বটের ঝুরিটা গঙ্গার মাতনের উপরে থরথরিয়ে উঠলো। ওপারের বারাকপুর ধুলার ঝড়ে আর অবেলাকার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গার উপর দিয়ে ছুটছে ধূলার ঝড়, নৌকারা যেন কোথায় হারালো,—আর এপারের গরুবাছুর ছুটলো উর্ধ্বশ্বাসে। কাল-ভৈরবের ফুৎকার লাগলো গঙ্গায় আর আমার নিশ্বাসে। গঙ্গা উঠলো উদ্বেলিত হয়ে আমার হৃদয়ের মতো।

আবার একদিন দেখলুম আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণ নামলো সেই গঙ্গায়। বটের গোড়ায় জল উঠে এলো, ঘাটের সিঁড়ি ডুবে গেল, শোকার্ত আকাশ মলিন-বিমর্ষ হয়ে কাঁদতে লাগলো গঙ্গার বুকের উপর উপুড় হয়ে। ভাবলুম, এ চাকরি আর নয়। আমাকে চ'লে যেতে হবে!

শুনেছিলুম, চাকরি পাকা হবে, মাইনে বাড়বে জুলাইয়ের পর। মনটা অমনি কুঁকড়ে উঠতো বিস্বাদে। পাকা চাকরি মানেই ত' পাকাপাকি বাঁধন। একদিন মাইনে বাড়বে অনেক, বয়স বাড়বে, চুলে পাক ধরবে। ভবিষ্যৎটা দেখতে পেতুম স্পষ্ট, স্পষ্টতর হোতো ভয়াবহ পরিণামটা। যে-ডালে এসে বসেছি, সেই ডালটা কাটার জন্য অস্থির হয়ে উঠতুম। চাকরির সঙ্গে অবস্থার যোগ আছে, অন্তরের যোগ নেই। নিত্যদিন সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি,—সেই মনিঅর্ডারের রসিদ লেখা, সেই রেজেষ্ট্রির ছাপমারা, সেই পার্শেল আর গালা, সেই শিলমোহর দেখা, আর সেই বালুর কাগজের নীচে কার্বন কাগজ রেখে ডাকঘরের দৈনিক কাজের তালিকা লিখে চলা! কেন এ শাস্তি মানুষের? আমি ত' ডাকঘরের কাজের সুবিধার জন্য জন্মগ্রহণ করিনি!

কাছারির কাছাকাছি একটি দোতলা বাড়ীর উপরতলায় একখানি ঘরে থাকি আমি আর ওখানকার এক বন্ধু—নাম পাঁচুবাবু। আমাদেরই ঘরে বাসা নিয়ে

ছিল স্থানীয় পুলিশের এক ছোট দারোগা; পাঁচুবাবু আমার হাতঘড়িটা নিয়মিত ব্যবহার করতো, আর আমার গিলটি করা বোতাম ছড়াটা। সে যেন মাঝে মাঝে চাতরার ওদিকে কোন পল্লীতে যেতো, আর অনেক রাতে ফিরতো একমুখ পান খেয়ে। পাঁচু ছিল কাছারির কোন্ উকীলের মুহুরী—এবং তার একখানা হাত ছিল কাটা,—একহাতেই সে বিশ্বজয়ী ছিল। ঘড়ি আর বোতাম সে আমাকে ফিরিয়ে দিত না, আমিও চাইতুম না। পুলিশের দারোগা আমার মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে থাকতো, আমি আপত্তি জানাতুম না।

বৃষ্টি নামে রাত্রের দিকে, কড়িকাঠের ফাটল বেয়ে জল নামে। আমি হারিকেন জ্বালিয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকি—জলটা আমারই পাশ দিয়ে বয়ে যায়। পঞ্চানন আর পুলিশ ঘুমিয়ে থাকে এক পাশে। শ্রাবণের বর্ষা বাইরে ঝমঝম করে। হঠাৎ একদিন গানের সুর এলো কানে—বর্ষার জলে ভিজে সেই সুর আমার অন্ধকার ঘরে ঢুকে যেন আহত পক্ষীশাবকের মতো দেয়ালে দেয়ালে ডানা ঝটাপটি করতে লাগলো। সেই গানের করুণ মধুর কয়েকটি কলি আমার আজও মনে পড়ে—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এলুম। রাত তখন প্রায় বারোটা হবে। কাছারির ওদিকে হু হু করছে বর্ষাবাদলের আহত ক্ষুব্ধ বাতাস। পথ ঘাট জনহীন, দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। কোথাও আলো নেই। নীচের সিঁড়ির দরজা খুলে পথে নেমে এসে দেখি, আমাদেরই দোতলার নীচে বেনে-মসলার যে দোকানটা —সেই দোকানের কেনা-বেচার লোকটার চোখে ঘুম আসছে না, তাই গানটা ধরেছে চড়া সুরে। সমস্ত গানটা আমি শুনলুম সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে।—

"নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান।
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া,
ঘুরে মরি পলে পলে।"

বৃষ্টি পড়ছে ঝুপঝুপ করে আমার সর্বশরীরে, আকাশ ডাকছে ঘনঘন। কিন্তু ওই গানটা যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। উত্তরকালে মহাকবির গান শুনেছি

কত অজস্র। মহাকবি নিজে গেয়েছেন, কত কোকিলকণ্ঠি গেয়েছে, গেয়েছে কত ছেলে। কত দেশ দেশান্তরে, কত বিচিত্র সমাজে, আসরে আর মজলিসে,—কত চন্দন চুয়ায় আর ধূপের ধোঁয়ায়, কত ফুলের সুবাসে আর মধুর আলসে মহাকবির সঙ্গীত বর্ষণ করেছে অমৃতরসধারা,—কিন্তু ওই গানটির আসন সত্য হয়ে আছে আমার জীবনে কোন এক শ্রাবণের বর্ষায়, বেনে-মসলার এক ঝাঁপ ফেলা দোকানে, একটি দিনশ্রমিকের কণ্ঠে,—আমার কষ্টক্লিষ্ট জীবনযাত্রার এক দুর্যোগের রাত্রে! ও গানটি সেদিন আমার পথ-নির্দেশের কাজে লেগেছিল।

চাকরি ছাড়ার জন্য ফন্দী আঁটছিলুম, একদিন একটা সুযোগ মিলে গেল। গত কয়েক মাস শ্রীরামপুরের ওই বাসাতেই ছিলুম, একদিন দারোগা সাহেব বললেন; তাঁর পরিবারকে না আনলেই আর চলছে না। পাঁচুবাবু তার নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল,—যাবার সময় আমার বোতাম আর ঘড়িটি নিয়ে গেল। কিন্তু আমি যাই কোথা? সেটা শ্রাবণের শেষ দিক। ভাবলুম থাকার জায়গা যখন নেই, তখন চাকরিই বা থাকে কেন? সুতরাং একদিন সন্ধ্যার বৃষ্টিতে মাস্টার মশাইকে না জানিয়েই আমার টিনের বাক্স আর সতরঞ্চিখানা নিয়ে বর্ধমানের গাড়ীতে চ'ড়ে বসলুম। বালিশটি দারোগা সাহেবের ভারি পছন্দ হয়েছিল।

মনে পড়ছে কী বৃষ্টির রাত সেদিনটা! বর্ধমান স্টেশনের কোথাও আমাকে থাকতে দেওয়া হয়নি, আমাকে বাইরে গিয়ে এক বন্ধ দোকানের ঝাঁপের পাশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অকারণে বর্ধমানে আসিনি, খবর পেয়েছিলুম আমার এক আত্মীয়ের ওখানে প্রায়ই গন্ধবাবা আসেন। ইতিমধ্যে এ সংবাদও জানতে পেরেছিলুম, বিশু-কাকাও সেখানে গন্ধবাবার অপেক্ষায় ব'সে আছে। বিশুকাকা অভিনয় ও রঙ্গজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে খড়্গপুরে না কোথায় যেন এক আবগারী দোকান ফেঁদেছিল, সঙ্গে জুটেছিল তারুকাকাও। কিন্তু আবগারী দোকান তুলে দিয়ে বিশুকাকা এসেছে বর্ধমানে। তা'র সঙ্গে আমিও নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলুম গন্ধবাবার জন্য। অবশ্য সে একটা মস্ত কাহিনী—তা'র সঙ্গে জলের সম্পর্ক কম।

কিন্তু আজ রাত্রে অপরিচিত বর্ধমান স্টেশন সীমানার ঘনবর্ষার দুর্যোগ আমাকে ছাড়লো না। ব'সে বিশ্রাম নেবার নিরাপদ জায়গা কোথাও খুঁজে পেলুম না, মাঝরাত থেকে আমাকে দাঁড়িয়েই কাটাতে হোলো—সকাল হ'লে তবে একটা

কূলকিনারা পেতে পারি। স্টেশনের আলোগুলি ঝাপসা, আমার ভবিষ্যতের মতো। তবু নিত্যনৈমিত্তিক চাকরি জীবনের যে গ্লানি জ'মে উঠেছিল আকণ্ঠ, এই অন্ধ বর্ষার জলো হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে যেন প্রাণভরা স্বস্তি পেলুম। শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রার দাসত্বকে মেনে নিয়ে নিজের মনুষ্যত্ব আর স্বভাবধর্মকে যে-ভাবে প্রতিদিন খর্ব করেছি,—এই শ্রাবণের অজস্র ধারায় সেই পাপ আমার সর্বাঙ্গ থেকে ধুয়ে যাক্। দারিদ্র্যে তলিয়ে যাই, সর্বহারা হয়ে ঘুরে বেড়াই—সে আমার সইবে ; উপবাসে কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসবে দিনে দিনে, তাও জানি,—কিন্তু দিনানুদৈনিক নিয়মানুগত্যের পিঞ্জরে আমার বন্দীবিহঙ্গ কণ্ঠরোধ হয়ে মরবে,—সে-অপমৃত্যু আমার কিছুতেই সইবে না। চোখ বুজে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলুম বৃষ্টির নীচে।

ডাকঘরের ওই চাকরিটা বছর খানেক ধরে আমার পিছু লেগেছিল। অর্থাৎ আমি ছাড়লেও চাকরিটা আমাকে ছাড়তে চায় না। কেবলই ঠিকানা-কাটা চিঠি আসে, তোমার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে চার পাঁচবার,—অমুক তারিখে অবশ্য তুমি জয়েন্ করবে!—আমি কোনো জবাবই দিতুম না।

সরকারি চাকরি আঠার মতো চট্‌চটে,—ধরলে সহজে ছাড়ে না! মা বললেন, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লি রে? আমি বললুম, অলক্ষ্মীর সাধ্য কি, আমার পা ছোঁয়!

কাশী আনাগোনা ছিল নিয়মিত। দ্বারভাঙ্গা ঘাটের সামনে এক গুম্‌টিতে ছিল আমাদের আসর। উত্তরবাহিনী গঙ্গা অর্ধচন্দ্রাকারে চলে গেছে। ওপারে সুদীর্ঘ বিস্তৃত বালুডাঙ্গা। এপারে চৌষট্টি যোগিনী, অহল্যা, দ্বারভাঙ্গা, দশাশ্বমেধ, মহীশূর, মণিকর্ণিকা ইত্যাদি ঘাট। আমরা স্বপন বুনে যেতুম এপারের বিশাল অট্টালিক-শ্রেণীর স্তবকে স্তবকে, আর ওপারের বালুপ্রান্তরের স্তরে স্তরে। মাঝখানে ব'য়ে যেতো গঙ্গা—আমাদের অব্যক্ত ভাষা আর ভাবনার ঘূর্ণীপাকে। আমাদের দলে কেউ-কেউ ছিল যাদের ভাঙ্গা মাস্তুল আর ফুটোজাহাজের খোল, যারা সর্বহারা আর গৃহবিমুখ, যাদের আনন্দ ছিল পথের ধূলায় আর কাব্যকল্পনায়—যারা বিশ্বাস করতো না কিছু, কিছু মানতো না, প্রচলন-নীতির ধার যারা ধারতো না। সংশয়াচ্ছন্ন, অবিশ্বাস-বাদী, হাস্যপ্রিয়, দুঃখজয়ী, অসন্তুষ্ট—সেই সেদিনকার ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দলটা! ক্ষুধাতৃষ্ণাকে আমল দিইনি, বাধ্যবাধতাকে স্বীকার করিনি, ভাগ্যোন্নতির কল্পনা করিনি, মানুষের আপাতমহানুভবতা আর বিদ্যাবত্তা দেখে ভুলিনি,—সব কিছুর প্রতিবিম্বিত

স্বরূপ আমরা দেখে নিতুম জাহ্নবীর মুকুরে। আমাদের আসরে থাকতো দার্শনিক, বৈদান্তিক, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, ছাত্র, ধর্মপ্রচারক, লেখক, কবি, কৃতী, বক্তা, পণ্ডিত, পুরোহিত—সবাই। আমরা একটা সম্পূর্ণ গোষ্ঠি ছিলুম। গা-ঢাকা অন্ধকারে অনেক রাত অবধি আমরা ওই গুম্‌টিতে আসর জমাতুম। আত্মপরিচয়-অভিমানী কোনো ব্যক্তির পক্ষে আমাদের সেই ভবঘুরের আসর অতি দুর্গম ছিল। পরবর্তীকালে আমাদের এই দলটি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। তিনি আমাদের আসরে থাকতেন একটা বিরাট আইডিয়ার প্রতীকস্বরূপে! পুণ্য জাহ্নবীর ওই কল্লোলে পেতুম তাঁ'র কাব্যের অনির্বচনীয়তা।

মাঝে মাঝে আমি ওই আসর থেকে নিজেকে টেনে ছিট্‌কে দিতুম দূরে। কোথায় তা জানিনে, কিন্তু দূরে চলো, গঙ্গা প্রবাহের মতো চলো অনির্দিষ্টের দিকে। এমনি ক'রে একবার গিয়ে দাঁড়ালুম কুরুক্ষেত্র আর থানেশ্বর পেরিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে। পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো দিঘী, পাশেই একটি মন্দির। অদূরে ভদ্রকালী রয়েছেন কুরুপ্রান্তরের পারে। দিঘীর কালো জলে আর বৃক্ষছায়ায় বাতাস বুঝি বয় সেদিনের! পৌরাণিক কালের প্রাচীন কাহিনী লেখা কি পাথরে পাথরে? দ্বৈপায়নের জলে কি লেখা মহাভারতের চরম পরিণাম? কী ভালো লেগেছিল দ্বৈপায়নের ছায়া-ঢাকা শান্ত কালো জল!

রাজকোট পেরিয়ে এসে পৌঁছলুম দ্বারকায়। আবার সমুদ্রতীর। কিন্তু এ সেই বঙ্গসাগরের উদ্দাম উতরোল নয়, এ কেবল আকাশ আর সাগরের শান্ত আলিঙ্গন। তরঙ্গ আছে, কিন্তু শীতের আরম্ভে তাদের সেই উত্তাল মুখরতা নেই, কেবল একটা থৈ থৈ ভাব। পশ্চিমের সূর্য আরব সাগরের দিগন্তলোকে নেমে যায় ধীরে, ধীরে আর দ্বারকাপুরীর দেবতা নাকি সেই দূর আকাশপ্রান্তে দ্বিতীয় দ্বারকার মেঘময় মন্দির রচনা করেন। সমস্ত দিন কাটে সাগর বেলায়, মন্দিরের আনাচে কানাচে। সে একটা থেইহারা জীবন,—ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা'র বিবাগী ভাবনা নেচে বেড়ায়। ফস-ফরাস জলে রাত্রে, তা'র সাক্ষ্য থাকে অন্ধকার আকাশের দোলায়মান তারকদল, আর বেলাভূমির উপরে তরঙ্গের আছাড়ি পিছাড়ি নিশ্বাস। তীরভূমির ধার দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে যেতুম। ছোট ছোট জলজ প্রাণীরা আমার খেল্‌না ছিল।

আঠারো উনিশ বছর আগেকার কথা ভাবছি। দ্বারকার নাটমন্দিরে একটি দেব-দাসী নাচতো ঠাকুরের সামনে। ভীড় জমে যেতো তা'র চারিদিকে। নাচের সময়

সে এমন ভাবে ঠাকুরের দিকে তাকায়, এমন ভাব ভঙ্গী করে, যেন ঠাকুর তা'র নাচের জীবন্ত দর্শক—তা'র চারপাশে যেন আর কেউ নেই ! নাচ শেষ হ'লে প্রায়ই দেখতুম মেয়েটা কাঁদে বাইরে এসে,—অমনি একটা লোক কোথা থেকে এসে মেয়েটার মুখে একটা বিড়ি ধরিয়ে দেয়। লোকটা আমার পরিচিত,—ওর দোকানে আমি পুরী তরকারী কিনি। সমুদ্রের তীরে কোনো কোনো সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিই এসে গান করতো,—কোনো কোনোদিন ওই লোকটা আসতো ওর সঙ্গে। প্রবল বাতাসের চাপে আর সাগরের নিশ্বাসে মেয়েটার সুর মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যেতো, তবু ওর গান আমার ভাল লাগতো সন্ধ্যার সমুদ্রতীরে। ফসফরাসের চকিত দীপ্তির সঙ্গে ওর গানের সুরের একটা সমন্বয় ঘটতো। গুজরাটি ভাষা আর ভাব বুঝিনে, কিন্তু কেমন একটা মিঠে মেঠো আস্বাদ পেতুম। দ্বারকা থেকে ভেট-দ্বারকা হোলো কয়েক মাইল রেলপথ। ওখা বন্দরের কাছে এসে ট্রেণ থামে। এখানে আবার সমুদ্রের একটি খাড়ি পেরিয়ে যেতে হয়।

ভেট-দ্বারকায়। এর নাম সত্যভামাপুরী—এখানকার মন্দিরও বৃহৎ। সেখানকার একটি রাত্রির কথা মনে পড়ছে। আমরা রাত্রিশেষে নৌকায় উঠলুম, তখন বাতাস ছিল প্রবল। সমুদ্রের ঢেউয়ে নৌকা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আমাদের সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল। যাত্রী-মেয়েরা চেঁচামেচি আর কলরব করে, দুর্গানাম জপ করতে থাকে। যারা চেঁচাতে পারছিল না, তারা বমি করে ভাসালো। অন্ধকার ওপারের তট দেখা যাচ্ছিল না ব'লে ওদের মধ্যে কেউ কেউ কান্নাও নিয়েছিল। ছোট ছোট ঘটনায় সেদিনকার সেই জলপথটুকু কেমন আবর্তিত হয়ে উঠেছিল, সেইগুলি স্মরণ ক'রে এখন কৌতুক বোধ করি। আমার রূঢ় ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল বর্মা অভিযানের আর বঙ্গসাগরের, সেজন্য আমি নিতে চঞ্চল হইনি। কিন্তু আমি সাঁতার জানি, আমার এই মিথ্যা উক্তিতে একটি গুজরাটী বধূ কেমন ভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল সেই কথাটি লজ্জার সঙ্গেই বলি। ঢেউয়ের দোলায় আমি ভয় পাইনি, এইতে সবাই ধরে নিল, আমি অবশ্যই সাঁতার জানি। আমি তাদের বিশ্বাসটা আর ভাঙতে চাইনি, এই ছিল আমার অপরাধ। নৌকায় যখন বড় বড় দোলা লাগলো, আর নৌকা লাফাতে লাগলো রণতুরঙ্গের মতো,—সেই সময়ে ওই গুজরাটি মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে আমার হাঁটু চেপে ধরেছিল,—অর্থাৎ নৌকা ডুবলে আমি যেন তাকে বাঁচাই। তা'র স্বামী বেচারি তখন সমুদ্রপীড়ায় অনড়, চোখ বন্ধ

করে বমি করছে মুখ থুবড়ে। তা'র স্ত্রীটি বমি ক'রে ভাসালো আমার জামা কাপড়। অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে বাকি জলপথটুকু আমি কাঠ হয়ে ব'সে রইলুম।

বউটি ভারি লজ্জা পেয়েছিল। তীরে নেমে সে আর আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারলো না। স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে কথা ক'য়ে আগে আগেই হন হন করে চ'লে গেল। বস্তুত জল অথবা আগুন মানুষকে যে ভাবে আতঙ্কিত ক'রে তোলে, এমন আর বোধ হয় কিছুতেই নয়। ঘনায়মান বিপদের শীর্ষক্ষণে আত্মরক্ষণীবৃত্তি মানুষকে সকলপ্রকার নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বাধ্যবাধকতা ভুলিয়ে দেয়। স্বামীর মৃত্যু অথবা বিপদ সে কামনা করেনি, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু ঘটলেও সে যেন বাঁচতে পারে কোনো কৌশলে—এই ছিল তা'র অভিপ্রায়। মেয়েটির প্রতি কটাক্ষ করার জন্য এ ঘটনাটি বলছিনে, কেবল যা ঘটেছিল সেইটুকুতে কৌতুক বোধ করেছিলুম। ঘটনাটার জন্য আমার মিথ্যাভাষণটাই ত দায়ী।

করাচি থেকে একখানা জাহাজ ছাড়ে, সেখানা ওখা বন্দর আর দ্বারকা হয়ে যায় বোম্বাই। দ্বারকার বেলাভূমির সামনে জাহাজটি এসে দাঁড়ালো সমুদ্রতীর থেকে মাইল খানেক দূরে জলে। আমরা কয়েকজন যাত্রী মধ্যাহ্ন রৌদ্রে একখানা বজরা নৌকায় চ'ড়ে ভাসতে ভাসতে গিয়ে জাহাজে উঠলুম। জাহাজখানা মস্ত, নাম—ভিটা। শুনলুম, এখানা বিলাতের দিকেও পাড়ি দেয়। সেটা নভেম্বর মাস, আকাশ আর সমুদ্র নীল মখমলের মতো। বাতাসে প্রচুর স্বাস্থ্য। জাহাজ এতটুকু আন্দোলিত হয় না, সমুদ্র কোথাও চঞ্চল নয়। সমুদ্র পাখীরা চলেছে দূর দূরান্তর, আর তীরভূমির ধারে ছোট ছোট হাঙরমুখো কালো কালো পাহাড়ের লোনাধারা গুহায় তীরতরঙ্গের আছাড়ি পাছাড়ি শব্দ। বিরাট জলরাশি চতুর্দিকে—কোথাও অশান্তি আর উৎক্ষেপ নেই, আমরা বড় আনন্দে সম্পূর্ণ একটি দিন কাটিয়ে পরদিন মধ্যাহ্নে বোম্বাই পৌঁছলুম।

বোম্বাইতে মহালক্ষীর মন্দির সাগরতীরে দাঁড়িয়ে। চত্বরের নীচেই অগাধ নীল জল। হিন্দুর দেবতা জলাশয়ের তীর ছাড়া কোথাও আসন পাতেনি। যেখানে পুণ্য-প্রবাহ, অবগাহনের আনন্দ, জনপদ যেখানে জল-প্রাচুর্যে সঞ্জীবিত,—সেখানেই হিন্দুর দেবতা। ঠিক এই দৃশ্যটি দেখছি সেতুবন্ধ রামেশ্বরমে। বিরাট মন্দির অধিষ্ঠিত রয়েছে ভারত মহাসাগরের তীরে। মন্দিরের পাদপ্রান্তে অর্ধচন্দ্রাকার সাগরসীমানায় নারিকেল কদলী আর তমালতালিবনরাজিনীলা! বেলাভূমির প্রান্তে নারিকেল আর কলাবনে

দিবারাত্র দক্ষিণ বাতাস মর্মর ধ্বনি করে বেড়ায়—তা'র শ্রান্তি ক্লান্তি নেই। রামেশ্বরম্ থেকে ধনুষ্কোডি নয় মাইল রেলপথ। আমি সেখানে গিয়েছিলুম, সেদিন পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ। স্টেশন থেকে একটি বালুপ্রান্তর পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতের সর্বশেষ বিন্দুতে যেতে হয়। সেখনে রয়েছে একটি কুটীর মন্দির—রামসীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ। এখানে সীতাহারা রামচন্দ্র ধনুর্বাণ রেখে সাগরের শোভা দেখেছিলেন। সমগ্র ভারত রয়েছে উত্তরে, এখানে তা'র পদপ্রান্তে অন্ধ অতিকায় দানবের মতো ভারত মহাসাগরের তরঙ্গ-দল উত্তাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শোভা বটে,—কিন্তু কী ভয়াল, কী সর্বগ্রাসী তার করালরূপ, রুদ্রের কী উত্তাল নৃত্য!

জলময় ভারত পরিক্রমায় একদিন যারা আমার পিপাসার জল যুগিয়েছিল, স্নেহবর্ষণ করেছিল বর্ষাধারার মতো, অগাধ জল-রাশির মাঝখানে যারা সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত করেছিল আমার প্রাণে,—আজ তা'রা কোথায়? তা'রা কি জীবিত? রামেশ্বরমের রামনাথ যোশী, কুরুক্ষেত্রের দীনদয়াল, বৃন্দাবনের প্যারীলাল, দ্বারকার দেবীভবনের সেই পুরুষোত্তম আর ব্রজমোহন ইন্দ্রজি,—তাদের কথা এতকাল পরেও আজ মনে পড়ছে। কেউ একখানা কম্বল, কেউ একগোছা পুরি, কেউ বা রাত জেগে পাহারা দিয়েছিল আমাকে সমুদ্রতীরে জ্যোৎস্নারাত্রে,—বালুর বিছানায় শুয়ে জ্যোৎস্নাসাগরের দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আমার ঘুম এসেছিল,—চাঁদের মধুর ঘুম। মনে পড়ছে রামঝরকা আর মৈনাকের সেতু পামবান,—মনে পড়ছে পথের বন্ধু সোমনাথ মনিরামকে। ওরা ছিল আমার সুদীর্ঘ জলজীবনের সঙ্গী। মনে পড়ছে সেইযুগের মাদ্রাজ, ওয়াল্টেয়র আর পুরীর সমুদ্রের কথা। বিপুল বৈতরণীকে পিছনে রেখে রথের উপরে চ'ড়ে চলেছেন বামনদেব। যুগ-যুগান্তকালের রথের উপরে মহাকালের আসন পাতা,—তিনি একই কালে স্থাণু এবং গতিশীল, তিনি মহৎ সৃষ্টি, তিনিই মহাপ্রলয়, তিনি মৃত্যু, তিনিই অমৃত,—সেই মহাকাল গণদেবতার শ্রীক্ষেত্রে মহাজন জীবনরথের অক্লান্ত ঘর্ঘরধ্বনি নিত্য কাল ধ'রে এগিয়ে চলেছে।

অনন্তবারিধিপাথার অবিশ্রান্ত চুম্বন করছে সেই গণদেবতার পদপ্রান্ত কল্প-কল্পান্তকাল ধ'রে,—পুরীর সমুদ্রতীরে ব'সে একদিন রাত্রে বনমালী পাণ্ডা এই কথাটি আমাকে বুঝিয়েছিল। তারই কাছে শুনেছিলুম নীলমাধবের কাহিনী। বনমালীকে আজো ভুলিনি,—স্বর্গদ্বারের সফেন সমুদ্রের বালুপটে তা'র স্মৃতি আজো আঁকা।

জলে কল্লোলে

সমুদ্রে যাও, সেখানে উত্থান পতন ছাড়া আর কোনো বৈচিত্র্য নেই। সেখানে একটি মাত্র অনুভূতি, পৃথিবী কত ছোট—যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্রের তরঙ্গ পৃথিবীকে ধুয়ে মুছে নিতে পারে। কিন্তু নদীর দুইপারে পাই বহু জীবন-বৈচিত্র্যের আস্বাদ। এমন অসংখ্য অগণ্য নদী আছে ভারতে, যাদের আজও নামকরণ হয় নি, যাদের আমরা চিনিনে। অরণ্যের নিগূঢ়লোকে পার্বত্য নির্ঝর যেখানে নদীতে রূপান্তরিত এমন অনেক নদী রয়ে গেছে মানচিত্রের বাইরে। দুর্গম পর্বতের নদী, বড় নদীর মোহানার ফাটলে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, বড় বড় প্রান্তরের নির্জন স্রোতস্বিনী,—এদের নাম নেই, পরিচয় নেই। একই গঙ্গার কত শত ধারা কতদিকে ছুটকে গিয়ে পথ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সিন্ধু নদের কত শিরা উপশিরা, ব্রহ্মপুত্রের কত পথ-হারানো ধারা। কত বনপথে আর জনপদে শ্রাবণের ঢল যখন নামে, নদীরেখা যায় ছুটে লোকালয়ের আশেপাশে,—শীতের শেষে তা'রা শীর্ণ হয়ে আসে, মানুষ তাদের নাম ভুলে যায়। যে-নদী আপন স্বকীয়তার গুণে সাগরে গিয়ে মেলেনি, কিম্বা বড় কোন নদীর কাছে বড় রকমের আত্মসমর্পন করে নি, তাকে নদী বলতে হয়ত আমাদের বাধে। যমুনা হারালো গঙ্গায়, পঞ্চনদ হারালো সিন্ধুনদে—তাই তাদের মনে রাখি, আদর করি। চেরাপুঞ্জীর জলপ্রপাতগুলির পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখো, সুরমা উপত্যকার যত নদী তাদের জন্ম কোথায়; কার্সিয়ঙের সামনে দাঁড়িয়ে তিস্তা উপত্যকারও সেই দৃশ্য, পাঞ্জাব আর কাশ্মীর সীমানায় মারী পাহাড়ে দাঁড়ালে অনেকটা এই ছবি। অমনি মনে পড়ে গেল মারী পাহাড়ের কথা। আমি সৈন্য দলে চাকরি করতুম। গ্রীষ্মকালে মারীতে বসতো আমাদের আপিস, আর শীত-কালে রাওয়ালপিণ্ডিতে। মারী পাহাড়ে পাইপের সাহায্যে জল আনা হোতো ঝিলম নদী থেকে। সেই জল এনে রাখা হোতো দু তিনটি জলাধারে। একবার কয়েকদিনের জন্য জল পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। স্নান আর পান কোনটাই হয় না। ভিস্তির পিঠে জল আসে কিন্তু তা' দুষ্প্রাপ্য। আমাদের অনেককেই এক লোটা জলের জন্য প্রায় তিন মাইল নীচে গোরস্থানে গিয়ে নামতে হোতো,—সেখানে একটি প্রায়-শুকনো ঝরণার অতি ক্ষীণ ধারা ছিল। কোনোমতে প্রাণরক্ষার মতো জল সেখানে পাওয়া যেতো। মারী পাহাড় থেকে পনের মাইল আন্দাজ নীচে নামলে ঝিলম নদীর ধারে কোহালা নামক লোকালয়। প্রতিমাসের শেষ শনিবারে পল্টনের দপ্তরে ছুটি থাকতো। অনেকেই নামতো ভ্রমণে, পথে দু'তিনটি ছোট

ছোট গ্রাম পাওয়া যায়। শনিবার প্রত্যুষে বেরিয়ে পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় মারীতে ফিরে আসা চলতো। আসবার সময় চড়াইতে খানিকটা কষ্ট। কোহালায় বেশি লোকের সমাগম হোতো শুক্লপক্ষের শেষ দিকে। সেখানে ঝিলম নদীর তীরে সমতল ভূভাগ পাওয়া যায় অনেকখানি, নদী স্পর্শ করা যায় এবং অনেকে মধুর বিরাম উপভোগ করে। সমুদ্রের বালুর কোলে সহসা কেউ বাসা বাঁধে না, কারণ সে-বাসা থাকে না। নদীর তটে তটস্থ হয়ে থাকা অনেকের প্রিয়, বাতাস এখানে লঘু, সঙ্গীতধর্মী। সমুদ্র অপেক্ষা নদীতে আছে সজীবতা। ঝিলমের তীর-ভূমিতে চাঁদের আলো, ওপারে কাশ্মীরের ভূস্বর্গলোক,—নদীর প্রবাহ ভিতরে ভিতরে অস্থির,—এপারে কেউ বাজায় বাদ্যযন্ত্র, কারো বসেছে ভোজনের আসর, কোনো কোনো উৎসাহী যুবক হয়ত আশপাশের কটেজ থেকে একটি সুশ্রী বান্ধবী জুটিয়েছে! অনেক সময় দেখা যায় রাত ভ'রে তাদের গল্প আর ফুরোয় না; যদি কেউ নৌকা জোটাতে পারলো তা হ'লে আর কথাই নেই! এখানকার সুশ্রী পল্লীবালারা আতিথেয়তা কারো চেয়ে কম নয়। আমার দুটি বন্ধু, খান্না আর কমল, তাদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হোতো।

কতদিন আগেকার কথা। মনে পড়ছে পঞ্চনদের এক একটি নদী দেখে চলেছি। বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, ইরাবতী। ইংরেজি নাম থাক্,—ওটা ভাষার বিকার। কল্পনায় দেখতে পাই এই পাঁচটি নদী না থাকলে পাঞ্জাব কী মরুভূমি! শুধু কাঁকর পাথরের অনুর্বর পাহাড়শ্রেণী, শুধু প্রান্তর রুক্ষ—দুই চক্ষু জ্বলে যায়! দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসের অতীতলোক। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ভারতের স্তবগান করেছিলেন, তাঁর চোখে হিন্দু আর সিন্ধু একাকার হয়েছিল। মনে পড়ছে পেশাওয়ারের পথে গভীর রাত্রে সিন্ধুনদ পার হওয়া আটক্ পুলের উপর দিয়ে। মনে পড়ছে আঠারো বছর আগে অমৃতশহরে (অমৃতসায়র?) সুবিস্তৃত চতুষ্কোণ দিঘীর মাঝখানে শিখদের শ্বেতপ্রস্তরময় স্বর্ণমন্দির আর শুভ্রশ্মশ্রু দেবপ্রতিম পুরোহিতের কথা, আর দীর্ঘকেশ এলোকরা শিখদের অবগাহন স্নান। এই সঙ্গেই মনে পড়ছে, জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শোণিত-তীর্থ। কোনদিন ভুলবো না কুমায়ুন জেলার রামগঙ্গা নদীতে আমি একশতটি ডুব দিয়েছিলুম, আর পিপাসার্ত আমি স্নান করেছিলুম দক্ষিণ উড়িষ্যার রাজমাহেন্দ্রীর কোলে

গোদাবরী নদীতে, আর হলদোয়ানির ছোট্ট শহরের এক দোকানঘরের মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন ঝরণার শান্তস্নিগ্ধ জলে আমার আত্মহারা স্নান। তারপর কত নদী মাতৃস্নেহে আমাকে সঞ্জীবিত করলো কত দেশে। নেপালের কাটামুণ্ডুর পথে শ্রীশগিরি আর চন্দ্রগিরির মাঝখানে পার্বত্য নদীটি, নাম—বাগমতী—তা'র জলে পেয়েছিলুম কী আনন্দের স্বাদ! কী আনন্দ পাওয়া গেল কামরূপের কোলে ব্রহ্মপুত্রে, শীলঙের হস্তিপ্রপাতে, গিরিডির উশ্রীতে, রাঁচীর হুড্রুতে, দার্জিলিঙের পাগলাঝোরায় আর দুর্গম হিমালয়ের উত্তপ্ত গৌরীকুণ্ডে! হৃষিকেশের নীলধারায় পূর্ণিমায় জপে বসেছিল এক সন্ন্যাসী, তারই পাশে পাথরের ভাঙনে প্রাচীন বৃক্ষ-শিকড়ের অষ্টাবক্র জটলা। জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি ছায়ায়, নীলধারার দুর্বার ঘর্ঘরধ্বনিতে, সন্ন্যাসীর ধুনির ধোঁয়ায়, তারকা-খচিত হেমন্ত-আকাশের উদার নীলিমায়,—সৃষ্টি কি আশ্চর্য মনে হয়নি সেদিন?

মনে পড়ছে দেরাদুনের সেই অপরিচিত পথ,—টাঙ্গায় চলেছি। সেই ফরেষ্ট রিসার্চ কলেজ, আর অসংখ্য অন্ধকার চা বাগান। আমরা তিনজন। শ্রীমতী আনু ছিল সঙ্গে। এক শিমুল গাছের নীচে আমাদের টাঙ্গা দাঁড়ালো। অদূরে একটি নামহারা নদী। নদী বলবো কেন? একটি পাহাড়-ফাটা বড় ঝরণা! আনু বললে, ওই নদীতে নামবো।

নদীর ঘাট নেই, পাথরের ভাঙন ধ'রে নীচে নামা। সেদিন হেমন্তের রোদ ছিল প্রখর। আমরা নীচে নামলুম। ঝিরঝির করছে নদী উপলখণ্ডের মধ্যে। কত অসংখ্য বর্ণের পাথর কত আকারের। শোনা গিয়েছিল এখানে নাকি শালগ্রাম পাওয়া যায়। আনু শালগ্রাম খুঁজে বেড়াতে লাগলো নদীতে। জল কম, কিন্তু জল স্বচ্ছ। নদীর কোলে একটি মস্ত গুহামন্দির, ভিতরে কয়েকটি দেবলিঙ্গ ও বিগ্রহ। এত বড় গুহা সহসা চোখে পড়ে না, যেন একটা বিরাট মুখব্যাদান! ভিতরে অপর একটি বিরাট প্রস্তর-সুড়ঙ্গে পূজারীর বাসা,—পূজারী তখন ছিল না। গুহার শান্ত স্নিগ্ধ-ছায়ায় আর গাছের হাওয়ায় নদীগর্ভ অতি মনোরম। নদীর তুষারগলিত জল অঞ্জলী ভ'রে পান করা গেল। আঁকাবাঁকা নদীপথ ধ'রে আনু যেন কোথায় চ'লে গিয়েছিল শালগ্রাম খুঁজতে। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরলো, দেখি তা'র এলোচুল বেয়ে জল ঝরছে পিঠের দিকে। আসবার সময় দুই হাতে সে নানাবর্ণের পাথর এনেছে কুড়িয়ে। কিন্তু শালগ্রাম তা'র একটাও নয়। আনু বললে, শালগ্রামের রং ঠিক কেমন বলো ত?

হেসে বললুম, ঠিক তোমার চোখের মতো কালো!

আন্নু হাসিমুখে জবাব দিল, কষ্টিপাথর বলছ?

না,—শালগ্রাম হলো ব্রাহ্মণ, তা'র গলার শাদা পৈতের দাগ পাবে!

আন্নু ক্লান্তভাবে গুহার ছায়ায় এসে বসলো। শালগ্রামে আমাদের প্রয়োজন নেই, শুধু একটা খেয়াল,—যদি জুটে যায় তবে সঙ্গে নিয়ে যাবো এই মাত্র!—মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে আন্নু চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর হাসিমুখে বললে, শালগ্রাম ত নয়, তোমার একটা খেলনা চাই, আমাকে তাই জন্যেই ঘোরালে!—বেশ, তোমাকে মোরাদাবাদের খেল্‌না কিনে দেবো। শালগ্রাম চেয়ো না।

বললুম, বিদেশিনি, নদীর ধারে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াতে-বেড়াতে একদিন হঠাৎ শালগ্রাম পেয়েও যেতে পারো!

যদি কোনোদিন পাই তোমাকে জানাবো।—আন্নু মুখ ফিরিয়ে বললে।

কী উত্তাপ সেদিন রৌদ্রে, কী ঠাণ্ডা সেদিন তন্বী-নদীর ওই কোমলধারায়। গুহার আবছায়ায় ব'সে সেদিন মধুর হাওয়ার মৃদুমর্মর,—শীতের ফুল ধরেছে নদীর ভাঙনের ধারে ধারে। বিজন নিস্তব্ধ নদীর নীচে আমরা—পৃথিবীর বাসা উপরতলায়। পাখীরা এসেছে নদীতে, গলাগলি করছে জলে! আর আন্নুর এলোচুলের ঝরঝরে জলে তা'র পিঠের কাপড় গেল ভিজে।

অনেককাল পরে আন্নু এসেছিল কলকাতায়। ইতিমধ্যে সে ভ্রমণ ক'রে এসেছে গড়মুক্তেশ্বরের ওদিকে কোন্ শাখানদীর ধারে তার কোন্ পরিজন আছে,—সেইখানে। তারপর কোন্ এক স্বদেশী পণ্ডিতজীর সঙ্গে নর্মদা ও তপতীর ধারে ধারে, তারপর ইন্দোরের ওদিকে। জল দেখলো সে অনেক,—অনেক অগাধ জল। সম্প্রতি এলো সে লক্ষ্নৌ আর গোমতী ভ্রমণ সেরে। এসে পৌঁছলো সে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে।

দুইধারের বারোটা শিবমন্দির। তা'র কাছে দাঁড়িয়ে আন্নু বললে, শালগ্রাম আজো খুঁজে পাইনি!

আমি বললুম, কিন্তু তুমি যে বলেছিলে চিন্‌তে জানলে শালগ্রাম চেনা কঠিন নয়?

আন্নু আমাকে সংশোধন ক'রে বললে, চিন্‌তে জানি ব'লেই ত' পাইনি!

চুপ ক'রে রইলুম। মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টাধ্বনি শেষ হয়ে এলো। আমাদের ফেরবার সময় হোলো। আন্নু তা'র বড় বড় কালো চোখে হেসে বললে, যেদিন জানবো, সব পাথরের নুড়িই শালগ্রাম, সেদিন আবার এসে তোমাকে খবর দিয়ে যাবো!

আমু হয়ত' তামাসা করেই চ'লে গেছে। কিন্তু আর সে আসেনি! বাকি কথা র'য়ে গেল মনে মনে।

কাঁচড়াপাড়া থেকে ঘোষপাড়া কতটুকু পথ, কিসে যেতে হয়—এতকাল প'রে আর আমার মনে নেই। কিন্তু মনে আছে চৈত্রের রোদ, দোলপূর্ণিমা, ঘোষ-পাড়ার মেলা, গঙ্গা,—আর সতীমায়ের পীঠস্থান। সেই গঙ্গার ধারে যে-সব বৈষ্ণবী মেয়েরা এসেছিল সেই মেলায়, তা'রা কি আজো আসে? সেই একটি ছোট গাছের গোড়ায় রাঙ্গাপাড় শাড়ী জড়িয়ে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে সবাই মা ব'লে চেঁচায়, আর একটি বোবা ছেলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সতীমায়ের সামনে আকুলি বিকুলি করে? মা, মাগো, বোবার বোল্ ফুটিয়ে দাও,—দোহাই, ওগো, মাগো—

কী কঠিন বাঁধনে বাঁধা সেই বোবা ছেলে! কী অব্যক্ত যন্ত্রণা তা'র মজ্জায় আর পঞ্জরে! তা'র কণ্ঠনালীতে, চোখে, দাঁতের পাটিতে কী মর্মান্তিক আতুরতা। শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর খোল খঞ্জনী ডুগডুগি,—সমস্তগুলো বাজে একসঙ্গে, তা'র সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নরনারীর উচ্চরোল সতীমায়ের উদ্দেশে! বোবা ছেলে ছটফট করে ধূলায় আর রৌদ্রে আর অনাহারে নবমীর বলির মতন! তা'র বোল্ ফোটাতেই হবে! সতীদেবী নাকি অসাধ্য সাধন করেন!

কিন্তু বোল্ ফোটে গঙ্গায়, তা'র ঘনকল্লোল মাঠের প্রান্তে বটের গোড়ায় বুগবুগ করে। দোলপূর্ণিমার নির্জন গঙ্গা, সে-গঙ্গায় চাঁদের স্রোত,—হীরার প্রবাহ চলেছে ঝলকে ঝলকে। আমরা কয়েকজন ত্রিবেণীর যাত্রী। ত্রিবেণী থেকে নবদ্বীপ। চলন্ত নৌকায় শুয়ে থাকা জ্যোৎস্নাকে বুকে নিয়ে, সে কী অধীর অসহ্য পুলক! একটি রাতের নৌকার বাসা,—সে যেন পরিচিত জীবন-যাত্রার থেকে একটি বিচ্ছিন্ন কাল, জ্যোৎস্নার ইন্দ্রজালে অগণিত স্বপনের কাহিনী যেন জড়িয়ে থাকে। আর—মনে পড়ছে বহরমপুরের ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে আজীমগঞ্জের ঘাটে গিয়ে নামা ভোর রাত্রে। সেটি গঙ্গার মায়ালোকের পথ,—ঘুমে জড়ানো, স্বপনে ভাসানো, কল্লোলে কাঁদানো। সেই জলপথ ফুরোলো, কিন্তু সেই পথ আমাদের কল্পনায় অফুরন্ত হয়ে রয়ে গেল। কোথা সেই গোবিন্দপুরের পল্লীঘাট,—নাটোর পেরিয়ে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে বাবলার ঘন বনপথের সুদীর্ঘ রেখা ছাড়িয়ে দিঘাপতিয়ার প্রাসাদ বাঁ দিকে রেখে যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলুম শুক্লপক্ষের শেষে? আত্রেয়ীর দুকূলভরা টলটলে জলে

আমার সেই চন্দ্রহাস রাত্রির নৌকা চললো ভেসে দক্ষিণ-পূবে, আর আমি শুয়ে রইলুম পাটাতনে জলের ধারে কান পেতে! নৌকা ভেসে চললো সমস্ত রাত আত্রেয়ীর জলে, ভেসে চললো আকাশে শুক্লপক্ষ, ভেসে চললো একটা অবাস্তব রূপলোক,—ভেসে চললো আমার চোখের কোণের জলে ইহ-জীবনের যত কিছু স্মরণীয়!

.আত্রেয়ীতে নেমেছে ভাদ্রমাস, আর সিরাজগঞ্জের যমুনার ঢল। আত্রেয়ী ভরে গেল কলকল জলধারায়। ধান ক্ষেত মুছে গেল, মুছে গেল গ্রাম। বাংলার অন্ত্রেতন্ত্রে সেই জল ঢুকলো বিভিন্ন নালায়। যে-নদী ছোট ছিল, শীতের শেষে যার উপর দিয়ে যায় গরুর দল, মানুষ যায় হেঁটে, নৌকা যায় বালুতে আটকে, কচুরিতে গাঙ দুর্গম,—সেই আত্রেয়ী রণরঙ্গিণীর নৃত্য করে ভাদ্রের শেষে। তা'র জল ছুটে চ'লে অস্থির অধীর। নদীর বাঁকে বাঁকে মহাজনী নৌকা ভাটির টানে তীরবেগে আসে এগিয়ে, পাড়ের উপরে জল উঠে কলাবাগানে লুটোপুটি করে। নদীর গতিপথ অদৃশ্য হ'য়ে যায়, থাকে কেবল বিস্তীর্ণ জলরাশি,—আর সেই জলরাশির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় চলন্ বিল।

একদিন মধ্যাহ্নে উঠলুম চলন্ বিলে এক ভাঙ্গা নৌকায়। নৌকার ছই ভাঙা, দাঁড় ভাঙা, এবং নৌকায় জল চোঁয়ায়। চলন্ বিলের নাম শুনতুম,—এটা যেন পড়ে রাজশাহীর মধ্যে কিম্বা পাবনার সীমানায়,—সেই মানচিত্রে আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানি চলন্ বিলকে একটি খেলাঘরের সমুদ্র। কত মাইল লম্বা জানিনে, কত মাইল চওড়া তাও আমার অজানা,—তবে এ দৃশ্য জানি, বর্ষার শেষে চলন্ বিল সমুদ্রবৎ। সেবার বর্ষার আভাস এলো একদিন মধ্যাহ্নের পরে, চলন্ বিলের উপরে এলো ঝড়ের হাওয়া আর মেঘ, ঢেউ দাঁড়িয়ে উঠলো মেঘের সঙ্কেতে। ঢেউ লাফায়, তা'র সঙ্গে লাফায় নৌকা,—আর আমাদের লগিটা গেল ভেঙে, পালখানা গেল ছিঁড়ে। বিলের মাঝখানে এসেছি, এপার আর ওপার বহুদূর, আমাদের গন্তব্য তা'র চেয়েও দূরে,—দূরে নিকটে আর কোথাও নৌকা দেখা যায় না। ঝড়ের বাতাসে মেঘ এলো ঘনিয়ে। এদিকে আমাদের মাঝি আর দাঁড়ি—উভয়েই রুগ্ন, তাদের শারীরিক শক্তি একেবারেই কম, তারা একজন হাল ধ'রে রাখতে পাচ্ছে না, আর একজন দাঁড় ভেঙেছে। নৌকা বানচালের ভয়ে আমার পাহারাদার যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি গিয়ে হাল ধরলো, এবং তিরস্কার করলো দাঁড়ি-মাঝিকে। খেলাঘরের সমুদ্র সেদিন ভয় দেখালো চোখ রাঙিয়ে।

মনে পড়ছে তারাপুরের চর। পদ্মার একটা খাঁড়ি কবে এসেছিল, কবে এখানে পদ্মার প্রবাহ ছিল—সে অনেকদিনের কথা। আমাদের গরুর গাড়ী কত মাঠ পেরিয়ে গেল পদ্মার তীরে, সাতবাড়ীর ঘাটে। পথের বাঁ দিকে কত লোকালয় আর গ্রাম, কত আড়ৎদার আর জেলেদের জাল। একটি অন্তরীণে আবদ্ধ বন্দীর বাসা দেখা গেল ওই পথে পদ্মার তীরে। গোলপাতার গোটা দুই ঘর, একটি উঠোন, কিছু অবকাশ, কিছু বা শৃঙ্খল! অদূরে এক পুলিশের ফাঁড়ি। চৌকিদার গিয়ে তামাক ধরায় বন্দীর ঘরের দাওয়ায়। সাতবাড়ীর সেই মস্ত কাঁচা ঘাটে এসে পাওয়া গেল নৌকা, আমরা পাবনা ছেড়ে যাবো ফরিদপুরের সীমানায়। পদ্মায় এই আমার প্রথম নৌকায় ওঠা। বড় এক নৌকায় আমরা উঠলুম, পালে আমাদের বাতাস লাগছে। নৌকা ছেড়ে চললো সুদীর্ঘ জলপথে।

একটি পরিচিত পরিবার ষোল বছর বাস করছিল কোনো এক গ্রামে, পদ্মা থেকে একমাইল দূরে। গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু, শস্য ও সব্জীর খামার, তাঁতবোনার ঘর, ভদ্রাসনের একদিকে মন্দির, অন্যদিকে বিদ্যালয়, সামনে চণ্ডীমণ্ডপ, ওপাশে টোল। প্রায় পঁচিশ বিঘা জায়গা নিয়ে তাদের বাড়ী। ঘরের ভিতরে মস্ত মস্ত লোহার সিন্দুক, প্রচুর গৃহসজ্জা, অপরিমেয় সামগ্রীসম্ভার,—পাকা ইমারত উঠেছে দোতলা,—সর্বপ্রকারে তারা জমিদার হয়ে বসেছে! ষোল বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে, যে-সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল,—একদিন সহসা দেখা গেল, মূল ভদ্রাসনের ভিতরের তলা থেকে একটি ফাটল উঠেছে দাঁড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, লোকজন সেপাই বরকন্দাজ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো!

কিন্তু কে কী বাঁচাতে পারলো একটি দিনে? কুলনাশিনী পদ্মা ক্ষয় করেছিল মৃত্তিকার অন্তরে অন্তরে। তৃতীয় দিনের উষাকালে চৌধুরীদের সেই ষোল বছরের ভূ-সম্পত্তি ভূমিসাৎ হয়ে গেল,—যথাকালে পদ্মা তাকে লেহন করে নিল।

আমাদের নৌকা দুলছে, এদিককার পদ্মা বিস্তৃত। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের আলোছায়ার ভিতরে বাতাস খুব প্রবল। গত কয়েকদিন বৃষ্টির পরও মেঘের ভ্রূকুটি পাওয়া যায়। পদ্মার মাঝ দরিয়ায় নৌকা একবার গিয়ে পৌছলে কর্ণধার তার উপর অনেকটা যেন এক্তিয়ার হারায়, নদীর ইচ্ছা আর অভিরুচিকে মেনে চলতে হয়। আমাদের নৌকার এমন সাধ্য নেই যে, জোরে চলে। বাতাসের বেগে

কখনও সে বিপর্যস্ত, বাতাসের দমকে কখনও সে লম্ফমান। আমরা মেঘ আর বাতাসের কৃপার পথ চেয়ে ভাসতে লাগলুম।

কালুখালির ঘাটে এসে নামলুম, তখন অপরাহ্ন।—

এমনি এক অপরাহ্নে নেমেছিলুম, আর এক নদীর পারে। অণ্ডাল থেকে গিয়েছিলুম সাঁইথিয়া। সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে পার হয়ে গেলুম ময়ূরাক্ষী। ছোট নদী, বহুদূর অবধি বালুর ডাঙ্গা, বর্ষায় ঢল নামে, আবার শীতের দিনে শুকিয়ে ওঠে। আশপাশে বীরভূমের দরিদ্র অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক নরনারী ও বালকবালিকার দল। আমরা নদী-তীরবর্তী এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম, গ্রামের নাম গুম্‌তা। আড়ষ্ট, বনময়, শ্বাসরোধী,—বিস্ময়ের কথা, গ্রামখানি শ্যামলের শোভায় স্নেহশীল। সেই গ্রামের এক গৃহস্থ ঘরে আমাদের একটি রাত কেটেছিল। রামপুরহাট এখান থেকে বেশীদূর নয়। বৈশাখ এলেই মনে পড়ে ময়ূরাক্ষীর কথা,—বালুতে পরিকীর্ণ তীর, পিঙ্গলরুক্ষ, রৌদ্র-জ্বালাময় শুষ্ক নদী,—পিপাসার্ত নরনারীর অঞ্জলী ভরে না!

আর বৈশাখে মনে পড়ে তারকেশ্বর। সেই মন্দিরের পাশ দিয়ে ছোট রাস্তাটা গিয়ে থামলো দুধপুকুরের ঘাটে। ছোট ছোট যাত্রীশালা আর আশপাশে দোকান বাজার। আমরা স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুম, পথে একটা হাতী বাঁধা ছিল। সেই তারকেশ্বরে নেমে এসেছিল কালবৈশাখী, আমাদের বাসা আর কলাপাতার থাওয়া আর বাজারের জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড। কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় আর বৃষ্টিতে একটি তরুণ বালক ধর্ণা দিয়েছিল মন্দিরের ধারে,—ছয়দিন পরে সে উঠলো, তার হাতে একটি স্বপ্নাদ্য শিকড়। ছেলেটি বললে, এইটি তা'র বাবার জন্যে সে পেয়েছে; ঔষধের শিকড়টি নিয়ে চললো সে আওরঙ্গাবাদে। সেই বৃষ্টিতে আমার অসীম অপরিতৃপ্ত কৌতূহলের উপর দিয়ে ছোকরা চ'লে গেল। কিন্তু এ ঘটনাটি অনেককাল আগেকার। গিয়েছিলুম মা-দিদিমার সঙ্গে।

সকল আনাগোনা আর সমস্ত কাজের মাঝখানে যেন দূরের একটি বাঁশী অস্পষ্ট সুরে ডাকে,—তোমাকে ওই কাশীর ঘাটে গিয়ে বসতে হবে! চেৎসিংয়ের উঁচু ঘাট থেকে আরম্ভ করো। হরিশ্চন্দ্র, কেদার, গোড়েন, দেবনাথপুরা, চৌষট্টি, অহল্যাবাঈ,

দ্বারভাঙ্গা, দশাশ্বমেধ,—তারপর আরও যাও এগিয়ে। মানমন্দির, মহীশূর, মহাজন-টোলা, মণিকর্ণিকা। সব ঘাটে কত ফাটল আছে গুণেছ? কত সিঁড়ি আছে? ওই যে মণিকর্ণিকার জলে একটি পাথরের মন্দির কতকাল থেকে ডুবে কাৎ হয়ে রয়েছে, ওর ভিতরে কত প্রাচীন ইতিহাস—কত কালজয়ী প্রেম, কত অবশ্যম্ভাবী জরা, কত সুখের মৃত্যু—সমস্ত লেখা পাথরে পাথরে। কত ঘাটের সিঁড়ির নীচে কত ছোট ছোট গুহা, সেখানে শিবলিঙ্গের দল, সেখানে বর্ষাশেষের মাটি জমা। আবার কোথাও বটের ঝুরি পাথরের ফাটলের ফাঁকে নেমে এসেছে গঙ্গায়। আর ওই দূরে দেখা যায় আদিকেশব,—সেই রাঙা মন্দির,—মন্দিরের পাশে বরুণার ধারা, তা'র প্রান্তে অশ্বত্থের তপোবন, অদূরে আনিবেসান্তের শিক্ষাকেন্দ্র। আমরা নৌকায় যেতুম।

শিক্ষার আলোচনা উঠলেই গিরিবালা তা'র আলাপের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতো। নৌকায় ব'সে অভিযোগ জানিয়ে সে বলতো, দাও না আমাকে ওই কলেজে ভর্তি ক'রে? ভগবতীবাবুর মায়ের সেবা নিয়ে থাকলে ত' আমার দিন চলবে না? আমাকে পড়তে দাও, আমি শিখবো, আমি জানবো সব।

আদিকেশবের থেকে আমাদের নৌকা চলে দশাশ্বমেধের দিকে। আমি বললুম, তুমি যা শিখেছ সেও ত' কম নয় গো।

গিরিবালা উত্তেজিত হয়ে বলে, ছাই, কিছু না, ওর এক কড়াও দাম নেই। মন্ত্র পড়তে শিখেছি, শিখেছি পৈতে কাটতে আর সল্‌তে পাকাতে। ছাই, ছাই আর পাঁশ। তুমি ত ছাপাখানায় চাকরি নিলে, মেয়ে মানুষের চাকরি বুঝি নেই এদেশে?

হাসিমুখে বললুম, চাক্‌রি ক'রে খাওয়াবে কা'কে শুনি?

গিরিবালা ওপারের বালুডাঙ্গার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, খাবার কেউ নেই, তার জন্যে দুঃখুও নেই। নিজে খেতে জানিনে? নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিনে? দাও আমার শেকল খুলে, বাঁধন কেটে!

আমি চুপ ক'রে রইলুম। নৌকা চলেছে আমাদের মাঝনদীতে;—দূরের কোনো কলরব শুনতে পাচ্ছিনে। কাশীতে তখন শীত পড়েছে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে গিরিবালা বললে, তোমরা সবাই গুছিয়ে নিলে, সবাই এগিয়ে গেলে। আর আমার জন্যে কী রাখলে?—জপ, আর তপ! ছাই, আর পাঁশ। মন্দিরের পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুটো হয়ে গেল, তা দেখেছ?

বললুম, কপাল ফুটো তোমার আগেই ত' ছিল!

না, না—উত্তেজিত গিরিবালা একদিন বললে, কপাল ফুটো নিয়ে আসিনি,—কপাল ফুটো ক'রে দিলে মানুষ!—থাক্, পরের নিন্দে করব না; কিন্তু আমাকে বাঁচতে দাও,—যেমন ক'রে বাঁচতে আমার ভালো লাগে, তেমনি ক'রে বাঁচতে দাও। পায়ের তলায় আর তোমরা ফেলে রেখোনা।

কথা কইতে কইতে আমাদের নৌকা ওপারের বালুডাঙ্গার ধারে এসে লাগলো। মাঝি আমাদের পরিচিত, সে নৌকা রাখবে। আমরা নেমে গেলুম বালুচড়ায়। উঁচু নীচু বালুচড়া, কোথাও খোন্দল, কোথাও পাড়। ওপারের ঘাটগুলিতে দীপমালা জ্বলছে, তা'র সঙ্গে চুপড়িতে ঢাকা আকাশ প্রদীপ। এপার জনশূন্য, তৃণশূন্য! এপারে জ্যোৎস্না ছাড়া আর কিছু নেই। একটা চিত্তক্ষোভ আর উত্তেজনা সেই জ্যোৎস্নায় যেন ঘুলিয়ে উঠেছে!

গিরিবালা বললে, পরের কাজ? ও আর আমি পারিনে! বিশু নতুন বিয়ে করেছে, আমার ডাক পড়লো তা'র ঘরকন্না গুছিয়ে দিতে। গুরুমাসীর দুই পা বাতে পঙ্গু, আমি গেলুম দু'বেলা তা'র সেবা করতে। আর আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না। এবার আমি লেখাপড়া শিখবো।

বললুম, লেখাপড়ার এত সখ কেন তোমার?

খুব সহজ কথা! গিরিবালা বললে, সেদিন তোমাকে দুর্গাবাড়ীতে ব'সে যা বলেছি,—আমি উঠতে চাই, নিজেকে টেনে তুলতে চাই, আমার এই সাধে তোমরা বাদ সেধো না, দোহাই তোমাদের।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে কি তোমার কাজ কিছু হবে?

গিরিবালা বললে, তুমি মনে করেছ এপারে এসেছি তোমার সঙ্গে মিষ্টিকথা বলতে?

বললুম, অমন দুরাশা আমার নেই।

গিরিবালা এবার হেসে বললে, এপার-ওপার কোনোপারেই মিষ্টিকথা নেই। আর—মিষ্টিকথা মানেই ত' মিছে কথা!

কিছুক্ষণ পরে গিরিবালা বললে, এ গঙ্গায় নয়, কাশীর গঙ্গায় অনেক পাপীর ময়লা ভাসে। তুমি আমাকে আর কোনো জলায় নিয়ে যেতে পারো, যেখানে দিনরাত ডুব দিই? তুমি বলেছিলে আমাকে দেশের সব নদী দেখাবে? সব নদীতে আমি ডুববো, সব নদীতে ভাসবো!

বললুম, এমন সাধের কারণ?

আমার মনের কথা যেন সব ধুয়ে যায়, সব পাপ ভেসে যায়! আর আমি পারিনে। আমাকে উদ্ধার করো। আর আমি এখানে থাকবো না।

বললুম, কালভৈরব নিশ্চয়ই তোমাকে তাড়া করছে!

কিন্তু গিরিবার এই অশান্ত বিক্ষোভ আবার থেমে যেতো। কাশী ছেড়ে কোথাও সে নড়তো না। বৃন্দাবনী চাদরখানা গায়ে চড়িয়ে সে ব'সে থাকতো কেদারঘাটের কথকতার আসরে, সন্ধ্যার পরে লুকিয়ে ঠাকুর প্রণাম সেরে সে চ'লে যেতো তা'র ডেরায়। আড়ালে দেখেছি তাকে শান্ত, নম্রভাষিণী, পরের হিতচিন্তা ছাড়া যেন তা'র আর কিছু কাম্য থাকতো না। কিন্তু সে যখন নৌকায় উঠতো, তাকে কেমন যেন মনে হোতো বিদ্রোহিনী! তা'র চোখে মুখে কাঠিন্য, কেমন যেন কর্কশ চাহনি,—জলের ভিতরে চেয়ে নিজের প্রতিবিম্বিত চেহারাটাকে সে যেন ঘৃণা জানাতো। জলের উপরে এসে বসলে তা'র অসম্ভব তৃষ্ণা জাগতো, তা'র ক্ষুব্ধ লুব্ধ মনের কেমন একটা অসহ্য পিপাসা! সে নিজের পায়ে দাঁড়ালো না, মানুষ হোলো না, পথ চলতে পারলো না,—তার দুরাশা, ইচ্ছা, কল্পনা, উচ্চাশা—সমস্তটাই অপূর্ণ রয়ে গেল। সে কী হতে চেয়েছিল, কী হয়ে উঠতে পারলো না,—গঙ্গা ছাড়া তার আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। অথচ গঙ্গাকেও সে ছাড়লো না।

গিরিবালাকে সেবারের মতো শেষবার দেখেছিলুম মানমন্দিরের ঘাটের নীচে। সেদিন পূর্ণিমা। ঘাটপাণ্ডার এক ছাতার নীচে কাঠের পাটাতনে সে বসেছিল। পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, ডান হাতে পুঁটলি কিসের? মালা-জপ করা হচ্ছে বুঝি?

হাসিমুখে গিরিবালা ইসারায় জানালো, একটু অপেক্ষা করো, পরে জবাব দেবো। বুঝলুম, বোধ হয় ইষ্টমন্ত্র জপ করছে।

মানমন্দিরের চূড়ার উপরে বাঁশী ধরেছে! পূর্ণিমায় এই বাঁশী বাজতো নিয়মিত। গিরিবালা ব'সে রইলো জপের পুঁটলি হাতে নিঃশব্দে, এবং আমিও সিঁড়িটার ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। বাঁশীর মধুর গভীর সুর নামছে গঙ্গায়,—জলের মধ্যে যেন সেটা বাজছে যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তর,—আমরা মাঝে মাঝে শুনতে পাই নে!

বাঁশী থামার পর অনেকক্ষণ বাদে আমরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলুম। কিন্তু আমাদের মুখে কথা আর কিছুই যেন জাগলো না, সব কথা যেন বাঁশীর আশাবরীর সঙ্গে গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। গিরিবালা অগ্রসর হয়ে বললে, আমি যাই—

আমি বললুম, আমার চিঠি এসেছে, এখানকার চাকরি ছেড়ে কাল আমি কলকাতা রওনা হচ্ছি।

গিরিবালা দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করলো না। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে উঠে কালীতলার গলির আঁকাবাঁকা পথে চ'লে গেল হন্‌হন্‌ ক'রে।

*

* *

শ্রীদামের সঙ্গে গিয়ে বসতুম বাগবাজারের ওই ষ্টীমারঘাটের পাশে। ওখানকার ঢালুর পাড়ে বটের নীচে একটা নালার মুখ ছিল সিমেন্ট্-বাঁধানো—সেইটি ছিল আমাদের সন্ধ্যার আসন। ওইখানে ব'সে আমরা ধূমপান করতুম। আমাদের ধূমপান ছিল সকল সংস্কারমুক্ত। রসসাহিত্যে শ্রীদামের প্রগাঢ় আসক্তি দেখতে পেতুম। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল তার। ছোট, বড়, মাঝারি—সকল কবি ও উপন্যাসিকের সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ ছিল তা'র নখদর্পণে; অপরের রচনার অংশ অনর্গল সে মুখস্থ ব'লে যেতে পারতো। কিন্তু মুস্কিল এই, যাকে ইংরেজিতে বলে, টলারেশন্—সেটি শ্রীদামের ছিল কম। তাকে যে বিদ্রূপ করেছে, কিম্বা তাকে আনন্দ দিতে যে পারেনি, অথবা কৃত্রিম প্রচারকার্যের সাহায্যে যারা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে চলেছে,—শ্রীদাম এমন ব্যক্তিকে কোনও প্রকারেই বরদাস্ত করতে পারতো না। যারা জাত-লিখিয়ে, যারা ঘষে-মেজে লিখতে শিখেছে, যে সকল অপদার্থ কেবল মক্স করার অভ্যাস আর অনুশীলন থেকে লেখকপদবাচ্য হয়ে উঠেছে,—অথবা ভালো লেখক হয়েও যারা প্রতিকূল অবস্থার থেকে মাথা তুলতে পারছে না,—এমন প্রত্যেক লেখককে সে চিনে বার করতো। হয় তাদের সে ভালোবাসতো অন্ধের মতন, নয়তো ঘৃণা করতো উন্মাদের মতন। অনেক সময় আমি তাকে সামলে রাখতে পারতুম না।

তাকে প্রশ্ন করতুম, ভালো সাহিত্য-সমালোচক তুমি কা'কে বলো?

শ্রীদাম বলতো, রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচারে যে-ব্যক্তি তা'র রচনাশক্তি আর প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছে, তা'কেই ভালো সমালোচক বলবো। বাদবাকি সব ঝুটো, মেকি, অপদার্থ! বঙ্কিমচন্দ্রের গোয়ালে জাবর কেটে দু' একজন খিস্তিবাজ লোক নতুন লেখক-দের গাল্ দিয়ে সমালোচক হচ্ছে, কিন্তু তারা না এ-যুগের, না-সে যুগের, তারা ত্রিশঙ্কু!

শ্রীদামের ব্যক্তিগত আক্রমণ ভারি কর্কশ ছিল। আমি ওটায় আনন্দ পেতুম না, একথা সে জানতো। একসময় রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা তুলে সে প্রায়শ্চিত্ত করতো।

ওই পল্লীটি ছিল শ্রমিকপ্রধান, সুতরাং আমরা বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম না। সেটা আমাদের আয়োজন আর আহরণের কাল, আমরা ঘুরি ঘাটে ঘাটে, শ্মশানে মশানে—আমাদের জীবনযাত্রা ছিল লোকচক্ষের অন্তরালে, গতিবিধি থাকতো গোপন। হয়তো এক সময় শ্রীদাম দুই চোখ রাঙা ক'রে প্রশ্ন তুলতো, যে-জীবনে দায়িত্ববোধ জন্মালো না, সে-জীবনটা কেমন?

প্রশ্নটা যেন ছুঁয়ে থাকতো গঙ্গার নৌকায়-নৌকায়, আর পশ্চিমের পাণ্ডুর বর্ণ-রেখায়। সে বলতো, কোন্‌টায় সাড়া ওঠে তোমার মনে? মানুষের আনন্দলোক না জীবনমূলের দুঃখবাদ? কিন্তু একি সত্যি নয় যে, সকল সাহিত্যের জন্ম বেদনা-বোধ আর বিয়োগান্ত থেকে?

শ্রীদাম অস্থির হয়ে বেড়াতো। নিজের ভিতরে ছিল তা'র প্রচণ্ড বিরক্তি আর অস্বস্তি; সে কারও মান রেখে অথবা মুখ চেয়ে কথা বলতো না। সত্যকার পদার্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য এক-এক সময়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো—বহু অপদার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতো। তারপর একদিন ফিরে আসতো ক্লান্ত হয়ে, যেন বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্য সঙ্গে নিয়ে। সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো ছোট-বড় সবাইকে। ফিরে এসে সে বলতো, মানুষ যে দেবতা নয়, এটা কবে শিখবো বলোতো? এত ছোট ওরা? দূরের থেকে মনে হয় মহতোমহীয়ান্, কাছে গিয়ে দেখি কীটানুকীট!

শ্রীদাম তাদেরই একজন, যারা কোনোকালে সামাজিক মানুষ হ'তে চাইলো না,—যারা নিঃস্বের দলে আর বঞ্চিতের পাড়ায় ঘুরে ঘুরে নিজেকে খরচ করলো। শ্রীদামের চোখে চশমা ছিল, তা'র একদিকের ডাঁটিভাঙা, অন্য ডাঁটির এক অংশ সুতোবাঁধা। ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া আর ময়লা কাপড় জামা নিয়ে শ্রীদাম কোনোদিন লজ্জাবোধ করেনি। পথে পথে খেয়েছে চা, আর মাঝরাত্রে উপোস ক'রে বিছানা নিয়েছে। যে-দিন তা'র পকেটে আনা দুই পয়সা, সেদিন তা'র মস্ত উৎসব। সে বলতো, মা গঙ্গা সাক্ষী, আমি যেন কোনদিন রোজগার না করি।

বলতুম, তোমার চলবে কি ক'রে?

শ্রীদাম জবাব দিত, কাক-চিল-শকুনি এদের চলে, আমার চলবে না?

শিক্ষিত সমাজে তা'র আদর ছিল তার অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য। কিন্তু প্রত্যেকটি লোককে সে ঘৃণা করতো মনে মনে। অনেক সময়ে দেখতুম শ্রীদাম তলিয়ে গেল অনেক নীচেকার নোংরায়—ভাঁড়, চাটুকার, ফড়ে, দালাল, ভাটিখানার

লোক, জুয়াড়ী, গাড়োয়ান, হোটেলের চাকর, পানওয়ালা,—এদের মধ্যে ঢুকে নেশা ক'রে সে বুঁদ হয়ে থাকতো; আবার সে উঠে আসতো ভদ্রসমাজে ওর অসামান্য বিদ্যানুরাগ নিয়ে। শ্রীদামকে দেখে মাঝে মাঝে বিস্মিত হতুম।

এতকাল পরে শুনছি শ্রীদাম নেই! শ্রীদাম একেবারেই নিরুদ্দেশ।

পরম্পরায় তার সম্বন্ধে যা' শুনতে পেলুম, তা এই। সবাইকে এতকাল ধ'রে সে ঘৃণা ক'রে এসেছে। কিন্তু একদিন রাত্রে আকণ্ঠ মদ্যপান ক'রে সহসা সে উপলব্ধি করলো, সে নিজে সকলের কাছে ঘৃণ্য এবং উপেক্ষিত। এই চিন্তা তাকে আর স্থির থাকতে দিল না। শেষ রাত্রের দিকে তা'র ডাঁটিভাঙ্গা চশমা-জোড়া খুলে রেখে একখানি ধুতি পরণে জড়িয়ে খালি পায়ে পথে বেরিয়ে কোথায় যেন সে চ'লে গেছে। দু'বছর হ'তে চললো তা'র সন্ধান মেলেনি। একজন বিশিষ্ট বন্ধু জানালো, গঙ্গা থেকে তার বাড়ী বেশী দূর নয়, রাত তিনটে লাগাৎ গিয়ে সে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছে!

শ্রীদাম যদি কোনোদিন ফিরে আসে, আমার এই লেখা সেদিন পরিবর্তন ক'রে দেবো। কিন্তু মনে হয়, গঙ্গায় ডুবেই সে তা'র চিরজর্জর দেহের বিনাশ সাধন ক'রে গেছে। গঙ্গা ছিল তার বড় প্রিয়। ওই ষ্টীমারঘাটের পাশে সিমেণ্ট বাঁধানো আসনে ব'সে দেখেছি তা'র কণ্ঠে মহাকবির কবিতা জ্বলে উঠতে—

"ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর থাক পড়ে তীরে—
তাকাসনে ফিরে।
সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"

*

* *

মথুরার বিশ্রাম-ঘাট আর বৃন্দাবনের কালীয়দমনের সেই ভাঙ্গা ঘাট। সেই যে আমরা হেঁটে গিয়েছিলুম— আমি আর সাধু। কিছু চড়া রোদ, কিছু বট আর মহুয়ার ছায়া, ভাঙ্গা পাথরের ঘাটে কিছু পৌরাণিক প্রাচীনের স্বাক্ষর; তা'র সঙ্গে

ধীর-সমীর আর বংশীবটের কতকালের স্মৃতি ধূলোয় ঘুরে বেড়ায়। বালু-প্রান্তরের কোলে বিশীর্ণ যমুনা, ওপারে কত বন, কত বনান্তর—এপারে কত উত্থান-পতনের কাহিনী পাথর আর মৃত্তিকার স্তরে স্তরে। কী নির্জন, কী নিস্তব্ধ ঘাট, কী একাকিনী যমুনা, সমুদ্রপরিমাণ অতীত কাহিনী বায়ুতরঙ্গের দোলায় দোলায়। সাধু একান্ত একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে একসময়ে ব'লে বসতো, তুমি ফিরে যাও, আমি যাবো না!

সাধু গিয়ে বসলো কন্‌খলে দক্ষরাজ ঘাটে। সেখানে বটের ছায়ার নীচে উপল-মুখরিত গঙ্গার ধারা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে কল-উল্লোলে ছুটে চলেছে। অদূরে গঙ্গায় অসংখ্য ধারার কোলে কোলে বাবলার বন, ওপাশে চণ্ডীর পাহাড়, এধারে হৃষীকেশের পথ। সাধু দেখে শুনে বললে, আমাকে আর পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে যেয়ো না। এখানকার গঙ্গায় আমি ঘুরে বেড়াবো, থাকব ওই মুনিদের আশ্রমে।

সাধু চললো গঙ্গার ধার দিয়ে গুরুকুলের পথে। সেইখানে নিরিবিলি এক ঘাটের ধারে ব'সে সে গান ধরলো—

"বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে-যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না?

* * * *

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ;
তেম্‌নি ক'রে আমার হৃদয়-ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না?"

হরিদ্বারের ধর্মশালায় প'ড়ে বারান্দায় শীতে কুঁকড়ে আছি হয়ত কম্বলের মধ্যে। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বারান্দায়, নীচে শুনছি গঙ্গার জলের শব্দ, পাথরে পাথরে উচ্ছ্বাস-কল্লোল। ওপারের বনময় পাহাড় থেকে হয়ত রাতজাগা কোনো পাখীর ডাক, কিম্বা নামহারা কোনো জানোয়ারের কণ্ঠস্বর, কিম্বা অড়হরের ক্ষেতের ভিতর থেকে আরণ্যক হরিণের আওয়াজ। এমন সময় হয়ত আমারই মতো জেগে রয়েছে সাধু। রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে ভুলে গিয়ে আর সকলের ঘুমের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সে হয়ত গান গেয়ে

উঠলো, "চিত মনমে তেরে ধরতি উঁ, সদা সাধু সেবা করতি হুঁ—প্রভু, আও, আও, আও! মীরাকো প্রভু সাচ্চি দাসী বানাও।"

সে কী যন্ত্রণা তা'র কণ্ঠে, কী আতুর, কী কাতর সে! লোকলজ্জা—কিছুই সে মানতোনা, এক সময় উঠে এসে সে ধরে বসে, চলো ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে গিয়ে বসি!

রাগ ক'রে বলতুম, তোমার ঐ শ্মশান-বৈরাগ্য রাখো, ঘাটে গেলে এখনি পুলিশে ধরবে! যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়োগে।

কম্বলখানা জড়িয়ে আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়তুম, ইচ্ছে ক'রে নাক ডাকতুম—পাছে সে আবার অনুরোধ করে। কিন্তু অনেক দিন ভোরে উঠে দেখেছি, সাধুর দুই স্বপ্নাতুর চোখের উপর দিয়ে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে গেছে।

সাধু আমাকে না ব'লে বেরিয়ে পড়তো যেখানে-সেখানে, আমিও তা'র সঙ্গ নিতুম না। খোঁজ পেতুম সে গিয়ে ব'সে থাকতো লালতারাবাগে মহারাজজির আশ্রমে, কিম্বা সেই বৃক্ষচ্ছায়াময় ভাঙ্গা ঘাটের পৈঠায়। নানা উদ্ভট প্রশ্নে সে সন্ন্যাসীদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো। এক একদিন দেখতুম সে গঙ্গার ধারা বেয়ে গিয়ে ভীমগোড়ার পথের ধারে মস্ত বড় পাথরখানার উপরে বসেছে, আর কয়েকটা বানরকে ডেকে খাওয়াচ্ছে ছোলা আর দানা,—ওইতেই তা'র আনন্দ। ব্রহ্মকুণ্ডের ওই সাঁকোটায় দাঁড়িয়ে প্রায়ই সে আটার গুলি খাওয়াতো হাজার হাজার মাছকে। সন্ধ্যার দিকে সে যখন যেতো কোনো মন্দিরে, কিম্বা কোনো বিভূতিভূষণ সন্ন্যাসীর ধুনির আসরে, আমি তখন কুশাবর্তের সিঁড়ির ধারে ধূমপানে তন্ময় থাকতুম। সাধু দূরে স'রে যেতো, অনেক দূরে—আমার নাগালের বাইরে, বহু চেষ্টাতেও আমি যেন তা'র নাগাল পেতুম না। অনেক সময় দেখতুম, তা'র চারদিকে কয়েকজন মেয়েপুরুষ জড়ো হয়েছে, আর সে গান ধরেছে মধুর কণ্ঠে। গানে সে পাগল, রসের আনন্দে সে বিহ্বল।

সাধুর জন্ম বাংলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে, একটি নদীর তটের ধারে ছিল তাদের ভদ্রাসন,—নদীর ভাঙনে সেই ভদ্রাসন লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সাধুর বাল্যকাল কাটলো ওই নদীতে। নদীর খরস্রোত তা'র চোখে মুখে কেমন এক প্রকার বন্যতা এনে দিয়েছিল, তা'র প্রকৃতিতে এনেছিল অস্থিরতা। চঞ্চল আর উদ্দাম জীবনে সে ছিল অভ্যস্ত।

একবার দিন দুই তাকে পথে ঘাটে আর দেখছিনে। একটু সন্ত্রস্ত হয়ে আমি গঙ্গার তীর ধ'রে বেরিয়ে পড়লুম। লছমনঝুলার ধারে লক্ষ্মণের মন্দিরে তাকে খুঁজে

পাওয়া গেল। দুদিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে ঋষিকুলের আশ্রমে আশ্রমে। যা খাবার নয় তাই সে খেয়েছে, যেখানে থাকার নয় সেখানে থেকেছে। আজ সকালে জন পনেরো সাধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের হাতে পরিবেষণ ক'রে তাদের পুরী, দই আর মুগের লাড্ডু খাইয়েছে। বললুম, পয়সা কড়ি পেলে কোথায়, সাধু?

সাধু মুখভরা আর বুকভরা আনন্দের হাসি হাসলো। বললুম, এবার ফিরে চলো?

সাধু বললে, না।

নীলধারার উঁচু পাড়ে একটি সুন্দর নূতন বাড়ী রয়েছে, তা'র বারান্দার নীচে—অনেক অগাধ নীচে আত্মহারা গঙ্গা,—তারই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সাধু বললে,—

"বারে বারে চাইবো না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার করা পিছন পানে।
বাসা বাঁধার বাঁধনখানা যাক্ না টুটে',
অবাধ পথের শূন্যে আমি চলবো ছুটে।
শূন্যভরা তোমার বাঁশীর সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পুরে।"

সেবার হরিদ্বার থেকে সাধুকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তারপরে সাধু আমার সঙ্গে গিয়েছিল শুক্লপক্ষের শেষে তাজমহল দেখতে। সে কথা পরে বলছি।

কিন্তু সকল প্রকার ভ্রমণের মাঝখানে আবার কাশী গিয়ে ওই দশাশ্বমেধের পাশে ঘোড়াঘাটে গিয়ে বসতুম। ওখানে সন্ধ্যার পরে আলো থাকতো কম, মাঝিমাল্লারা নৌকার মধ্যে আলো জালিয়ে বিশ্রাম নিতো, ভজন আলাপ করতো। এপাশে-ওপাশে চুণার থেকে আনা পাথর স্তূপাকার হয়ে থাকতো। আর তারই একপাশে অন্ধকারে নিরিবিলি আমাদের সঙ্গোপন ধূমপানের আসর জমে উঠতো। আমরা সংসারহারা জীবনবৈরাগীর দল, এই ঘোড়াঘাট আর দশাশ্বমেধ দ্বারভাঙাঘাট ছাড়া জীবনের আর কোনো ঘাটেই আমাদের ঠাঁই হয়নি। ছায়ারা কেঁপে বেড়ায় গঙ্গার অন্ধকারে,—কত ভুল, কত ভ্রূকুটি, কত মূঢ় প্রশ্ন, কত অবান্তর পরিকল্পনা, কত খেইহারা আর

কূলহারা স্বপন। কে আগে কথা কইবে? কেউ না,—সবাই নীরব; আমাদের ধূমপানের অগ্নি-আভাটাকে অন্ধকারে মনে হোতো, মণিকর্ণিকার চিতাগ্নির অবশেষ। যেন সব পুড়ে ছাই হচ্ছে ওই বৈতরণীর তীরে,—আশা, বিশ্বাস, আদর্শ, প্রচলন-নীতি! আমরা কিছু মানিনে, কিছু রাখিনে। কেমন যেন মনে হয়, কাশীর ওই ঘাটগুলোর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কত নৈরাশ্যের দাগ, কত আনন্দের শেষ অবশেষ, কত বেদনায় কণ্ঠরোধ-করা স্মৃতি, কত জীবনের নিষ্ফল নিত্যক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। ওখানে মাথা ঠুকেছি পাথরে পাথরে, ওখান থেকে জাল ফেলেছি অসীমের দরিয়ায়, ওখান থেকে শুনেছি কত বাঁশীর কত ডাক, ওখানকার কত মাটি তুলে নিয়েছি কপালে, কত প্রতিজ্ঞা মেনে নিয়েছি জীবনের, ওখানে ব'সে আমরা কত মানুষের উত্থান-পতন বিচার ক'রে দেখেছি। যাদের সঙ্গে বসতুম ওখানকার অন্ধকার ঘাটে ঘাটে, তাদের মাঝে মাঝে মনে হোতো, তারা এ পৃথিবীর নয়—তারা যেন কোন্ গ্রহলোকের,—তাদের চিনতে পারতুম না। কেউ ছিল মহৎ জীবনের একটা বিপুল ভগ্নাবশেষ, কেউ প্রেতাত্মা, কেউ বা ছায়াচারী। আমাদের ধূমপানের আগুনটাকে মাঝে মাঝে মনে হোতো, এটা যেন যজ্ঞাহুতাগ্নি—আমরা যেন ঘিরে তাকে বসেছি তপোবনের ঋত্বিকের দল। আমরা মানবসভ্যতাকে, মনুষ্যত্বকে, স্বভাবধর্মকে, জীবনোত্তীর্ণ কোনো বিরাট আদর্শ কল্পনাকে বিচার করতে ব'সে গেছি!

সেই ঘাটগুলি আজো আছে, কাশীর সেই গঙ্গাও। আমরাও সেই ঘাটের ধারে আজো গিয়ে দাঁড়াই। তবু আমরা সেখানে যেন আর নেই, কে যেন আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের অনেক ভেঙেছে, অনেক ছাঁচ বদলে গেছে, অনেক হারিয়েছে। ওই গঙ্গার আবর্ত আজো পাথরে পাথরে ঘুরে ঘুরে চ'লে যায়, আজো তা'র তীরে ব'সে সন্ন্যাসী আর ভৈরবীরা জপ করে, সন্ধ্যায় কথকতার আসর বসে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবেরা কীর্তনের পালা গায়,—আছে সব, আছে সবাই,—কিন্তু আমরা আর নেই। আমাদের পায়ের দাগের ওপর পড়েছে কত সহস্র পদচিহ্ন, ওখানকার পাথরের ফাটলে আমাদের পুঞ্জীভূত নিশ্বাস কত নিশ্বাসের ছোঁয়ায় মিলিয়ে গেছে!

যোগীনদাকে মনে পড়ছে! শীতের সকালে গোড়েনঘাটের মধুর রৌদ্রে ব'সে তিনি বললেন, কীর্তিনাশ কাকে বলে জানো?

আমরা সবাই চুপ ক'রে রইলুম। যোগীনদা বললেন, মহৎ আদর্শের অপমৃত্যু, কী যন্ত্রণা যে তার! বিষ আকণ্ঠ হয়ে উঠলো, সব ম'রে গেল একে একে!

সেই শক্তিকে আহরণ করতে হবে সূর্যের হৃদপিণ্ড থেকে—যার মৃত্যু নেই, জরা-ব্যাধি নেই, বিকার নেই,—সেই দুরন্ত শক্তি! দেহে, মনে, মস্তিষ্কে সে-শক্তি সঞ্চালন করা দরকার,—এ জাত সেইদিনই বাঁচবে; সেইদিন সকল বিরূপকে বিনাশ করতে পারবো!

যোগীনদাকে জানতুম, আগেকার কালে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লববাদী নেতা। তিনি চেঁচিয়ে বলতেন, সকলের আগে চাই উদ্ধার,—পাপ, চিত্তগ্লানি, ঈর্ষা, সন্দেহ, কলহ,—এদের থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তি! আমাদের গঙ্গায় কেন এত পুণ্যধারা? হোমের আগুনে কেন এমন শুচিতা? এর অর্থ আছে বৈকি, সেটি পরমার্থ! আমি গ্রহণ করবো সকলের আগে সূর্যকে, গ্রাস করবো সূর্যের আলো, পান করবো সূর্যের রশ্মি!

যোগীনদা অনেক সময় একা একা গঙ্গায় ঘুরতেন। কী রহস্য দিয়ে তিনি ঘেরা, কী অজ্ঞাত অতীত তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাসে। তিনি কারাজীবন যাপন করেছেন বহুদিন, রাজবন্দী ছিলেন কয়েক বছর—লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেছেন অনেক। অনেক নেতা পু'ড়ে পু'ড়ে খাঁটি হন্, অনেক নেতা পু'ড়ে পু'ড়ে হন্ অঙ্গার। যোগীনদা ছিলেন শেষের দলে। রাজনীতিক ছিলেন না তিনি, তিনি ছিলেন বিপ্লববাদী। তিনি বলতেন, কীর্তিকে চিনে নেবো কাশীর এই পাথরের কষ্টিপাথরে, নিজেকে বিচার ক'রে নেবো গঙ্গায় ধুয়ে! আমি চাইলুম প্রকাণ্ড বিপ্লব, কিন্তু কী মিথ্যে, কী ব্যর্থ!

সেই যোগীনদা হঠাৎ একদিন আমাদের সংস্রব ত্যাগ করলেন। তিনি ঘাটে ঘোরেন একা একা। কোনো জনহীন ঘাটে একা এক পাথরের কোটরে ব'সে তিনি চেয়ে থাকেন উর্ধ্বে—দুই চোখ মেলে থাকেন সূর্যের দিকে স্থির হয়ে। সূর্যের গোলকটি আপন চক্ষুতারায় প্রতিবিম্বিত করেন। একদিন দেখি যোগীনদা আশ্রয় নিয়েছেন দশাশ্বমেধের রাস্তার কোণে বিশ্বনাথের গলির সামনে ওই উঁচু রোয়াকে—সেই বুড়ো সন্ন্যাসীর পায়ের তলায়। যোগীনদা সারাদিন উপবাস ক'রে প'ড়ে থাকেন। তিনি যে ভিখারী নন্, পাগল নন্, তিনি যে ওই সন্ন্যাসীর সাধারণ চেলা নন্—এ শুধু আমরাই জানতুম। কিন্তু এ কথা জানতুম না কোন্ খাদ্যের অভাবে তিনি নিত্য উপবাসী! শুধু দেখতুম মাঝে মাঝে দশাশ্বমেধ ঘাটে গলাজলে দাঁড়িয়ে কী যেন মন্ত্র তিনি পাঠ করছেন। আমরা কাছে যেতে ভরসা পেতুম না।

বহুকাল পরে খড়্গপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে একদা রাত তিনটে লাগাৎ সহসা আচমকা তন্দ্রার ঘোরে দেখেছিলুম, সামনে দাঁড়িয়ে এক পাগল—কদাকার, বীভৎস,

জটাজটিল, ছিন্নজীর্ণবাসা,—আমার দিকে চেয়ে সেই পাগল হাসিমুখে বললে, পয়সা দে!

চিনতে না পেরে ভয় পেয়ে ওয়েটিং রুম্ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তখনই চিনলুম—সে যোগীনদা! আমি পায়ের ধূলো নিলুম, কিন্তু যোগীনদা আমাকে চিনতে পারলেন না। আপন মনে কী যেন প্রলাপ বলতে বলতে তিনি স্টেশন থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কোন্ দিকে চ'লে গেলেন।

কাশীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আজ মনে পড়ে তাদের, যারা জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পেলো না। যারা চ'লে গেল সকল ঘাট ছেড়ে, যারা তলিয়ে গেল কোন্ অজানায়। কেউ ঘট ভ'রে নিয়ে গেল, কেউ ঘট ভেঙে রেখে চ'লে গেল! কেউ ওই গঙ্গার জলে দিয়ে গেল সব, নিয়ে গেল না কিছু। ওই জলকল্লোলে কারো হাসির কলকণ্ঠ শুনি, কেউ আজো কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ওখানকার সকল ঘাটের জলের উপরে লেখা রয়েছে আমাদের মর্মান্তিক ইতিহাস, আমাদের সমগ্র যৌবনকালের চূর্ণ ভগ্ন স্বপনের দল আজো গঙ্গার ঘূর্ণীজলে আবর্তিত। ওখানে জীবনের জুয়া নিয়ে বসেছিল আমাদের বন্ধু প্রসন্ন। সেই উদার মহৎপ্রাণ যুবক। কোনো ঘাটে স্থির হয়ে সে দাঁড়াতে পারলো না, কোনো বাঁধনকে সে স্বীকার করলো না; সংসারের কোনো আদর্শে, কোনো নীতিতে সে আস্থাবান থাকলো না,—সমস্তটাকে সে তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দিল। সেই ঈশ্বরবিদ্বেষী, গৃহবিদ্বেষী, ইংরাজবিদ্বেষী প্রসন্ন! তা'র সেই বিদ্যানুরাগ, তা'র সেই মননশীলতা, প্রখর পাণ্ডিত্য, উচ্চ রাজনীতিক আদর্শ, মূঢ় মূক জনসাধারণের প্রতি তা'র হৃদয়ের সেই একাগ্র নিষ্ঠা! কিন্তু প্রসন্ন ঘৃণা ক'রে গেছে সকল প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে, আর স্বার্থপ্রণোদিত শৃঙ্খলারক্ষাকে।—তা'র চারিদিকের দুর্নীতি আর ভীরুতা, অন্যায় আর অপমান, উৎপীড়ন আর অনাচার,—একদিন প্রসন্ন আর বরদাস্ত করলো না। নীলকণ্ঠের মতো সে বিষপান করলো, মহাতপস্যায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। স্বেচ্ছায় প্রসন্ন মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিল।

কাপুরুষ তা'কে বলবো না কোনোদিন,—স্বেচ্ছামৃত্যু কাপুরুষতা নয়। যা'র মহৎ আদর্শ পদে পদে মার খায়, যার নিঃস্বার্থ জীবনানুরাগ পদে পদে চারিদিকের শয়তান-শক্তির দ্বারা অপদস্থ হয়, যার সত্যকার প্রতিভা অশোভন আত্মপ্রচারে কোনকালে নিজেকে হীন করলো না, করতে পারলো না,—নিঃশব্দ স্বেচ্ছামৃত্যু ছাড়া তা'র সান্ত্বনা

কোথায়? আত্মহত্যা আর আত্মোৎসর্গ—এ দুটোর মধ্যে অনেক প্রভেদ! প্রসন্ন চরম মুক্তি বরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

আর পুড়ে গেছে আমার সেই দিদি ওই মণিকর্ণিকার ঘাটে।

আমার কাশীর বড় আশ্রয় ছিল ওই দিদি। প্রভাতে প্রতিদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখতুম দিদিকে—সদ্যস্নাতা, চৌষট্টি যোগিনীর জল তখনও দিদির এলোকেশ বেয়ে ঝরে পড়ছে, পরণে রাঙাপাড় তসরের শাড়ী, কপালের ঠিক মাঝখানে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। দুর্গাপ্রতিমাকে আমার মনে প'ড়ে যেতো। দিদির হাতে থাকতো একটি তামার ঘটি, একটি কুশি, আর কোঁচড়ে ভিজা আতপ চাল। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান সেরে দিদি পথের দু'ধারে অসংখ্য শিবের মাথায় জলের ছিটে আর আতপ চাল চিমটি ক'রে ফেলে ঘুরতো—ওতে নাকি পুণ্য হয়। দিদির মুখে শিবের মন্ত্র লেগে থাকতো। অপরাহ্নের দিকে দিদি যেতো গঙ্গায় একখানা গরদের চাদর জড়িয়ে। সেখানে মেয়েরা দিদিকে ঘিরে বসতো,—দিদি হিন্দুস্থানী ভাষায় গল্প বলতে পারতো। গঙ্গার ঘাটে দিদির মস্ত সমাজ, সেখানে মস্ত আসর।—

সেই দিদি একে একে চারটি সন্তান হারালো, এবং তা'র স্বামীরও মৃত্যু হোলো একদিন। একদিন দিদির মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল। বৈশাখের রৌদ্রে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে কাশীর পাথরের ঘাট,—আর দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছে হাঁটুজলে। শীতের রাত্রের তুহিন আবছায়ায় দিদিকে দেখেছি গঙ্গায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বলছে, মা, আমার চোখের সব জল তুমি টেনে নাও মা! শ্রাবণের বর্ষায় দেখেছি ঘাটগুলো সব ভেসে গেল, জল উঠে এলো প্রায় পথের উপর,—আর দিদি ওই দশাশ্বমেধের অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে সেই সন্ন্যাসিনীর আসনের পাশে একমনে ব'সে রয়েছে—তা'র মাথায় ঝ'রে পড়ছে শ্রাবণের ধারা। আনন্দময়ী দিদি সংসারে আর কোথাও আনন্দের স্বাদ পেলোনা। একদিন এমন অবস্থা দাঁড়ালো, প্রিয়জনরা দিদিকে কোথাও দেখলে ভয়ে ভয়ে স'রে যেতো। সেই দিদির শেষ অবশেষ গেল মণিকর্ণিকায়। চোখের সামনে পুড়ে পুড়ে দিদি ছাই হয়ে গেল!—

ঠিক এমনি সময়টায় একখানা ঠিকানা-কাটা চিঠি ঘুরতে ঘুরতে আমার হাতে এলো। হাতের লেখা দেখেই চিনলুম, এ চিঠি টুনুর। সে লিখছে—

"কলকাতায় চললুম, সঙ্গে যাচ্ছেন রায় বাহাদুর। পৌষ সংক্রান্তিতে আমরা কয়েকজন গঙ্গাসাগর যাবো স্থির হয়েছে। আগামী ১৩ই জানুয়ারী সকালে তুমি গঙ্গাসাগরে উপস্থিত থাকবে, সেখানে আমাকে খুঁজে নিয়ো। কলকাতায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেনা। নিশ্চয় সাগরে তুমি যাবে, তোমাকে দেখিনি অনেকদিন।"

* * * *

বেশ মনে পড়ছে সেই সময়ে আমার স্রোতটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল—ভাঁটা দেখা দিয়েছিল, বালুচর উঠে পড়েছিল, লগি ঠেলতে পারছিলুম না। টুনুর চিঠিখানায় জোয়ার এল যেন। হাতে আর চার-পাঁচ দিন মাত্র সময়। সুতরাং পরের দিনই কলকাতা রওনা হলুম। টুনুর চিঠি,—আমাকে যেতেই হবে!

*

* *

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা শুনে এসেছি অনেককাল থেকে। ছোটবেলায় দিদিমার মুখে কত গল্প শুনেছি। গঙ্গাসাগরের মেলা যেখানে বসে, সে জায়গা নাকি সুন্দর বনের প্রত্যন্তদেশ, সাগরদ্বীপ তা'র নাম। সেখানে বাঘ আর কুমীরের ভয়,—সেটা নাকি সাগরের মোহানা। দিদিমা বলতেন, কপিলমুনির শাপে সগর রাজার বংশ নিধন হয়েছিল। বহুকাল পরে সেই বংশের উত্তরপুরুষ ভগীরথ এনেছিলেন গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে কপিলের আশ্রমের ধারে। সগরবংশ উদ্ধার হয়েছিল।

বর্মা অভিযানের পর সমুদ্রের কথা উঠলেই আমার দুর্ভাবনা দেখা দিত। তবে এটা শীতকাল, বৃষ্টি বাদলের ভয় নেই। মাঝসমুদ্রেও যেতে হবে না—সুতরাং সাহস ছিল। তা ছাড়া গঙ্গার মোহানালোকে গঙ্গারই অসংখ্য ধারা, তাদেই ফাঁকে ফাঁকে সুন্দরবনের গহন পথ,—সেখানকার চেহারা জাহাজ থেকে কতটুকুই বা দেখেছি? কলকাতায় ফিরে এসে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত হ'তে লাগলুম।

আসল কথা, জোয়ার এলো জলে! আমার প্রাণের নৌকা দুলে উঠলো। সেই গঙ্গাকে দেখে এসেছি একদিন দুর্গম হিমালয়ের তুষার লোকে—সেখানে গঙ্গা গলিত দুগ্ধধারার ন্যায় ব্রহ্মলোকে প্রবাহিনী—নাম মন্দাকিনী! দেবলোকে সেই মন্দাকিনী যখন নেমে এলো—তা'র নাম হোলো অলকানন্দা! তপোলোকে তাকে দেখেছি নীল ধারায়। আমি সেইখান থেকে গঙ্গাকে অনুসরণ ক'রে এসেছি। উত্তর পশ্চিম ভারতের সকল তীর্থ আর গাঙ্গেয় নগর পেরিয়ে সেই গঙ্গা রূপান্তরিত হোলো পদ্মায়,

আর নলহাটির ওদিক থেকে নেমে এলো ভাগিরথী। কিন্তু আমার অনুসরণ করা থামলো না! গঙ্গার উৎপত্তি-লোক দেখেছি, নিবৃত্তি দেখা চাই বৈ কি!

হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার ছাড়ে তক্তাঘাট থেকে। আগের দিন রাত্রে এক বন্ধুর মেসে কাটিয়ে পরদিন প্রত্যুষে রওনা হয়ে গেলুম। সেটা পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন—আগামীকাল অমাবস্যা। দেশ-দেশান্তর থেকে শত সহস্র যাত্রী এসে জুটেছে জাহাজঘাটার চারিপাশে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত প্রদেশের তীর্থ-যাত্রীরা জড়ো হয়েছে। বহুলোক এই পথ দিয়ে যায়, আবার অনেকে যায় ডায়মণ্ড-হারবার থেকে। ডায়মণ্ড হারবার যাবার ট্রেণ ও মোটরবাস দুই পাওয়া যায়।

অত্যন্ত পুরনো এবং দরিদ্র স্টীমার। তাছাড়া অধিকাংশ ইতর শ্রেণীর লোক,—ভদ্র শিক্ষিতসাধারণ ওদের মধ্যে অতি সামান্য। স্টীমারের কর্তৃপক্ষ যাঁরা, অথবা স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাঁদের উপর,—তাঁরা যাত্রীদের ঠিক মানুষ ব'লে মনে করেন না। সুখ, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ যদি তাঁরা না দেন্ তবে অভিযোগ জানাবার মানুষ কম। শোনপুরের মেলা, হরিদ্বার অথবা প্রয়াগের মেলা, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে শিবরাত্রি অথবা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ণিমা ইত্যাদির মেলা, অযোধ্যার মেলা,—সকল মেলার একই ইতিহাস। জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টির অভাব! আমরা যে-স্টীমারে উঠলাম, সেটি মাল-চালানি বড় নৌকা বিশেষ। অন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের জন্য যে সমস্ত বজরা অথবা বাষ্পযান মাল নিয়ে আনাগোনা করে, আমাদের স্টীমারও তাই। যাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য দুটি স্টীমারকে একত্র ক'রে বাঁধা হয়েছে,—এবং তা'তে যাত্রী নেওয়া হয়েছে সংখ্যাগণনার অতীত,—কেউ অপমানিত, কেউ আহত, কেউ পদদলিত, কেউ বা রুগ্ন। শীতের দিন, তাই এ-যন্ত্রণা অনেকটা সহ্য করা যায়, অন্য সময় হ'লে অসম্ভব হোতো।

কিন্তু দেবতা ও পুণ্য কেবলমাত্র তীর্থেই নেই, আছে তীর্থপথের দুধারে—এই হোলো বিশ্বাস। সুতরাং তীর্থপথের যা কিছু কষ্ট, সেটি আনন্দেরই রূপান্তর, এই চিন্তা না থাকলে অনেক তীর্থপথই দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো। আমাদের স্টীমার যখন ছাড়লো বেলা তখন ন'টা বাজে।

নদীপথ অনেকটা আমার পরিচিত। প্রতি দোলপূর্ণিমার রাত্রে আমরা অনেকগুলি বন্ধু মিলে এই গঙ্গার দক্ষিণ পথে ভেসে যাই। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক,

সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, অধ্যাপক ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে একটি মস্ত দল। আমাদের নৌকায় আবৃত্তি, গান, কথকতা, রসিকতা, অভিনয়, কানাকানি, পারস্পরিক ঈর্ষা,—সমস্তই অনুষ্ঠিত হোতো। ভোজনের আসর বসে মস্ত আকারে, আয়োজনও প্রচুর। ওর মধ্যে রংয়ের খেলা, রংদার গল্প, রঙীন নেশা। আমাদের নৌকা ভাসতে ভাসতে বহুদূর দক্ষিণে চ'লে যায়। বেশ মনে পড়ছে, একবার আমাদের নৌকা কোটালের বানে বিপর্যস্ত হয়েছিল—দূরের থেকে বানের গর্জন শুনে আমরা তীরভূমিতে উঠে পড়েছিলুম।

আমাদের স্টীমার সেই পরিচিত পথ ধ'রে তর-তর বেগে দক্ষিণে চলেছে।

একটা কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। জলের উপর দিয়ে আমার অভিযান এবার অনেকটা ফুরিয়ে এলো। অনেক নদী আমার দেখা হোলো না, অনেক নদীর তল খুঁজে পেলুম না। নেপালের বাগমতী কোথায় গিয়ে তিস্তার সঙ্গে মিললো, সে কি দেখে এসেছি? কর্ণফুলীর উৎস কোথায়? আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের ডি-বং নদী—সেখানকার কাকচক্ষু জলে বহু বর্ণের দুষ্প্রাপ্য পাথর জলের ভিতর থেকে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে! বরিশালের দক্ষিণে আঁধারমাণিক আর গর্জনবুনিয়া,—যাদের জলের উপর অন্ধকার রাত্রে ফসফরাস জ্বলতে থাকে? নদীয়ার খড়ে, ইছামতী, চূর্ণী, গরাই, কুমার—এদের আদি-অন্ত কি দেখেছি? কত নদী মাঝপথে থেমে গেল, কত নদী বিবাগিনী হোলো, কত জলা-বিলে কত নদী মাথা কুটে ম'রে গেল, কত নদী বুকফাটা মরুভূমিতে শুকিয়ে গেল—তাদের খবর কি সব জানি? হিমালয়ের সেই দুর্গম গহ্বরলোক মনে পড়ছে,—সেখানকার সেই বিরহী, হর্ষবতী, নায়ার ইত্যাদি নদীরা! সেই অসংখ্য অজস্র গঙ্গার শতমুখী ধারারা—ভীমগঙ্গা, গরুড়-গঙ্গা, আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, পিণ্ডরগঙ্গা, রামগঙ্গা—কত অগণ্য গঙ্গার দল! মনে পড়ছে দানাপুর পেরিয়ে হাল্‌দী ছাপরার ধারে শোন নদী,—মনে পড়ছে নদী তীরের সেই পূর্ণিমার মেলা, আর শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি! বুদ্ধগয়ার পথে সেই ফল্গুনদীর কথা, সেই হাহাকার-করা বালুচড়া,—সেই তা'র ভিতরে ভিতরে স্নিগ্ধ রস-ধারা! ঝাঁসী-গোয়ালিয়র-মধ্যভারতের পথে সেই হঠাৎ-চকিতের স্বচ্ছতোয়া নদীরা। তা'রা কোথা দিয়ে সামনে এসে পড়লো, আবার কোথায় পালালো—কোনো ঠিক পেলুম না! সেই জয়পুর থেকে ওয়াধওয়ান আর আমেদাবাদের পথ—মাঝখানে মরুভূমির সীমানা—আর রাজপুতনার মরুশুষ্ক বুকে মাঝে মাঝে সেই ক্ষীরধারা নদীরা।

মনে পড়ছে ট্রেণ ছুটেছে শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে,—আর পার্বত্যপ্রণালীর মধ্যে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে আঁকাবাঁকা নীল নদীতে! ঘুমচোখে নেমেছিল ইন্দ্রজাল, দেখেছিলুম যেন মরুবালারা মসলীনের ঘাঘরা উড়িয়ে অপ্সরীদের সঙ্গে নিভৃত জ্যোৎস্নায় গলাগলি করছে সেই নীল নদীর উল্লোল রসধারায়!

শীতের সূর্য অস্তে নামলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে এলো গঙ্গায়। আমাদের জোড়া-স্টীমারে আলো জ্বললো। এতক্ষণ পরে গঙ্গায় একটু একটু উচ্ছ্বাস দেখা দিল। সন্ধ্যার পরে স্টীমারের তলায় অল্প অল্প দোলা লাঁগলো। গঙ্গা বিস্তৃত হয়ে এসেছে।

দূরে-দূরে লাইট-হাউস চোখে পড়ছে, মাঝে মাঝে বয়াগুলির চোখটেপা রাঙা আলোর সঙ্কেত। এদিককার গঙ্গা যেন নিত্য শৃঙ্খলিতা, নিয়মানুগত্যের ক্রীতদাসী! দুই ধারে কল-কারখানা, কুঠি, জেটি, নোঙরা-করা জাহাজ,—চিমনির ধোঁয়ায়, ঘর্ঘর শব্দে, আওয়াজে, ভাসা-তেলে, ময়লা জলে—সমস্তটা যেন অগম্য হয়ে থাকে। বুঝতে পারা যায় ভাগিরথীর প্রবাহ শুকিয়ে গেলে কলকাতার অস্তিত্ব লোপ পাবে।

গঙ্গার অন্ধকার ভেদ ক'রে আমাদের স্টীমার চলেছেঁ, যেন পেরিয়ে চলেছে রাত্রির পথ ধ'রে প্রভাতের লাল আলোর দিকে, তমসা থেকে জ্যোতির্লোকের পথে। কত অজস্র অফুরন্ত গঙ্গা, সেই হিমালয়ের আদি গুহা থেকে যাত্রা করেছি আমি আর গঙ্গা, আমরা দুজনে,—একজন গঙ্গা আরেকজন গাঙ্গেয়,—জল আর জীবন একসঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে চলেছে অনন্ত অকূলের দিকে। আমরা অভিন্ন, অন্তরঙ্গ, একাকার। বড় বড় ঢেউ আঘাত করছে আমাদের স্টীমারকে। বা'র বা'র আঘাত করে নিজেরাই ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। আমাকেও যেন ভাঙছে ওরা, আমাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করতে চাইছে ওদের দলে টেনে নিয়ে। আমিও যে এই বিরাট কালসমুদ্রের মাঝখানে একটি ছোট্ট ঢেউ, পরমাশক্তির আমিও যে একটি ভগ্নাংশ—ওরা সেই কথাটা জানিয়ে যায়। আমার ভিতরে এই যে প্রাণকল্লোল, এই যে শব্দস্পন্দনধ্বনি—এ যে সেই বিপুল সৌরবিশ্বের অশ্রান্ত প্রাণ চেতনার থেকে বিচ্ছিন্ন একক নয়—এ কথা ওরা ব'লে যায় কানে কানে। এই গঙ্গার স্রোত, সৌরলোকে ওই ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-নক্ষত্র-জ্যোতিষ্ক-সূর্যচন্দ্রের দল, শূন্যলোকের নিত্য-তরঙ্গায়িত বায়ু, বৃক্ষলতা ও জীবলোকের প্রাণময়তা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রাণ, প্রকাশ আর অপ্রকাশ, আলো

আর আঁধার, সমস্তটার সঙ্গে আমি অচ্ছেদ্য, আমি সেই বিরাটের চূর্ণাবিশেষ, বিশ্বসৃষ্টির একটি পরমাণু, এই কথা ওরা শুনিয়ে যায় তরঙ্গের আছাড়ি-পিছাড়ি-আহ্বানে!

শেষ রাত্রের দিকে ব'সে ব'সেই তন্দ্রা এসেছিল, সুতরাং শেষ দিকের জল-পথটার কথা আর মনে নেই। সকাল আটটা লাগাৎ আমাদের স্টীমার সাগরদ্বীপের উপকণ্ঠে চড়ার কাছে এসে পৌছলো। অল্প জলে এসেছি, কতকটা যেন ভাঁটার টানে, দ্বীপের উপরে দেখতে পাচ্ছি মানুষের সমাগম। ইতিমধ্যে নানা নদীপথ বেয়ে বহু বজরা নৌকা এসে তটের ধারে নোঙর করেছে। আমাদের বাষ্পযান ডাঙ্গা অবধি যাবে না—সুতরাং কোনো মতে একটা কৃত্রিম সিঁড়ি লাগিয়ে আমাদের দলকে একে একে নামানো হলো। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমরা একটা দোলায়মান অবস্থার মধ্যে বাস করেছি, সুতরাং তীরভূমির অকম্পতার উপরে পা রেখেও আমাদের শরীরটা যেন কতক্ষণের জন্য দুলতে লাগলো।

সাগরদ্বীপ যাকে বলা হচ্ছে, সেটা দ্বীপ কিম্বা উপদ্বীপ—এটি আমি জরিপ করি নি। তবে আমরা যে-ত্রিকোণাকার অংশটায় নেমেছি সেটির প্রান্ত সমুদ্রমুখী। বুঝতে পারা যায়, সুন্দরবন যেন সমুদ্রের ধারে জিহ্বা মেলে এখানে থাবা পেতে ব'সে রয়েছে। অরণ্যের সীমানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তবে এ অঞ্চলে কোনো কোনো গ্রামের আভাস বুঝতে পাচ্ছি। গৃহপালিত পশুর সন্ধান মিলছে। কোথাও উচ্চভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, হোগলার তাঁবু পড়েছে হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে। মেলা ব'সে গেছে বিরাট। যে-যেমন পেরেছে, এক একটি হোগলার তাঁবু দখল ক'রে পৌটলাপুঁটলি নামিয়েছে, —এবং এরই মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ইত্যাদি কয়েকজন সেই অগণ্য হোগলার অরণ্য-পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছে। আপন আপন তাঁবুকে চিনে রাখার জন্যে অনেকে হাস্যকর উপায়ে হোগলার ডগাকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। বুঝতে পারা যায় বাজারটা এসেছে বাইরের থেকে, জিনিসপত্র সমস্তই দুর্মূল্য। কপিলের মন্দিরটি রয়েছে কিছুদূরে—মেলাটা বসেছে ওটাকেই কেন্দ্র ক'রে। আশপাশে পাকা ঘরদোর, দোকানদানিও রয়েছে কিছু কিছু। মন্দিরের পাড়াটায় কিছু আভিজাত্যের চিহ্ন দেখা যায়। সন্ন্যাসীরা এসেছে, নাগা ফকিররা—এসেছে ভৈরবীর দল, গৃহস্থ সম্প্রদায়; বোষ্টম-বোষ্টমীরা। পশ্চিম,

উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের বহু যাত্রীরা,—উত্তর-বিহারীরা এসেছে জগন্নাথের ফেরৎ। ওদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন, তারা হোগলার দেওয়াল ঘেরা ঘরগুলি অধিকার করেছে, এ দিকটা অনেকটা মালভূমির মতন। আমি জায়গা ক'রে নিলুম ইতর-সাধারণের পল্লীতে। আমাদের পিছনের অংশে রইলো জঙ্গলের প্রান্তভাগ, এবং একটি বাঁধ বাঁধানো মস্ত জলাশয়। এই জলাশয়ে বহুশত যাত্রী ভিড় করেছে। পরিচ্ছন্নতা কোথাও চোখে পড়ছে না—এরই মধ্যে এই অস্থায়ী আবাসস্থলের চারিদিকে জঞ্জাল, নোংরা, উচ্ছিষ্ট এবং ময়লা জলের আঁস্তাকুড় জমে প'চে উঠেছে। মহামারী এই সময়টায় আসে হঠাৎ—এক একটা দলকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চ'লে যায়। যে-অংশটা অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন সেখানে সরকারী লোকের তাঁবু পড়েছে। হাকিম, দারোগা, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, হারানো আর খুঁজে-পাওয়ার দপ্তর—ইত্যাদি অনেক রকমের লোক ব'সে গেছে। উৎকৃষ্ট আহার্যের সঙ্গে উৎকৃষ্ট বাস-ব্যবস্থা লাভ ক'রে তা'রা-যে সমস্তক্ষণ ধ'রে যাত্রীসাধারণের ঈর্ষা উদ্রেক করে—এটি তারা বুঝতে চেষ্টা না করলেও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। হাকিম-দারোগারা সম্ভোগ আর আর শাসন জানে, সেবা জানে না—তাই তা'রা নিত্য অনাদৃত।

বেলা যত বাড়ে, লোক তা'র চেয়েও বেশী বাড়ে,—সুতরাং এই সহস্র লক্ষের ভিতর থেকে টুনুর সন্ধান পাবো, এ আশা দুরাশা। তার কোথা দিয়ে আসবে আমি জানিনে, কখন্ আসবে তাও অনির্দিষ্ট, ডায়মণ্ড হারবার দিয়ে আসবে কিনা, তাও আমাকে লেখেনি। তা ছাড়া এই সাগরদ্বীপের চক্রাকার প্রান্তভাগ এত বৃহৎ, হাজার হাজার হোগলার ভিড়ের এত ঘিঞ্জি যে, আমি নিজে হারাবার ভয়ে সতর্ক হ'য়ে আছি। ওদিকে সমুদ্রের চক্রাকার তীরভূমিতে বন্যার মত তীর্থযাত্রীরা এসে নামছে; গত দুদিন থেকে শত শত নৌকা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে গেছে; জলের উপর দিয়ে দূর দূরান্তরের সুবৃহৎ দিগন্তপ্রসার—এই একটা সমুদ্র-উপদ্বীপ-অরণ্য-গ্রাম পরিব্যাপ্ত লক্ষ লক্ষের ভীড়ে টুনুকে কোথায় খুঁজে পাবো? সে কেমন ক'রে আমাকেই বা খুঁজে বা'র করবে?—আগে বুঝতে পারলে এই হাস্যকর অভিযান হয়ত বাতিল ক'রে দিতুম। অন্তত টুনুর স্তোকবাক্য না শুনে নিজের গরজেই না হয় একদিন এ পথে আসতুম!

আস্ত ফল ছাড়া আর কোনো আহার্য এখানে নিরাপদ নয়—এইটি ভেবে নেওয়া গেল। এক হিন্দুস্থানী পরিবারের কাছে আমার কম্বলটি গচ্ছিত রেখে এক

বৈরাগীর আড্ডায় গিয়ে উঠলুম। সে-লোকটা আজ আটদিন আগে এসে একটি তাঁবু দখল ক'রে বসেছে এবং দিব্য একটি সংসার রচনা করেছে। ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানী বুড়োর কাছ থেকে আমি ধূমপানের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেছিলুম, এবার সেইটির দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে বৈরাগী এবং আমি এক মুহূর্তেই পুলকিত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে গেলুম!

কলকাতা থেকে যে-পরিচ্ছদটি চড়িয়ে বেরিয়েছি, সেটির দিকে আর তাকানো চলে না। ধূলা বালি, মাটি, অপরিচ্ছন্নতার দাগ, ছিন্ন জীর্ণতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি বরাবরই সংস্কারমুক্ত; তার সঙ্গে এলোমেলো ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল,—সুতরাং ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে বৈরাগী যে আমার দিকে এক একবার তাকিয়ে হাসবে, এতে আর বিচিত্র কি? লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয়েছে ধূমপানে, ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে নয়। এক সময় প্রশ্ন করলুম, এবার কোন চুলোয় যাবে বোরেগী?

সে বললে, তোমার পিছু পিছু!

বললুম, তোমাকে দেখলে আমার বাড়ীর লোক ঝেঁটিয়ে তাড়াবে।

লোকটা হাসলো, তারপর জড়িতকণ্ঠে বললে, ঝেঁটিয়ে ফেলবে না হয় জঞ্জালে। বেশ ত, একটা জায়গা ত মিলবে!

তোমার কি কেউ নেই?

লোকটা বললে, বেশি ক'রে পান খাওয়ালে আমার সব কাহিনী বলবো।

লোকটাকে পান খাইয়েছিলুম বটে, তবে তা'র কাহিনী আর আমার শোনা হয় নি। তা'র সঙ্গে সেদিন আমার সারাদিনই কাটলো, এবং সন্ধ্যার দিকে অনেক পরিশ্রমের পর তাকে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত ক'রে খাওয়ালুম। কিন্তু কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে মালসাভোগ তৈরী করতে গিয়ে আমাকে আর কিছু কালিঝুলি মাখতে হলো। টুনুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবার যখন কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থেকে ভদ্রসমাজের যোগ্য হবার কোনো কারণ দেখিনে। অতএব সেই হোগলার তলায় ধূলামাটির উপর কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে সেদিনকার মতো প'ড়ে রইলুম নির্বিকারভাবে।

সকালবেলা কপিলের মন্দিরের পাড়া থেকে যখন চা খেয়ে ফিরলুম তখন আন্দাজ করতে পারি আটটা বেজে গেছে। হোগলার তলায় এসে দেখি, লোকটা আমার

ছোট্ট পুঁটলিটি খুলে ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে ইতিমধ্যেই ব'সে গেছে! বলল্‌
এর মানে কি, বোরেগী?

বৈরাগী বললে, খুব সোজা। তোমার আছে, আমার নেই—তাই তোমার
থেকে নিচ্ছি?

চেয়ে নিলে না কেন?

চাইলে তোমরা দাও না, তাই কেড়ে নিই, না ব'লে নিই! লক্ষ্মী দাদা, এবার
একটু পান খাওয়াও, তোমার পায়ে পড়ি।

বললুম, আমার খরচে কাল থেকে তুমি প্রায় বারো আনার পান খেয়েছ, ত
জানো?

লোকটা বললে, ও, তাই নাকি? এবার তা হলে পুরোপুরি এক টাকায় পুরিয়
দাও! আরে ভাই, যত দেবে ততই পেতে থাকবে, বুঝলে না?—শোনো, একট
কথা বলি। এই ব'লে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে সে বললে, এখান
থেকে যখন যাবো, কী ক'রে যাবো জানো ত? স্রেফ হোগলার তলায় একটি
দেশালাইর কাঠি!

হা হা ক'রে সে হেসে উঠলো।

বললুম, কী সর্বনাশ! তুমি এমন সাংঘাতিক লোক?

নিশ্চয়! আমি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য—সাবধান!

স্বামী বিবেকানন্দ!

লোকটা বললে, নিশ্চয়! স্বামীজী বলতেন, জড়তা নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকার
চেয়ে বরং অনাচার ক'রো, তা'তে কর্মপটুতা প্রকাশ পাবে! ওই ত' আমার মন্ত্র
যাও, যাও, শিগগির পান আনো—

আমি তখনই পান আনতে ছুটলুম।—

আজ অমাবস্যা। আজই পুণ্যাহ। সহস্র সহস্র লোক আজ স্নান করবে
যাত্রীর বন্যা এতই বেড়ে চলেছে যে, তাদের চাপে বহু তাঁবু ইতিমধ্যেই কাৎ হয়ে
হুমড়ে মচ্‌কে গেছে। লোকে মাঠের উপরেই ব'সে যাচ্ছে! মেলাটা নাকি
এইভাবে থাকবে অন্তত সপ্তাহখানেক। কাল থেকে যে-পথের চিহ্নটা ধ'রে আমি
আনাগোনা করছিলুম, সে-পথটা যাত্রীদের ভীড়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে সেই

সাগরের কিনারা ধ'রে ঘুরে গিয়ে মন্দিরের দিকে যেতে হবে। যা দেখবার আর জানবার অথবা দর্শন করবার—তা আমার হয়ে গেছে। আজ আমি যে-কোনো জাহাজ পেলেই সাগরদ্বীপ ছেড়ে পালাবো!

জলের ধার দিয়ে যাবার সময় সহসা থমকে দাঁড়ালুম। শত শত নৌকার ভিড়ের ভিতর দিয়ে দূরে একখানা বড় নৌকার দিকে আমার দৃষ্টি ছুটে গেল। বৈষ্ণবের উপরে যখন ঠাকুরের 'ভর' হয়, তখন একটা হর্ষ-কম্প-স্বেদ-পুলকের ভাব দেখা দেয়। দূরের একখানা নৌকার দিকে চোখ পড়তেই তেমনি আমার একটা রোমাঞ্চ দেখা দিল! ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানা আসছে এদিকে এগিয়ে!

টুনু!

নিজের দিকে তাকিয়ে আমি আর কিছু চিন্তা করবার সময় পেলুম না। ঠিক যে-অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলুম, সেই অবস্থায় জলে নেমে ডুব দিলুম। নিজেকে আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করলে কিছুতেই লোকসমাজে আর দাঁড়াতে পারবো না। টুনু যেন আমার সমস্ত লজ্জাকে বহন ক'রে এনেছে!

এগারো বছর আগেকার কথা বলছি, কিন্তু তা'র আগে টুনু আমার অনেকদিনের বন্ধু। এই এগারো বছর পরে গঙ্গাসাগরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি স্পষ্ট আর আমার মনে নেই। সম্ভবত দোলায়মান নৌকার উপর থেকেই উচ্চ কৌতুকের কণ্ঠে হেসে উঠে টুনু আশপাশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাদের নৌকা এসে ঘাটে লাগলো অদূরে। টুনুরা বড়লোক, তাদের পোষাক-আসাকে আর জিনিসপত্রে আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান। আমি আমার জলঝরা মাথা আর সপসপে কাপড় নিয়ে তাদের নৌকার কাছে এগিয়ে গেলুম। রায় বাহাদুর নৌকা থেকে নেমে বললেন, কই হে, বাসা ঠিক করেছ কোথায়?

হেসে বললুম, আগে হুকুম করেননি ত?

পিসিমা বললেন, সমুদ্দুরেই ভাসতে হবে দেখছি!

টুনু জিনিসপত্র সমেত নেমে বললে, তুমি গেল-বছর পশুপতিনাথ গিয়েছিলে, কই আমাকে বলোনি ত?

বললুম, যেদিন গোল্লায় যাবো সেইদিন তোমাকে আগে খবর দেবো।

পিসিমা এবং রায় বাহাদুর দুজনেই হাসলেন। নৌকাওয়ালা জিনিসপত্র নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চললো। টুনু বললে, তুমি উঠেছ কোথায়? চলো আমাদের সঙ্গে।

জ্যাঠামশাই, আপনি ওকে চোখে চোখে রাখুন, নৈলে কখন্ গা ঢাকা দিয়ে পালাবে তা'র ঠিক নেই।

জ্যাঠামশাই বললেন, তা'র চেয়ে ওকে পুলিশের জিম্মায় রাখো, তা হ'লে আর হারাবে না।

আমরা সবাই উচ্চরোলে হাসতে লাগলুম! আমি বললুম, তবে হ্যাঁ, পিসিমা যদি সেই রকম ধোঁকার ডান্‌লা রেঁধে খাওয়াতে পারেন, তবেই কাছাকাছি থাকতে পারি!

পিসিমা বললেন, তা'র চেয়েও ভালো জিনিস এনেছে তোমার টুনু। বাঁধা কপি, হিংয়ের বড়ি আর বেগুন, ঝোল রেঁধে দেবে তোমার পছন্দসই।

টুনু মাথার ঘোমটা একটু টেনে বাঁকা চোখে চেয়ে বললে, খাওয়ার লোভ না দেখালে তোমার মন পাওয়া ভার! জ্যাঠামশাই, আপনার হুঁকো-কলকে সাবধান, ছিঁচকে চোরের উৎপাত হ'তে পারে।

জ্যাঠামশাই যেন শুনতে পেলেন না,—পিসিমা হেসে উঠলেন। চোখ রাঙিয়ে টুনুকে আমি নিঃশব্দে শাসন ক'রে দিলুম।

রায় বাহাদুরের আলাপী লোক ছিল কর্তৃপক্ষের আপিসে। সুতরাং টুনুরা হোগলার একখানা চালা পেয়ে গেল মনের মতন। তিন দিন দিব্য এখানে থাকা চলবে। পিসিমা বললেন, ধুলো পায়ে তিনি কপিলের মন্দির দর্শন করবেন। সুতরাং আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। টুনু জিনিসপত্র গুছিয়ে রায় বাহাদুরের বিশ্রামের জায়গা করতে লাগলো।

মন্দিরে কপিল মুনির মূর্তি এবং অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন সেরে পিসিমাকে তাঁদের চালার দরজা দেখিয়ে দিয়ে আমি ভিজা কাপড়ে চ'লে গেলুম। কথা রইলো, আবার এখুনি আসছি। ভুলে গিয়েছিলুম, এখন মনে প'ড়ে গেল, আজই ১৩ই জানুয়ারী! টুনু আমাকে আজকেই উপস্থিত থাকতে লিখেছিল,—আমি এসেছি একদিন আগে। টুনুর সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ কম, বছরে দু' তিনখানা মাত্র—কিন্তু আমার অনেক খবর তা'র কানে গিয়ে পৌঁছয়। আজ টুনুর সঙ্গে আমার প্রায় আড়াই বছর পরে দেখা। টুনুরা থাকে রাজসাহীতে। রাজসাহীতে মস্ত বড় বাড়ী ওদের। বরাবর দার্জিলিঙ থেকে ফিরতি পথে ওদের বাড়ীতে গেছি, কতবার গিয়ে থেকেছি। টুনু বলতো, পরিচয় নেই, আত্মীয়তা নেই,—এমন লোকের সঙ্গে আমার প্রথম বন্ধুত্ব,—সে তুমি!

আমি হেসে বল্‌তুম, এ কথা কোথাও বলো না যেন—তা হ'লে নিন্দে হবে দুজনের!

টুনু বলতো, মনে রেখো আমরা উত্তরবঙ্গের মেয়ে, মিথ্যে নিন্দেয় ভয় পাইনে।

আমার বয়স তখন অনেকটা কম। হাসিমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতুম, হায়রে, নিন্দেটা যদি মিথ্যেই হোতো!

টুনু বোকা ব'নে গিয়ে মুখখানা একটু অসহায় ক'রে তুলতো, আর আমি বীরবিক্রমে তা'র নাকের ডগার উপর দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতুম। সে অনেক-দিনের কথা!

বৈরাগীকে প্রচুর পরিমাণে পান খাইয়ে ওরই মধ্যে একটু ভদ্র পোষাক চড়িয়ে আমি খুঁজতে খুঁজতে এলুম রায় বাহাদুরের চালায়। দেখলুম ইতিমধ্যে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে মিঠে জল আনিয়ে পিসিমা রান্নায় লেগেছেন। টুনু স্নান সেরে বেশ ভব্যযুক্ত হয়ে পিসিমাকে সাহায্য করছে। রান্না অবশ্য সামান্যই, তবে বেগুন-বড়ির ঝোলটা পিসিমাই রাঁধলেন। আমার দু' দিন প্রায় আহারাদি নেই, সুতরাং ভোজন-লোলুপতা কিছু ছিল। টুনু আমাকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করছে, কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করছে আমার ভিতর থেকে, তা'র কথার আঘাত কোন্ পথ দিয়ে আসবে—তাই ভেবে আমিও এক একবার আড়ষ্ট বোধ করছি।—রায় বাহাদুর বললেন, তুমি ত' একে একে প্রায় সব তীর্থই ঘুরলে, কি বলো?

বললুম, এখনও কত বাকি!

তিনি বললেন, তুমি সাঁতার শিখলে না, অথচ জলে জলে বেড়িয়ে নিলে খুব। আচ্ছা, ভ্রমণ তোমার কবে থেকে প্রথম ভালো লাগে হে?

বললুম, ঠিক বলা কঠিন, তবে ছোটবেলায় রামায়ণ, মহাভারত শুনতে শুনতে আমি যেন পথ-ঘাট খুঁজে পেতুম। মা-দিদিমা, এঁদের কাছেই মন্ত্র পাই।

রায় বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর শুধু বললেন, আশ্চর্য

টুনু ব'লে উঠলো, কি আশ্চর্য, জ্যাঠামশাই?

না, কিছু না—,এই···মানে ওর মা-দিদিমার কথাই ভাবছিলুম, মা।

টুনু বললে, আপনি উড়নচুড়ে লোককে ভারি আস্কারা দেন জ্যাঠামশাই!

আমরা হেসে উঠলুম। পিসিমা বললেন, এবার ঠাঁই ক'রে দাও।

আমাদের আহারাদির পর রায় বাহাদুরের তামাক সেজে দিলুম, তারপর টুনুকে প্রশ্ন করলুম, হঠাৎ আমাকে ছুটিয়ে গঙ্গাসাগরে আনলে কেন বলো ত ?

টুনু হাসিমুখে বললে, বেগুনি-বড়ির ঝোল ত' খেতে পাও না, তাই ডেকে এনেছি ঝকমারি করেছি।—দাঁড়াও, হোটেলের ভাত খেয়ে যেন পালিয়ো না, আমাকে দর্শন করিয়ে আনো। আমরা শিগগিরই আসামের দিকে যাবো, কিন্তু তা'র আগে কলকাতায় তোমার মা'র সঙ্গে একবার দেখা করবো—

বললুম, সর্বনাশ !

টুনু বললে, যতই মানা করো, আমি যাবো। তাঁর সঙ্গে কথা আছে।

কি প্রকার কথা ?

রায় বাহাদুর বললেন, তোমার ঘরে গোপনে সিঁধ কাটার মন্ত্রণা—বুঝতে পেরেছ ? —এই বলে তিনি দিব্য আরামে চোখ বুজে তামাক টানতে লাগলেন।

টুনু বললে, ও সব কথাই একটু দেরীতে বোঝে...ভারি সরল !

বললুম, বাঃ, এই সব গালমন্দ দেবার জন্যেই বুঝি আমাকে ডেকে আনলে ?

টুনু আমার সঙ্গে চললো মন্দির দর্শনে। আমি অনেকটা ক্লান্তি বোধ করছিলুম। টুনুর অনর্থক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সেই ছিল আমার ভয়। টুনুকে দেখে আনন্দ পাই, তা'র অনুরোধ এড়াতে পারিনে—এ কথা সে জানে। কিন্তু টুনু হোলো ঘরোয়া, গৃহসেবিকা, টুনু বাঁধা ছকের মধ্যে আনাগোনা করে, টুনু কিছু খোঁজে না, কিছু কঠিন ক'রে চায় না। কিছু না পেলে প্রতিবাদ করে না।—বরাবর শুধু দেখে এলুম তা'র একটি অম্লান সরলতা ! টুনু জানতো, আমি কিসে ক্লান্তি বোধ করি।

মন্দিরে গিয়ে টুনু অনেকক্ষণ কাটালো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, এক সন্ন্যাসী মাটির গর্তে ঢুকে উপরের মুখটা বন্ধ ক'রে ভোজবাজি দেখাচ্ছে। সবাই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে চারদিকে। কতক্ষণ পরে টুনু বেরিয়ে এলো। বললে, তুমি দর্শন করেছ ?

হেসে বললুম, দর্শন করতে এসেছি তোমাকে।

টুনু মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, আমি ত তোমার কোনো ক্ষতি করিনি যে, তুমি আমার মন ভোলাতে চাও ? চলো যাই—

সমুদ্রের সীমানা এ দিকটায় বাঁক নিয়েছে। এখান থেকে যতদূর দেখা যায়, জল ঘোলা। দূরে দূরে এক আধখানা জেলে নৌকা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। একটা

হোগলার চালার কাছে এসে টুনু বললে, এবার তোমার সঙ্গে আর অনেকদিন দেখা হবে না,—হয় ত হবেও না আর।

আমি বললুম, পুরুষ মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখো, ইচ্ছে হলে তোমাকে খুঁজে বা'র ক'রে নেবো।

কেন?

বললুম, এমনি···অকারণে!

টুনু বললে, আমি কিন্তু তোমাকে অকারণে ডাকিনি। আমি শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে তোমার সাধুর কথা!

বললুম, সাধুর কথা! সাধুর কথা আরম্ভ করবো কোথা থেকে তাই ভেবে পাইনে।

টুনু বললে, তোমার সব কথা যদি সত্যি হয় তবে সাধুকে বলতে হবে অসাধারণ মেয়ে! সাধুর আসল নাম শুনতে ইচ্ছে করে!

বললুম, সাধু নিজেই প্রকাশ করতে চায় না তা'র আসল নাম।

সাধুর বয়স কত?

জিজ্ঞেস করিনি!

টুনু ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে বললে, দেখতে সুশ্রী?

হেসে বললুম, টুনু, তুমি কি আমার ভেতরের লোভটাকে খুঁজে বা'র করতে চাও? তা' হ'লে বলি, সাধু দেখতে কেমন, এ আমি আজো বিচার করিনি!

টুনু বললে, সাধু এখন আছে কোথায়?

বললুম, সে থাকে এক সাম্যবাদী দলের আড্ডায়—মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়।

তা'র আত্মীয়স্বজন? মা বাপ?

সবাই আছে। সেও বড়লোকের মেয়ে!

টুনু প্রশ্ন করলো, সাধু বিয়ে করেছে?

বললুম, স্পষ্ট জবাব চেয়ো না।

টুনু যেন এরপর অসংখ্য প্রশ্ন আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝ পথে সহসা থেমে সে বললে, 'তোমাকে আর আমি বিরক্ত করবো না। তবে এই কথাটা আমার মনে রেখো—

তা'কে থম্‌কাতে দেখে বললুম, কি?

না, থাক্।—টুন্থ যেন মুখে তালা-চাবি বন্ধ ক'রে দিল। আমি হাসলুম। হেসে বললুম, আচ্ছা, তোমার কৌতূহল মেটাবো, সাধুর গল্পটা ছোট্ট ক'রে বলি।

অধীর অসহিষ্ণু টুন্থ নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

দার্জিলিঙের এক হোটেলে আছি। রাত দেড়টার পর বেরোলুম টাইগার হিল্-এর পথে। উদ্দেশ্য, শেষ রাত্রির সূর্যোদয় দেখা উপর থেকে তিস্তা উপত্যকার নীচে। সেদিন জ্যোৎস্না, হেমন্তকাল। 'ঘুম' থেকে সেন্‌চলের রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে টাইগারের রেস্ট হাউস পেরিয়ে একেবারে চূড়ায় উঠে অনেকের সঙ্গে দাঁড়ালুম। কে কোন্ জাত—চেনবার জো নেই। সবাই গরম কাপড়ে আর টুপিতে, মোড়া··· ভারি শীত। আশ্চর্য, সেদিনের শেষ রাত! ভোরের আগে আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় তিস্তার দিগন্তের সীমানায় মাটি চৌচির হয়ে ফাটল ধরলো, আর পৃথিবীর হৃদ্‌পিণ্ড থেকে উঠতে লাগলো ভলকে ভলকে লাল, নীল, সোনালি, বেগুনী রক্ত, সেই রঙিন রক্তের বন্যায় স্নান ক'রে উঠলো একটি ছোট্ট আগুনের গোলা,—পৃথিবী তখন অন্ধকার, ওরা সেটাকে বললে সূর্য! সেই ছোট্ট অগ্নিপিণ্ড থেকে একটি রশ্মি ছুটে এলো আমার কপালে, আর একটি ছুটে গিয়ে বাণ মারলো গৌরীশৃঙ্গের ললাটে। গৌরীশৃঙ্গের জটা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি আবৃত্তি করলুম—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!"

টুন্থ বললে, তারপর?

ভোরের আলোয় পিছন থেকে একটি মেয়ে বললে, কবিতাটা কি সব আপনার মুখস্থ আছে?

রেষ্ট-হাউসে নেমে এসে তা'কে সব কবিতাটা শোনালুম। সাধুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। সেই আদর্শ থেকে সাধু আজো নামলো না। গৌরীশৃঙ্গে বাসা বাঁধলেই তা'কে মানায়।

মনে পড়ছে গল্পটাকে বেশ বাড়িয়ে টুন্থকে শুনিয়েছিলুম।

গল্প শুনে টুনু চুপ ক'রে রইলো। তা'র মুখে কোনো উদ্বেগ নেই, রেখা নেই, কোনো ভাবের আভাস মাত্র নেই। মনে হোলো প্রশ্নের জবাব সে সমস্তই পেয়ে গেছে। খানিক পরে সে বললে, চলো উঠি, বেলা প'ড়ে এলো।

লোকজনের মাঝখানে এসে টুনু একবার ফস ক'রে বললে, আমি কি ভাবছিলুম জানো?

হাসিমুখে তার দিকে তাকালুম। টুনু বললে, জলের ওপর দাগ পড়ে না এই কথাই জানতুম, সাধু-যে দাগ টানতে পারলো এ জন্যে তাকে আমার প্রণাম জানিও!—

•

এ সেই জল, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে! আমার শিশুকালের সেই করাল চক্ষু কপিলমুনি! সেই গোমুখী থেকে ছুটে আসা গঙ্গা, সেই গঙ্গা এসে আত্মসমর্পণ করেছেন এখানে ভৈরবের আলিঙ্গনে। আমিও যেন আমার যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম বহুকাল আগে, ইতিহাসের অতীত যুগে, পৌরাণিক ভারতের পথ ধ'রে। আমি এসেছি গঙ্গার সহচর, গঙ্গার অগ্রগামী—আমারই হাতে যেন শঙ্খ ছিল! ছোটবেলায় মা-দিদিমার কাছে যে-ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছিলুম, এখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখছি গঙ্গাসাগরের দিগন্ত জুড়ে' তা'র সার্থকতা। দেখলুম, সমস্তটাই শান্ত, পরিতৃপ্ত,—কপিলের চেহারা প্রসন্ন। কিন্তু ভাগীরথ? তা'র কাজ ফুরোবার পরও সে কি ক্লান্ত নয়? অমৃতের আস্বাদে তা'র কি প্রয়োজন নেই? গঙ্গাকে সে পথ দেখিয়ে আনলো,—তারপর? তা'র পথ কি অকূলে? তা'র শঙ্খ কি স্তব্ধ হ'য়ে যাবে?

পরদিন টুনুদের সঙ্গে আর দেখা করিনি। সকাল বেলাটা বৈরাগীর সঙ্গে ধূমপানের আসরে কেটে গেল। গত রাত্রে সমুদ্রের একটা মস্ত ঢেউ এসে আমাদের কতকগুলো হোগলা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অমাবস্যার কোটাল ছিল।

বেলা তিনটে লাগাৎ ডায়মণ্ড-হারবার যাবার স্টীমার পাওয়া গেল। মনে পড়ছে কলকাতায় ফিরেছিলুম শেষ রাত্রের দিকে। পরদিন মধ্যাহ্নের পর একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। সেটি ইতিহাসে প্রখ্যাত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের বিহার ভূমিকম্প!

•

সাধুর কথাটা ভালো ক'রে বলতে পারলে আমি খুশী হতুম। কিন্তু ভয় আছে, বলতে না পারার দোষে পাছে সাধুর ওপর অবিচার করে বসি। সাধু মিনতি ক'রে

বলতো, তা'র কথা আমি যেন আর কারো কাছে আলোচনা না করি। টুনুকে সাধুর কথা বলতে পেরেছি কতটুকু? একটি স্ফুলিঙ্গে কি সূর্যের পরিচয় স্পষ্ট হয়? একটি কিশলয়ে কি অরণ্য সুপ্রকাশ?—তবু সাধুর যৎসামান্য পরিচয় পেয়েই সেই গঙ্গাসাগরের মোহানার কাছে দাঁড়িয়ে টুনু বলেছে, সাধু অসাধারণ মেয়ে!

আমার দুর্বলতা ছিল এই, সাধুর সুখ্যাতি কোথাও শুনলেই আমি নিজে গৌরব বোধ করতুম। সাধু আমার জীবনের একটি উত্তম আবিষ্কার।

তাজমহল দেখতে গিয়ে সাধু তাজমহলের পিছন দিকে সেই মস্ত চত্বরে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তার পায়ের নীচে যমুনার ধারা,—যমুনা এই পথে এসে আবার এই পথেই ঘুরে চলে গেছে,—তাজমহল যমুনার সেই বাঁকে প্রতিষ্ঠিত। সেটি শুক্লপক্ষ,—ঘন জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে দেখা যায় আকাশে রাশি রাশি তারা,—তাজমহল রাজহংসের পালকের মতো শাদা। বলা বাহুল্য, আমি এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলুম।

সেদিন লক্ষ্য করেছিলুম সাধুর কোনো উদ্বেগ নেই। সবাই যাতে আনন্দ আর আমোদ পায়, সাধু সেখানে মুখ বুজে থাকে। সাধু যাতে আনন্দ পায়, তার প্রতি কারো কৌতূহল দেখা যায় না। বৃন্দাবনের কোনো একটি ভাঙ্গা ঘাট, আগ্রাদুর্গের কোনো একটি অন্ধকার অনাদৃত স্থান, কোনো একটি ভাঙ্গা মন্দির-সংলগ্ন বটের ছায়া,—সাধু সে সব জায়গায় অনেক বেশী আনন্দ পেতো। মানুষের কোনো আধুনিক কীর্তিকলাপ সাধুর পছন্দসই ছিল না। নদীর ধারে মস্ত জমিদারের প্রাসাদ,—সাধু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; কিন্তু কোথায় আছে প্রাচীন ঘাট, শ্যাওলাধরা সিঁড়ি, কোথায় সামান্য আশ্রম, কোথায় নাম কীর্তন,—সাধু সেখানে গিয়ে আগে ভাগে পৌঁছয়। তাজমহল সাধুর ভালো লাগেনি, একথা আমার কাছে কোনোদিন সে প্রকাশ করেনি।

আগ্রা দুর্গ সাধুর ভালো লেগেছিল। বেগমদের শয়নমন্দিরে এখন বাদুড়ের বাসা, সন্ধ্যায় পেচকের আনাগোনা, রাত্রে ঝিঁঝিঁর ডাক, দিনমানে বিষণ্ণ নিঃশ্বাস,—অর্থাৎ সকল কীর্তির চরম অবসান,—আর তারই পাশে পাশে কেঁদে ওঠে অতীত যুগান্তর,—সাধুর কেন জানিনে, খুব ভালো লাগে; তা'র চোখের পাতায় জলের রেখা চকচক ক'রে ওঠে। যেখানে তা'র মন খারাপ হয়, সেই সব জায়গা তা'র খুব প্রিয়।

আমি তা'কে নিয়ে বিব্রত বোধ করতুম।—সে গান গেয়ে ওঠে যখন-তখন, কীর্তনের কলি তা'র মুখে লেগে থাকে, কথায় কথায় সে আবৃত্তি করে রবি ঠাকুরের কবিতা। ট্রেনের কামরায় তাকে নিয়ে অনেক জ্বালা, মেয়েপুরুষ নির্বিচারে সে আসর জমিয়ে তোলে, শ্রোতার মুদ্রাভঙ্গী সে লক্ষ্য করে,—এবং পরে সেটি নকল ক'রে আমার সঙ্গে হাসাহাসি করতে থাকে। হঠাৎ কোনো এক পল্লী-স্টেশনে সে নামে—আবদার ধরে, এ অঞ্চল তা'র অত্যন্ত প্রিয়, এখান থেকে সে কোথাও যাবে না। কিন্তু, এ তা'র খেয়াল, এবং সে-খেয়াল অতি ক্ষণস্থায়ী,—আসলে কোথাও সে মনোস্থির করে না। বাঁধাধরা জীবনের ফাঁদে কোনোদিন সে পা বাড়াতে চাইতো না। কোনো একটা নিয়মানুগত্য, কোনো একটা ব্যবস্থা অথবা শৃঙ্খলা—সাধু সেখান থেকে শতযোজন দূরে স'রে যেতো। মেয়েলি আচরণ তা'র ছিল দু'চোখের বিষ! সাজসজ্জা, অলঙ্কার, প্রসাধন, বিলাস-ব্যসন—এরা তা'র কাছে ছিল স্বপ্নবৎ। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ছিল সে, কিন্তু নিজের আচরণের দরুণ সে কখনো পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষা ক'রে চলতো না। কোথায় সে থাকে, কাদের বাড়ীতে সে রাত কাটায়, কোথা থেকে সে তা'র পরণের শাড়ী আর জামা আনে,—এগুলো ছিল কৌতূহলের বস্তু। একদিন তা'র নিন্দায় যখন চতুর্দিক মুখর হয়ে উঠতো—যখন তা'র এই বেপরোয়া জীবন কারো বরদাস্ত হোতো না,—সে নিঃশব্দে স'রে যেতো। দীর্ঘকাল ধ'রে সে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতো।

খবরের কাগজে একদিন একটি ছোট্ট সংবাদে দেখলুম, সাধুর নাম। মালদহ না কোথায় কোন্ এক মহিলা সভায় সে এক মস্ত বক্তৃতা দিয়ে নারীর ধর্ম বর্ণনা করেছে, এবং অতঃপর গান গেয়ে সভাস্থ সবাইকে অভিভূত করেছে। একবার কাগজে দেখলুম আসানসোল পেরিয়ে কোথায় বরাকর নদীর ধারে হিন্দুধর্ম প্রচার সভায় তাঁবু পড়েছে,—সেখানে সাধু নাকি গীতার ব্যাখ্যা ক'রে সবাইকে চমকে দিয়েছে। বুঝতে পারলুম বাঙ্গলার নানাস্থানে সে অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—মন বসছে না কোথাও। সাধু অসাধারণ মেয়ে।—

মেয়ে মহলে এসে দাঁড়ালে মনে হয়, সাধু নিজে মেয়ে নয়,—তা'র আচরণে পুরুষ সুলভ সহজ তেজস্বিতা, আর পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্কের চেহারা প্রকাশ পায়। তা'র কণ্ঠে, আচরণে, চিন্তাপ্রণালীতে, বুদ্ধি-বিবেচনায়—কোথাও জড়তার লেশমাত্র নেই। জীবনটা তা'র কাছে অত্যন্ত সহজ, জীবন সমস্যায় কোথাও দুরূহতা নেই,—অত্যন্ত

সাবলীল, অতিশয় প্রাঞ্জল! লোভের বস্তু তা'র চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো,—এবং সে-লোভ সম্বরণ ক'রে চলা অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু সাধুর চোখে পড়তো লোভের অন্তর্নিহিত স্বরূপ,—সেখানে তা'র কোনোদিন ভুল ঘটতো না। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি তা'র আবাল্য বৈরাগ্য ছিল,—স্বামী-পরিজন-সন্তান পরিবৃতা সুখী কোনো নারীর কথা উঠলেই সে ঘৃণায় নাসাকুঞ্চিত ক'রে বলতো, পোষা পাখী! সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কোনো স্ত্রীলোককে দেখলেই হাসিমুখে সে বলতো, ক্রীতদাসী! সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক মেয়ের সঙ্গে সাধুর বন্ধুত্ব ছিল। তা'রা সাধুকে নিয়ে আমোদ করতো, হাসি পরিহাস করতো,—কিন্তু সাধুর জীবনযাত্রাকে কেউই পছন্দ করতো না। অভ্যস্ত চিন্তা আর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা,—এরা যেন সাধুর উপস্থিতিতে কেঁপে উঠতো। সাধু ছিল বিদ্রোহিনী।

একবার অনেকদিন সাধুর কোনো খোঁজ খবর পাইনি। হঠাৎ একদিন এক চিঠি পেলুম উত্তরবঙ্গের কোনো একটি গ্রাম থেকে। থানা আর ডাকঘরের যে-নাম,—কোনোদিনই সে অঞ্চলের নাম শুনিনি। চিঠি পেয়ে সাধুর উদ্দেশে যাত্রা করলুম।—

সাধুর কাছে কেমন ক'রে পৌঁছেছিলুম, সে-বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। তবে সেই রাস্তাটুকু পেরিয়ে সাধুর ওখানে পৌঁছতে প্রায় আমার ত্রিশ ঘণ্টা লেগেছিল,—সাধুকে খুঁজে পাবার কোনো আশা ছিল না।

গ্রামখানি ছোট,—নমঃশূদ্র আর মুসলমানের বাস। বলা বাহুল্য চাষীপ্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য আছে দু'ঘর,—বাদবাকি সমস্তই চাষী। চারিদিকে জলা বিল, মাঠ এবং ঝুপসি গাছপালায় ভরা। ঐশ্বর্যের চিহ্ন কোথাও নেই। সন্ধ্যায় আলো জ্বলে না,—সকলেরই অবস্থা টিম-টিমে। গ্রামের দক্ষিণ পূর্বে একটি নদী ব'য়ে চলেছে,—পদ্মার সঙ্গে এই নদীর নাকি কোথায় যোগ আছে।—আমি কলকাতার মানুষ, সুতরাং গ্রামের চেহারা দেখে আমার কেমন যেন নিশ্বাস রোধ হয়ে এলো।

সাধুকে প্রশ্ন করলুম, এর মানে কি?

কেন, এইত বেশ! এদের মাঝখানে···মন্দ কি?

বললুম, কলকাতায় তুমি মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারী করতে,—এটা কি তার চেয়ে ভালো?

সাধু বললে, ভালো না লাগলে আসবো কেন? গ্রাম দেখে অত ভয় পাও কি জন্যে?

সাধু থাকে তা'র সম্পর্কে এক বিধবা ভগ্নীর কাছে। আগে সেই স্ত্রীলোকটিকে বাড়ীর ঝি ব'লে ঠাউরেছিলুম, কিন্তু তিনিই বাড়ীর কর্ত্রী! ঢেঁকিতে ধান ভানেন, মুড়ি ভাজেন, গরু চরান, গোবর কুড়িয়ে বেড়ান,—এবং, বিস্ময়ের কথা, নিজের হাতে পাঁঠা বলি দেন। তাঁর দুই ছেলে মাঠে লাঙ্গল ও গরু নিয়ে যায়—এবং তিনি দুপুর বেলা মাঠে ভাত পৌঁছে দিয়ে আসেন। এখন ধান-কাটার কাল।

দিন চারেক আমি সাধুদের ওখানে ছিলুম, কিন্তু সাধুকে কোনো প্রশ্ন করিনি। চেয়ে দেখেছি তা'র কাজ এবং অনেক কাজ তা'র। সন্ধ্যা বেলা বাইরের ঘরে ভূতপ্রেতের দলের মতো সেই নমঃশূদ্র আর মুসলমান চাষীর দল এসে জমা হয়, আর সাধু তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে রামায়ণ আর মহাভারত। অর্জুনের বীরত্ব, দ্রৌপদীর দুঃসাহস, গান্ধারীর তেজস্বিতা, কর্ণের স্বার্থত্যাগ, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, দ্রোণের প্রতিভা, —বিস্ময়কর কৃতিত্বের সঙ্গে সে ওদের বোঝায়। চাষীরা হাতজোড় ক'রে শোনে, মাঝে মাঝে আনন্দের আতিশয্যে আর্তনাদ ক'রে ওঠে, কখনও আবেগে কেঁদে ককিয়ে সাধুকে অভিনন্দন জানায়।

সাধু ওদের মধ্যে কথকতা করে, ওদের দারিদ্র্য আর অশিক্ষা আর অন্ধতা নিয়ে বক্তৃতা করে,—ওরাই যে দেশের মেরুদণ্ড সেই কথাটা ওদের বুঝিয়ে দেয়। সাধু ব'লে যায় অনর্গল। আমি অবাক হয়ে শুনি। একদিন প্রশ্ন করলুম, এসব তোমার ভালো লাগে? কী অসীম ধৈর্য তোমার।

নদীর ধারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধু আমাকে বোঝায়, ওরাই দেশের আসল মানুষ,—ওরাই নাকি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা ভালো, ওরা সরল, ওরা দুঃখী,—কিন্তু ওদের পরিশ্রমেই নাকি দেশের শাসনকার্য সক্রিয় থাকে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এই কি তোমার আসল কাজ?

সাধু মাথা উঁচু ক'রে বলে, আমি দেশের মেয়ে—কিছু লেখাপড়াও শিখেছি, দেশের মাঝখানে যদি না থাকি, তবে আমার দাম কতটুকু?

সাধুর কথায় যেন আমি কিছু অর্থবোধ করতুম। জলের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে সামান্য কথা যেন অসামান্য হ'য়ে ওঠে। যে কথাগুলো খবরের কাগজে নিত্য

কোলাহল করতে থাকে, সাধুর মুখ থেকে সেই কথাগুলোই যেন পরমার্থ বহন ক'রে আনে।

ওই চারটি দিনেই দেখেছি সাধুর চারিদিকে কত লোকের জনতা। দূরের গ্রাম থেকে আসে মেয়ে পুরুষরা,—তারা সাধুর জন্য আনে নতুন ধানের মুড়কি, শীতের দিনের সব্জি, নাড়ু, গুড়, টাটকা দুধ, গাওয়া ঘি,—এবং আরো কত কি! সাধু যদি চিরদিন এখানে থাকে, কখনও তা'র কিছু অভাব হবে না। সাধু বিশ্বাস করে এইতে ওদের উন্নতি হবে,—এই হৃদয়ের যোগে, এই ভালোবাসায়, এই আত্মবিস্মৃত কল্যাণ কামনায়।

কাঁচা মাটির ঘর, বাঁশের বেড়া, আশেপাশে ডোবা আর জঙ্গল, সন্ধ্যায় শিয়ালের ডাক, রাত্রে ঝিঁ ঝিঁ,—নাগরিক জীবনের কোনও সুখ-সুবিধা নেই,—কিন্তু এরই মাঝখানে সাধু আনন্দে আত্মহারা। যশ নয়, বহুজনের স্তুতিবাদ নয়, বহুবিধ উপহারের লোভ নয়,—কিন্তু সাধু বিশ্বাস করে, এইটি দেশের কাজ! দেশের বিরাট জনসাধারণ, গণদেবতা, দরিদ্র নারায়ণ,—এরা মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াক, এরা বীর্যবান হয়ে উঠুক, এদের দারিদ্র্য আর অশিক্ষা দূর হোক,—এরা ক্ষমতাকে অধিকার করুক,—এই ছিল যেন সাধুর তপস্যা। সে এসব বিশ্বাস করে, এর জন্য কাজ করে, এর জন্য সবাইকে সে তাতিয়ে তোলে।

একদিন বললুম, তুমি ত কাঠবিড়ালী, তোমার সাধ্য কতটুকু?

সাধু বললে, সে আমি জানি। তবু—চেষ্টা করলে যেন ভালো করা যায়—এই কথাটা এদের মাঝখানে ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমি খুশী।

এর পরে আমার কোনো প্রশ্ন নেই,—আমি নৌকোয় উঠে পাড়ি দিলুম। সাধু হাসি মুখে নদীর ধার থেকে বাড়ী ফিরে গেল।

কিন্তু আমার আন্দাজ মিথ্যে হয়নি। প্রায় সাত আট মাস পরে সাধু হঠাৎ একদিন কলকাতায় ফিরে এলো। বললুম, ব্যাপার কি?

সাধু বললে, ভালো লাগলো না।

কেন?

সাধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললে, তোমার সব কথার জবাব

কর্ণফুলী আর মেঘনা! অন্ধকার রাতে যেদিন ঘুম আসে না—সেদিন শুনতে পাই কুলনাশিনী পদ্মায় ধরেছে ভাঙন। পাড় ভাঙছে ঝপঝপ শব্দে, অসহায় গ্রামবাসীর রোল উঠেছে গ্রামের অন্ধকারে,—সর্বনাশিনী ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ক্ষেত খামার আর গৃহপালিত জন্তুর দল; ঘর ভেঙে চলেছে, গাছপালা উপড়ে চলেছে, আর সমগ্র গ্রাম ভেসে চলেছে তাদের সঙ্গে। মনে পড়ছে নবগঙ্গা আর কালীগঙ্গা, ভৈরব আর মধুখালি, ইচ্ছামতী আর মধুমতী! দেখতে পাচ্ছি গণ্ডক আর ঘর্ঘরা আর যমুনার নীলধারা চলেছে পার্বত্য গ্রামের কিনারা বেয়ে, চোখ বুজে স্বপ্নে দেখেছি নায়ার আর বিরহী নদীর তীরে মহাকবি বেদব্যাসের গুহা, —সেই গুহার তীরে উপলমুখরিত ধারা! দেখতে পাচ্ছি আসাম থেকে আফগান মুলুক, আর কুমারিকা থেকে কাশ্মীর; দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মদেশ থেকে দ্বারকাপুরী, আর মদ্রদেশ থেকে সিন্ধুর সীমান্ত। লাহোর থেকে কোয়েটার পথ, স্বক্কুরের সেই সিন্ধুর বাঁধ; সেই চাকলালা আর বান্নু, কোহাট আর ওয়াজিরিস্তান; সেই গাড়োয়ালের সীমানা আর কুমায়ুনের এধার ওধার—যেখানে জল নেই, সেখানে ধারা খুঁজেছি,—যেখানে নদী পাওয়া গেছে সেখানে অবগাহন করেছি।

তারপর আবার কলকাতায়।

ম্যাডক্ স্কোয়ার আর নর্দার্ন পার্ক। সেণ্ট পল্স্ ক্যাথিড্রলের দক্ষিণে ওই জলাশয়টা—ওর পাশ দিয়ে চলে গেছে খিদিরপুরের পথ। জলের ধারে ব'সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে ভাল লাগে। জীবনের কতটা খরচ হয়ে গেছে, কত রেখা পড়েছে মুখে, কত রং ধুয়ে গেছে, কত মুখোস খসে পড়েছে, কত নতুন দাগ বসেছে গভীর রেখায়।

লেক্ তৈরী হচ্ছে মহানগরের দক্ষিণ প্রান্তে। ওখানে ছিল গ্রাম আর নারকেল বন—ছিল ঝুপসি পতিত জমি। কোথাও কোথাও জলা আর বিল। নতুন নতুন পথ বানানো হচ্ছে, নতুন নতুন লোকের বসতি গড়ে উঠছে। আগে দক্ষিণ অংশে ছিল একটি জলাশয়—এখন দুটি। ওটার নাম লেক্। জলাশয় নয়, হ্রদ নয়, সরোবর নয়—ওটা লেক্। কোথাও কোথাও ছোট ছোট বিশ্রামের মণ্ডপ, কোথাও নারিকেল-কুঞ্জের নীচে আসন, কোথাও কৃত্রিম উদ্যান, কোথাও নির্জন বিশ্রম্ভালাপের উপযোগী লতাবিতানে ছাওয়া ছোট ছোট কুঞ্জবিথীকা।

সাধু বসে থাকতো জলের ধারে,—আমাদের আসনটি চিহ্নিত করা থাকতো। কিম্বা আমি থাকতুম কোনো গাছের নীচে ঘাসের জমির ওপর—সাধু আসতো ওপারের পথ ধরে। আমাদের ঠিক পিছন দিয়ে চলে গেছে রেলপথটি,—ট্রেণের কামরার সেই আলোর আভাসে সাধুর চোখ কোনো কোনোদিন উজ্জ্বল দেখেছি। সাধু প্রতিদিন এসে পৌঁছতো সন্ন্যাসিনীর মতন,—অর্থাৎ কোথাও সে বাঁধন অথবা বাধ্যবাধকতা রেখে আসতো না। তার নিজস্ব ঘরকন্না কোথাও ছিল না; তার আসবাব পত্র, তা'র পোষাক-পরিচ্ছদ, তা'র এটা-ওটা—কোনো কিছুর প্রতি তার আসক্তি ছিল না। সমস্ত কিছুর থেকে তার পথ সকল সময়ে খোলা থাকতো। সাধুকে দেখে আমি ভয় পেতুম।

গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো সময় লক্ষ্য করেছি, সাধু বেশ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে লেকের ওই জলের ধারে; কথা কইতে কইতে তার অসমাপ্ত আলাপ কোন্ সময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে আমিও আর লক্ষ্য করি নি। সে ঘুমিয়ে রয়েছে অকাতরে। সমস্ত রাত ধরে তাকে না ডাকলেও সে অমনি করে ঘুমোবে! ঘুমে অচেতন সে!

অনেক রাত অবধি অপেক্ষা ক'রে বিরক্ত হ'য়ে তাকে জাগিয়ে তুলেছি,—সে উঠে ব'সে চিনতে পারে নি কিছু। দূরের শহরের আলো লেক-এর জলে প্রতিবিম্বিত, দেখে সে ওটাকে মনে করেছে কোনো পাতালপুরীর স্বপ্নলোক, কোনো রহস্যপুরীর প্রাসাদের আলোকবর্তিকা,—কোনো একটা আশ্চর্য পৃথিবী! সে ধীরে ধীরে জড়িত ললিত কণ্ঠে গান ধরেছে:

"ডাকিলে তারে যায় না পাওয়া,
ভাবিলে বোঝা যায় না তারে!
কাঁদিলে শুধু মিলিতে পারে—
তেমন ক'রে কাঁদতে পারে গো ক'জন?
ভালোবাসিলে সে যে হয় গো আপন!
ভালোবাসিতে তারে পারে গো ক'জন!"

জলের ভিতরকার প্রতিবিম্বিত আলোর আভাসে সাধুর চোখে জলের আভাস দেখতে পেতুম। বস্তুত, নিজেকে সে প্রকাশ করতো জলের ধারে এসে। হৃষিকেশের পথে সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে দেখেছি, তা'র স্বপ্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রশ্নে,

আলাপে, বিতর্কে, পরিহাসে, শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে সে নিজের সঙ্গে সবাইকে যেন উঁচুতে তুলে ধরেছে। বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে গঙ্গার ধারে মেয়েমহলে ব'সে দূরের নৌকা-গুলির দিকে তাকিয়ে সে যখন কীর্তনের কলি ধরেছে,—

"আমি মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
যাইব যোগিনী হইয়ে…"

দেখেছি, সাধু যেন কেমন অবাস্তব নারী হয়ে উঠেছে, তার কাছাকাছি যেন পৌঁছতে পারা যায় না। তাকে দুরারোহ মনে হতো। তাকে বাঁধতে চেয়েছি অনেক কাজে, ব্যস্ত রাখতে চেয়েছি অনেক ঘটনায়, শৃঙ্খলা আর ছন্দ আনতে চেয়েছি তা'র প্রত্যহের জীবনে,—কিন্তু বার বার প্রতিবাদ ক'রে সে মুক্তি নিয়েছে। চেষ্টা করেছে সে অনেকবার, কিন্তু কোনো ব্যবস্থার খাপে নিজেকে সে কখনও মেলাতে পারেনি। সে কেবল গানে, কাব্য ও শিল্পচর্চায়, আধ্যাত্মিক আলাপে, পরিহাস-সরস কোনো আলোচনায়, অস্থির কোনো ভ্রাম্যমান অবস্থায়,—সে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতো। সাহেবগঞ্জের দিকে কোনো এক পার্বত্য গ্রামে একবার সে জনদুই সঙ্গিনীকে নিয়ে বাস করতে গেল,—কিন্তু মাসখানেক পরে ফিরে এসে জানালো, সেখানে নদী নেই, সুতরাং থাকা চললো না। একবার বিহারের একটা ছোট্ট শহরে কোনো এক আশ্রমে তা'কে পাঠালুম,—সেখানে পূজা-অর্চা, কথকতা, অধ্যাত্ম আলাপ, পরিচ্ছন্ন শুচিতা,—সমস্তর মাঝখানে আত্মসমর্পণ ক'রে সে লিখে জানালো, জায়গাটি তা'র বেশ ভালো লেগেছে। কিন্তু মাস তিনেক পরেই সে ফিরে এলো। বললে, মরুভূমির মাঝখানে জীবনটা কাটাবো, এতখানি অপরাধ এখনো করিনি!

বললুম, মরুভূমি ঠাওরালে কি জন্যে?

সাধু জানালো, জলাশয় যে দেশে নেই, জীবনটাও সেখানে যেন বদ্ধজলা হয়ে উঠে। আমাকে এত বড় শাস্তি দেবার কে তুমি?

বললুম, আমি কেউ নয়!

গ্রামের নদীতে দেখেছি, সাধু সাঁতার কাটছে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় শ্রাবণে পৌষে,—সাঁতার কাটছে সে অক্লান্ত। জলের সঙ্গে তা'র কোলাকুলি, জলের মধ্যে তা'র প্রাণের আকুলি-বিকুলি। বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে সে নেমেছে গ্রামের নদীতে, —জলঝরা সর্বাঙ্গে তা'র জ্যোৎস্না ঝলমল করছে। সে ডুব দিচ্ছে, ভেসে চলেছে তা'র এলোচুল, যেন তা'র সমস্ত জীবনটারই খিল খুলে গেছে। নদী জনহীন,

একখানি নৌকাও নেই,—চাঁদের আলোর জন্য নদীর দুই তীরের গ্রামে কোথাও একটিও আলো নেই ; আর সেই পূর্ণিমার নীচে সাধু তা'র জীবন-মরণ একাকার ক'রে নদীর জলে আলগা ক'রে দিয়েছে। তা'র লজ্জা, মান, ভয়—কোনোটাই নেই। আমি পেয়ারা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সাধুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি,—সাধু সাঁতরে চলেছে, অনেক দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের ধার পেরিয়ে, গাজনতলার হাট পিছনে রেখে,—চাঁদের আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায়,—সাধু একসময় জলের মধ্যে হারিয়ে গেল ! আমি চেয়ে রইলুম সেইদিকে।

কতক্ষণ, কতক্ষণ কেটে গেছে সেই নদীর ধারে ; আমি চেয়ে আছি সেইদিকে, যেদিকে সাধু—কিম্বা আর কোনোদিকে, ঠিক মনে নেই, এমন সময় ভাঙ্গা ঘাটে পিছল কাদামাটির ওপর হাত পা আঁচড়ে সাধু উঠে এলো। বললুম, আর কিছু না হোক, অসুখ করতেও পারে ত ?

অসুখ !—সাধু আমার দিকে চেয়ে বললে, অসুখ আমার করে না, অসুখ কখনও করেনি।

বললুম, আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে, সাধু ?

সাধু বললে, হ্যাঁ, সাঁতার শেখাতে পারি—কিন্তু ভয় করে—

কেন ?

তুমি সাঁতার জানলে বোধ হয় আর তীরে উঠবে না, নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

বললুম, সাধু, তুমি জানো না, জলে আমার কী ভয় !

সাধু বললে, জানি তুমি ভীতু ! এও জানি, হঠাৎ একদিন তোমার সব ভয় চলে যায়।…তোমাকে আমি বিশ্বাস করিনে।

আমাকে এমন আগলেই বা রাখো কেন ?

সাধু বললে, নিজের সুবিধের জন্যেই ! তোমার কাছে এলে নিজের চেহারাটা ভালো ক'রে দেখতে পাই।

সাধুর কথায় আমার মন কৌতুকে ভ'রে ওঠে। বললুম, বেশ একটা স্বাত্বিক বন্ধুত্বের আঁচ পাই যেন ?

সাধু খুব হেসে ওঠে। বলে, অত বড় আসরে, অত লোকের মাঝখানে গান গাই কার জন্যে ? তুমি এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকো…তুমি ব'সে ব'সে শুনছ… তাই ত আমার গান খোলে !

বললুম, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার চেয়ে কাঁচা আর কাউকে দেখেছ?

তা হোক, তোমার মতন কান ক'জনের?

সাধু গায়ের জোরে এমন একটা আসনে বসাতে চায় আমাকে, আমি যে-আসনের যোগ্য নই। কেবল তাই নয়, নানা লোককে সে ব'লে আসে—আমার অনুমতি ছাড়া সে নাকি কোনো কাজই করে না। যদি আমি বিদেশে কোথাও থাকি, সে আমাকে চিঠি লেখে, কিম্বা টেলিগ্রাম করে। হয়ত একটি ভালো গায়ক, কিম্বা কীর্তনীয়া, কিম্বা ছবি-আঁকিয়ে, কিম্বা একজন নতুন কবি, কিম্বা বাঁশী-বাজিয়ে—যাকেই সে আবিষ্কার করুক না—সে আর এমন কি? আনন্দের জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ধূলোয় গড়াগড়ি দাও—ক্ষতি কি? নিঃস্বার্থ দেশসেবকের জন্য নিজের সকল সুখ-সুবিধা জলাঞ্জলি দাও,—সেই ত' আনন্দ! কবিতা ও গল্প শুনতে গিয়ে রাত পুইয়ে যাক্—ভ্রূক্ষেপ করো না; পথে পথে অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়াও, ক্লান্তি বোধ করো কেন? গীতার ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আত্মবিস্মৃত আনন্দে তন্ময় হয়ে আছ,—ক্ষুধা তৃষ্ণার কল্পনা কেন?

একটা প্রখর উন্মাদনা ছিল সাধুর প্রকৃতিতে। দার্জিলিঙের উপরে আষাঢ় ঘনিয়ে এসেছে, সে ছুটে চললো ম্যাকেন্‌জি রোড ধ'রে ম্যাল্‌-এর দিকে। যশিদি আর শিমুলতলার মাঠে বর্ষা নেমেছে, ঘরে থাকতে সাধুর মন চায় না। ত্রিকুটের অন্ধ গুহাপথে গাছপালা বেয়ে বর্ষা নামে,—সাধু চললো দেওঘর শহর পেরিয়ে মাঠের দিকে। চেরাপুঞ্জীর প্রান্তে দাঁড়ালে বহুদূরে সুর্মা উপত্যকার দিগন্তব্যাপী বর্ষার শোভা দেখা যায়,—জলপ্রপাতের অবিশ্রান্ত ঝরঝর ঘর্ঘর শব্দ শোনা যায়,—সুতরাং সেখানে গিয়ে না দাঁড়ালে চলবে না। চৌরঙ্গীর উপরে সহসা শ্রাবণ ভেঙে পড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলো—যত দূর যাওয়া যায়। তারপরে লেক্ আছে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা রাত্রে। জল নেমেছে লেক্‌-এ—সমস্ত দৃশ্যমান দিকদিগন্ত ঘিরে জলধারার উন্মাদনা,—একাকার হয়ে গেছে লেকএর এপার ওপার. অবিশ্রান্ত বর্ষার দাপাদাপি এদিকে ওদিকে—আর সাধু সেই মণ্ডপের তলায় ব'সে আনন্দে অধীর! মাঝে মাঝে সন্দেহ হোতো, সাধু এই যে ছুটে বেড়ায়,—এটা তা'র অধীর আনন্দ, অথবা অসহ্য যন্ত্রণা! তা'র ভিতরে একটা শক্তি যেন দিবারাত্র মাথা কুটছে, সেটা যেন সাধুকে বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে পড়তে চায়। সাপের ভিতরে বিষ থাকে তাই সে এঁকে বেঁকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দে ফণা তুলে দৌড়য়,—অর্থাৎ একটা

শক্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। স্ত্রীলোকের ভিতরে বিষ থাকে—তাই বাইরেটায় এত ছলাকলা, এত বাঁকা কটাক্ষ, এত অঙ্গভঙ্গী, এত চোরা হাসি আর আত্মপ্রদর্শনীর আড়ম্বর। পুরুষের ভিতরে বিষ থাকে তাই এত দাপাদাপি, যুদ্ধ বিগ্রহ, খুনোখুনি, সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া, এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়া। বীজের মধ্যে বিষ লুকিয়ে থাকে, তাই মৃত্তিকার স্তর ভেদ ক'রে ওঠে অঙ্কুরে, ফুলে ও ফলে পরিণত হয়! সাধুর মধ্যে দেখতে পাই সেই ভয়ানক বিষ, সেই অদম্য প্রাণশক্তি! সে চটুল নয়, চপল নয়, সে উদ্দাম,—সে কোথাও বশ্যতা মেনে চলে না,—সেটি যেন ধ্বংসাত্মিকা শক্তি। সে মাথা কুটে মরে পাথরে, অগাধ নদীতে তলিয়ে কোথায় হারিয়ে যেতে চায়, বাঁশীর ডাকে বিহ্বল হয়ে সে ঘরছেড়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে, ভেসে যেতে চায় অধ্যাত্ম আনন্দের প্রবাহে। ভিতরের সেই শক্তিই সাধুকে তীরবেগে ছোটায়, পাগলিনীর মতো হাসায়, সন্তান শোকাতুরা নারীর মতো কাঁদায়,—অনর্গল হাস্যে, রহস্যে, পরিহাসে, কৌতুকে তাকে আলোড়িত ক'রে তোলে। নারীর ভিতরে এই পুরুষোচিত প্রতিভা আমার কাছে কেবল বিস্ময়ের বস্তুই ছিল না,—সাধুর ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি কল্পনা ক'রে আমি কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠতুম।

*

*　　　　*

এবার এ-কাহিনী আমি শেষ ক'রে দেবো। জল-কল্লোলের ধ্বনি এবার স্তিমিত হয়ে এসেছে। কত অসংখ্য নদী নাম হারিয়ে আমার প্রাণের মধ্যে কল্লোলধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেছে, তাদের কথা মনে পড়ছে। শেষের দিকে এসে আবার মনে পড়ছে আমার শিশুকাল। শ্রাবণের একাদশীর দিনে মায়ের মুখে সরয়ূ নদীর কাহিনী, ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণের অনন্তশয্যা,—আর দিদিমার মুখে ঐরাবত ভেসে যাওয়ার সেই গল্প! কারো অসমাপ্ত কথা, কারো ছোট জীবন চরিত, বিষ্টুবাবুর মৃতদেহ নিয়ে বর্ষার রাতে শ্মশান যাত্রা, হেদুয়ার জলে উন্মাদ নীরেনের আত্মহত্যা—তারা সবাই রয়ে গেল আমার এই কাহিনীতে। পুরনো কলকাতার ভাঙন, আর নতুন কলকাতার পত্তন,—এরাও এখানে রয়ে গেল। মনে প'ড়ে যাচ্ছে অন্ধ গঙ্গার-মা, বেহারী-বুড়ো, ক্ষিরি নাপতিনী, খোলার বস্তির সেই কাত্যায়নী, সেই হরার-মা আর সাতুবাবু, সেই নলিতবাবুর বৌ, আর ভূপতিবাবুর ভূতে পাওয়া! এতকাল পরে আবার আমি ভাবছি শীলেদের বাড়ীর ছাদের সেই পাথরের স্তব্ধ মূর্তি, আর

সেই ইন্দুর পুলিশের ভয়-দেখানো। ভুলতে পারিনে তাদের যারা আমার জীবনে এনে দিয়েছে অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান, যারা আমার চোখ খুলে দিয়েছে, মন খুলে দিয়ে গেছে! শোভারাম, মান্নু, বদন, কলুটোলার সরকার, সেই কাবুলিওয়ালা, রেঙ্গুনের সেই লা-মং,—তারা আমার স্মৃতিভাণ্ডারের এক একটি রত্ন! তারা কেউ মধু দিয়ে গেছে, কেউ দিয়ে গেছে অমৃত, কেউ বুক ভরে দিয়ে গেছে, কেউ বা আমার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসকে লণ্ডভণ্ড ক'রে চলে গেছে।

কিন্তু আমি নিজে,—আমার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কেউ বলে দিতে পারে সে কথা? আমার কি বার্ধক্য এসেছে ঘনিয়ে, কিম্বা অনাসক্তি? একদিন যারা আমার প্রবল ঔৎসুক্যের কেন্দ্র ছিল,—কোথায় তারা? কেন তাদের কোন খোঁজ রাখি নে? কানু, ইন্দু, মিনি, সত্য, খাঁদু, টুনু নণ্টু—কোথায় আজ? আমার নামটা কি আজো তাদের মনে আছে, আমার পোষাকী নামটা—যেটা জনসাধারণের কাছে আজকাল পরিচিত—সেটা কি তারা জানতো? আমার এ-বই কি তারা পড়বে কোনো দিন? কোথায় গেল সেই স্নেহ-প্রবণ কোচম্যান রহমন, আর তার রক্ষিতা হাস্যমুখী আমিনা? তারা কি আজো আমাকে মনে ক'রে রেখেছে? কোথায় সেই দীপু গুণ্ডা, আর ভতু মিতুয়া, কোথা বা সেই শ্রীচরণ মুচি, দীনু ধোপা আর রাখু গয়লানি,—তা'রা কি বাংলাভাষা জানে? তা'রা কি জানতো আমি এ-বই লিখবো কোনোদিন?

ভটচার্যি বাগান আর পুঁটি বাগানের সেই শ্যাওলাপড়া গলি—সেসব গলি কি আজো আছে? আমার সেই পাঠশালার পথ, সেই অর্জুনের দোকান, মানিকতলার সেই হরিময়রা—ছায়াচিত্রের মতো তাদের সবাইকে যেন দেখতে পাচ্ছি। আমি স'রে গেছি আজ কতদূরে—কিন্তু তারা স'রে যায় নি—আমার মনের অলিগলিতে সেই অগণ্যের অশ্রান্ত আনাগোনা; তারা যেন এক একটি দীপ জ্বালিয়ে আমার দেউল আলোকিত ক'রে রেখে গেছে।

আন্নু বোধ হয় আজো শালগ্রাম খুঁজে পায়নি, তাই তার আর দেখা পেলুম না। কোথায় গেল গিরিবালা? সে কি এতদিনে মনের আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে? টুনুর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি—সে যে সেই আসামের দিকে গেছে, আর কোনো দিন তা'র খোঁজ পেলুম না। আর সাধু—হ্যাঁ, সাধুর কথাটা ব'লেই শেষ করবো।

দিনাজপুর অথবা রংপুর—ঠিক মনে নেই। সেখানে কি যেন এক গ্রামে কোনো এক নদীর ধারে সাধু একটি পাঠশালা খুলেছিল। তা'র বিশ্বাস ছিল গ্রামবাসীদের সে মানুষ ক'রে তুলবে। এ-ভুল অনেকবার সে করেছে, অনেকবার সে ব্যর্থ হয়েছে—কিন্তু তার বিশ্বাস, দেশের নিরক্ষর, নির্যাতিত দরিদ্র জনসাধারণ যদি মানুষ না হয়ে ওঠে, তবে সে-পাপ তাকেও স্পর্শ করবে। সুতরাং বার বার ছুটে গেছে সে সেই খ্যাতিহীন মূল্যহীন ধন্যবাদহীন কাজে। সেইখানে সাধু রোগে পড়ে। আনন্দের কথা এই, ভুগেছে সে অল্পদিন। কিন্তু সাধুর মৃত্যুকালে তার কাছে কেউ ছিল না। গ্রামের কোনো কোনো লোক তাকে হাসপাতালে দেবার কথা বলে; কিন্তু হাসপাতাল সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে,—সাধুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই সময় নদীতে আসে বন্যা,—সাধুর ঘর অবধি জল ছুটে আসতে থাকে। রোগিণীর প্রলাপোক্তি শুনে আশেপাশের লোক তা'র চৌহদ্দি থেকে পালিয়ে যায়—আর আসে না। দিন আষ্টেক পরে বন্যার জল স'রে যাবার পর সাধুর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল,—তবে শেয়াল ও শকুনির অনাচারে সাধুর মৃতদেহটা সনাক্ত করতে গ্রামবাসীদের কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। যাই হোক, যেখানে সাধুর দেহাবশেষ জ্বালানো হয়, তার নাম নাকি করলী ভৈরবীর শ্মশান।—এই হোলো মোটামুটি খবর।

সাধুর চিহ্ন আমার কাছে কিছু নেই, কিছু রাখিয়োনি। কয়েকখানা চিঠিপত্র ছিল কাছে, কিন্তু সে-গুলো জ্বালিয়ে দিয়েছি কোনো এক কালী পূজার রাত্রে। সে জল ভালোবাসতো, জলে ভাসতে পারতো,—জল দেখলে অধীর আনন্দে সে হেসে উঠতো, তাই এতদিন পরে জলের কথাই লিখলুম। সাধুর ইচ্ছা ছিল না তার কথা কোথাও প্রকাশ্যে আলোচনা করি। তবুও যেটুকু বলতে চেষ্টা পেয়েছি, সেটুকু সাধুর এককণাও নয়। অনেক সময় তার মৃত্যু কামনা করেছি, কিন্তু এত কষ্টে তার মৃত্যু হবে একথা জানতুম না! সাধুর ভিতরকার প্রাণশক্তিই তা'র জীবনের পদ্মপত্রে তাকে স্থির থাকতে দিল না। সাধুর শোচনীয় মৃত্যু আজো আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়!

একদা ডায়মণ্ড হারবারের নদীর ধারে সেই বাগানের দোলনায় ব'সে ব'সে সাধু আমাকে গান শুনিয়েছিল—

"জানি তোমার সাথে দেখা হবে
সাগর কিনারায়।



আহা তাইতো আমি ব'সে আছি গো

অকূল মোহানায়!

বন্ধু তুমি পথ দেখাবে

অকূল পারের ভয় নাশিবে

আমি গান গেয়ে মোর বাইবো তরী গো

অকূল দরিয়ায়—

সাগর কিনারায়!"

বহুদিন পরে উত্তর বঙ্গের কোনো একটি গ্রামে আমি এক বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই। ট্রেন থেকে নৌকা, তারপর গরুর গাড়ী—পথ দুর্গম। দিন দুই পরে ফিরবার পথে গরুর গাড়ী থেকে নৌকায় উঠি। নৌকাখানা ছিল মস্ত বড়—এবং সঙ্গে ছিল অনেক লোকজন। নৌকার মধ্যে গান বাজনা, আবৃত্তি, হাসি ও গল্প চলছে। একপাশে প্রবল কোলাহলের মধ্যে বসেছে ভোজনের আসর,—মাঝে মাঝে তামাসা আর পরিহাসের শাণিত তারবারি ঝলক দিয়ে উঠছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা শ্রাবণ মাসের শেষ। কিন্তু আমরা ছিলুম এখানকার কোনো প্রখ্যাত জমীদারের সৌখীন বজরায়,—বর্ষাবাদলের কোনো অসুবিধাই আমাদের ছিল না।

বলা বহুল্য, বরযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন ছিল প্রচুর,—সুতরাং দিব্য আরামে চোখ বুজে ধুমপানের সঙ্গে ভরানদীর শোভা উপভোগ করছিলুম। নদীটি ছোট, দুই পারের গ্রাম আর মাঠ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়—তবে বর্ষায় চারিদিক জলে ভরা, সুতরাং এপার ওপারে কোথাও বিশেষ জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন,—আমাদের এখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পথ বাকি। তবে আকাশ এবেলা কিছু পরিষ্কার হলেও শ্রাবণ শেষের বিষণ্ণতায় ভরা। আমার একটু যেন তন্দ্রা এসেছিল।—

সহসা একজনের প্রশ্নের উত্তরে কে যেন ওপাশ থেকে ব'লে উঠলো, হ্যাঁ, ওটার নাম 'করালীভৈরবীর শ্মশান।' ওই যে, সামনের ঘাট—

যেন বৈদ্যুতিক চাবুকের আঘাতে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। হ্যাঁ, উত্তর বঙ্গের এই অঞ্চলের ভিতর দিয়েই আমাদের বজরা চলেছে বটে। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই,—ওই অদূরে করালীভৈরবীর শ্মশান, ওখানে সাধুর দেহাবশেষ ছাই হয়ে গেছে। এই গ্রামে সে ছিল, সুতরাং আমি যেন একটি দুর্লভ তীর্থদর্শনের

মতো সেই দিকে চেয়ে রইলুম,—দুর্গম অন্ধকার অসভ্য চাষীপ্রধান গ্রাম! কেম ক'রে কা'র আশ্রয়ে এবং সহচর্যে সাধু বাস করেছিল এই গ্রামে, এটি আমার প বিস্ময়। আমি চেয়ে রইলুম সেই শ্মশানের দিকে—কিছু দেখা যায় না—শুধু এ খণ্ড পোড়া কাঠ, একটি ভাঙা হাঁড়ি, আর কাদামাখা একটুকরো কাপড়। নৌ থামিয়ে ওই শ্মশানে গিয়ে নামলে হয়ত অনেক খোঁজাখুঁজির পর আরো কি অতৃপ্ত বাসনার রংচটা মলিন স্মৃতিকণা কুড়িয়ে পাওয়া যেতো,—ভগ্ন চূর্ণ আশ নিস্ফল কামনার অবশেষ, কান্নাহাসির কিছু আলোছায়া, কিছু বা অহেতুক আনন্দে চিহ্ন!

মনে মনে বললুম, সাধু, মৃত্যুর আগে আমার কথা তুমি নিশ্চয় জানতে চেয়েছিল এঘাট থেকে ওঘাটে আজো আমি আনাগোনা করি,—একূল থেকে ওকূলে! নৌ ভাসিয়েই চলেছি,—মনের মতন ঘাট আজো আমি খুঁজে পাইনি, সাধু! তু মাঝখানে থেমে গেলে, কিন্তু আমি আজো অকূলে ভেসে চলেছি! সাধু যেন অ মা কানে কানে তা'র প্রিয় গানটির দু'টি কলি আবার করুণ মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগলো—

"জানি তোমার সাথে দেখা হবে
সাগর কিনারায়।
আহা তাইতো আমি বসে আছি গো—
অকূল মোহানায়।"

সমাপ্ত